ফজলুদ্দীন শিবলী

কামানের হুঙ্কার

[মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত বিজয়ের উপর
ভিত্তি করে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস]

ফজলুদ্দীন শিবলী

সম্পাদনা ঃ মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
শাখা ঃ ৫৫- বি, পুরানা পল্টন (দোতালা) ঢাকা- ১০০০

দুটি কথা

ইসলামের ইতিহাসের অমর যোদ্ধা মোহাম্মদ বিন কাসিমের বিস্ময়কর বিজয় অভিযান যুগে যুগেই মানুষের মধ্যে নতুন ঈমানী চেতনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে চলেছে। মাত্র সতেরো বছর বয়সের এই তরুণ কতোবড় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সুদূর আরব ভূমি হতে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন অত্যাচারী রাজা দাহির কর্তৃক অন্যায়ভাবে আটক ও নির্যাতনের শিকার হওয়া একদল মুসলিম নারী-পুরুষকে উদ্ধার করার জন্য!

ক্ষমতা ও আত্মম্ভরিতায় তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক রাজা দাহির এতোটাই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল যে নিজের আপন বোনকে বিয়ে করার মত ঘৃণ্য কাজ করতেও তার বাধেনি। সেই রাজা দাহির হজ্ব পালন করার উদ্দেশ্যে গমনকারী একদল মুসলিম নারী-পুরুষকে বহনকারী জাহাজ আটক ও লুণ্ঠন এবং যাত্রীদের বন্দী করে সমগ্র মুসলিম খেলাফতের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

তারই জবাবে তরুণ সেনাপতি এক অসাধারণ জেহাদী অভিযান পরিচালনা করে শুধু ভারত জয়ই করেননি, তিনি জয় করেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়। ফলশ্রুতিতে মন্দিরের পুরোহিত পর্যন্ত তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন বিশাল গুপ্ত ধনের অপরিসীম ভাণ্ডার। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল অগণিত বঞ্চিত অবহেলিত মানুষ।

মোহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় অভিযান নিয়ে আরো পুস্তক এবং উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটিতে রয়েছে বহু অজানা ও চমকপ্রদ তথ্য এবং ঘটনার সমাবেশ। অভিযানের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে এবং এ জেহাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে হাজারো ষড়যন্ত্রের এত বিস্তারিত বিবরণ ও বিস্ময়কর তথ্য অন্য কোন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। তাই পাঠকগণ এ উপন্যাস পাঠে অনেক বৈচিত্রের সন্ধান পাবেন।

সব মিলিয়ে এ উপন্যাসটি পাঠে সব বয়সী পাঠকগণই আনন্দিত হবেন। সেই সাথে গভীর বেদনায় ছেয়ে যাবে সকলের হৃদয়—এ মহান তরুণ সিপাহসালারের মর্মান্তিক মৃত্যুর হৃদয়বিদারক উপাখ্যান পাঠে।

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

কামানের হুঙ্কার

আবির্ভাব

॥ এক ॥

মিসরের ফারাওদের সভ্যতা যখন কালের গর্ভে বিলীন। রোমান ও গ্রীক সভ্যতা যখন অতীত ইতিহাসের বস্তু। ব্যবিলনীয় ও কালদানীয় সভ্যতার যখন ঘটেছে পতন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারের সভ্যতা যখন ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। আর্য, বৌদ্ধ ও গোড়া সনাতনী হিন্দুত্ববাদের যখন এাহি এাহি অবস্থা, ঠিক সেই মুহূর্তে মরু আরবের দিগন্ত প্রসারী ধূলিঝড় এক মহামানবের আগমন-বার্তা শোনাচ্ছিল। বাগে আদমে এমন সন্তান আর নেই। ইতিহাসের পাতা নিজ বুকে যাঁকে ঠাঁই দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ—এলেন সেই মহাপুরুষ। এলেন রহমতের রাবিধারা। এলেন শান্তির বাহক। এলেন সিবগাতুল্লাহর চুল্লিতে পরিশোধিত মহাত্মা।

এলেন খুলুকে আজীম, উসওয়াতুন হাসানাহ, আব্দুল্লাহর নিধি, আমেনার নয়নমণি বিশ্বনবী (সাঃ)। তাঁর আগমনে থর থর করে কেঁপে ওঠল কাইসার ও কিসরার গগনচুম্বী প্রাসাদ। শুকিয়ে গেল শ্বেত সমুদ্র। নিভে গেল হাজার বছর ধরে জাজ্বল্যমান অগ্নিকুণ্ড। উল্টে গেল পাপাত্মা ইবলিসের সিংহাসন।

কালের গতিপ্রবাহে বেড়ে উঠলেন তিনি। ৪০ বছরের পূর্ণমানব তিনি। ফারানের গিরিগুহায় ধ্যানমগ্ন। এ সময় সত্য ও দ্বীনে হকের পয়গাম নিয়ে এলেন আল্লাহর দূত জিবরীল। প্রভুর পক্ষ থেকে পয়লা আদেশসূচক বাণী 'পড়'। মক্কার অলিতে-গলিতে হকের দাওয়াত দিলেন তিনি। মানলনা কেউ, মানল কেউ তাঁকে। এক সময় বড় আশা নিয়ে তিনি তায়েফে যান। উদ্দেশ্য দ্বীনের দাওয়াত। কিন্তু দাওয়াত তো কেউ গ্রহণ করল-ই না উপরন্তু নেমে এলো পাথুরে বর্ষা। সেই তায়েফে-ই এরপর একদিন তিনি যোদ্ধাবেশে এলেন। তায়েফ অবরোধ করলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী ৬৩০ খ্রীঃ (১৫ই শাওয়াল ৮ হিজরী) রাসূলে করীম (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করেছিলেন। হুনায়ন ও আওতাস-এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তায়েফে উপনীত হয়েছিলেন তিনি। তায়েফ অবরোধের পূর্বক্ষণে আল্লাহর তরবারী হযরত খালেদ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। মারাত্মক আহত। বাঁচার আশা-ই ছিল না তাঁর। দুশমনের ঘোড়া তাঁর দেহের ওপর দিয়ে তাঁকে পিষ্ট করে ছুটে গিয়েছিল। এরপরও খালেদের জিন্দা থাকাটাই একটা মোজেযা।

এটা হক ও বাতিলের লড়াই। হযরত আবুবকর, ওমর, আলী ও আব্বাস (রাঃ) যাতে শরীক ছিলেন। মুজাহিদীনে ইসলামের নেতৃত্ব ছিল খোদ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দস্ত মুবারকে। তায়েফের বিখ্যাত ছাকীফ ও অন্যান্য আবাদী কবিলার

সাথে ছিল যুদ্ধ, হাওয়াজেন নামী একটা দলও ছিল। এ দু' কবিলার সিপাহসালার ছিলেন মালেক ইবনে আওফ। বয়স তাঁর ত্রিশের কোঠায়। সিপাহসালার হিসাবে এ বয়সকে বালখিল্য-ই মনে হয়। কিন্তু তিনি এতই ধীমান, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোক ছিলেন যে, আশি বছরের বৃদ্ধও তাঁর সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হতো। এ লোকই হুনায়ন ও আওতাসের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়েছিল।

জীবন-মৃত্যুর দোলায় দোল খাচ্ছিলেন হযরত খালেদ (রাঃ)। প্রচুর রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে আসছিল তাঁর দেহ। রাসূল (সাঃ) ঝুঁকে তাঁর ক্ষতে ফুঁক দিলেন। চোখ খুললেন সাইফুল্লাহ। প্রচণ্ড যখমের ঝুঁকি সত্ত্বেও তিনি এই যুদ্ধে হিস্যা নিলেন।

এ যুদ্ধ মারাত্মক রূপ নিল। রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরাম হাওয়াজেন ও ছাকীফের বিরুদ্ধে জওয়াবী হামলা চালালে ওরা টিকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ওরা তায়েফের কেল্লাগুলোয় আশ্রয় নিল। পশ্চাদপদ হলেও ভগ্নোৎসাহ হয়নি ওরা। মালেক ইবনে আওফতো ঘোষণা-ই করলেন ঃ মুসলমানদের ভয়তে আমি পিছ পা হইনি বরং আমার মর্জিতেই মুসলমানরা লড়বে।

দীর্ঘ ১৮ দিন অবরোধ বজায় থাকল। মুসলমানগণ কেল্লার ওপর চড়াও হন এবং দুশমনের তীর-বল্লমে আহত ও শহীদ হতে থাকেন। রাসূলে পাক (সাঃ) জরুরী মিটিং ডাকলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু জোশিলা ও জযবাওয়ালা সাহাবীরা এ প্রস্তাবের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তাঁরা কেল্লা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাসূলে খোদা তাদেরকে আরেকবার হামলা করার অনুমতি দেন। কেল্লামুখো ধেয়ে গেলে তারা তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় সামনে অগ্রসর হওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। অসংখ্য মুজাহিদ যখমী হন। শেষ পর্যন্ত অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

মুসলমানদের ছাউনী তখনও গুটানো হয়নি। যখমীর সংখ্যা অনেক। এদের অনেকেই এতই যখমী যে সফরের শক্তি নেই তাদের। ২৩শে ফেব্রুয়ারী অবরোধ তুলে নেয়া হলো। ২৬শে ফেব্রুয়ারী মুজাহিদীনে ইসলাম জিয়িররানায় উপনীত হয়ে ছাউনী ফেলেন। রাসূলে খোদা (সাঃ) মুজাহিদগণকে খানিক দম নিতে সুযোগ দিয়েছিলেন। মারাত্মক যখমী লোকদের ক্ষতে পট্টি বাঁধার দরকার ছিল।

মুসলমানগণ বিফল মনোরথে ফিরছিলেন। স্রেফ বিফল-ই নয় এই অবরোধে তারা বেশ কিছু মুসলিম সঙ্গীও হারান। যখমীদের কোন ইয়ত্তা নেই। তায়েফ নগরী সেই আগেকারটির মতই দণ্ডায়মান। মুসলমানদের প্রতি তাকিয়ে সে যেন অবজ্ঞার হাসি হাসছিল।

এরপর ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড। মুসলমানরা তখনও জিয়িররানায়। এ সময় দুশমন কবিলা হাওয়াজেনের কিছু শীর্ষস্থানীয় লোক প্রতিনিধি হয়ে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে এলেন। রাসূলের তাঁবুতে তাদের পৌঁছানো হলো। মুজাহিদীন তাঁর চার পাশে নাঙ্গা তরবারী নিয়ে দণ্ডায়মান। কেননা এসব লোকের ওপর কোন বিশ্বাস নেই। যখন তখন যে কাউকে তারা হত্যা করতে পারে।

তায়েফ অবরোধের পূর্বেই হাওয়াজেন গোত্র তাদের অগাধ মাল-সম্পদ, স্ত্রী-কন্যা হারিয়েছিল। মুসলমানদের হাতে হুনায়ন যুদ্ধে এরা বন্দী হয়েছিল।

তদানীন্তন সমরনীতি অনুসারে এগুলো যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবেই পরিগণিত হতো। ফিরিয়ে দেবার কোন রেওয়াজ ছিল না। এরপরও আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেন যুদ্ধের পর পর যে মুসলমান হবে মাল-সম্পদ ও স্ত্রী-কন্যা তাদের ফেরৎ দেয়া হবে।

প্রতিনিধি প্রধান বলেন ঃ 'হে মোহাম্মদ (সাঃ), আমাদের গোটা খান্দানই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছে এবং আপনাকে তাঁর রাসূল সাব্যস্ত করেছে। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেন, 'কসম খোদার! তোমরা কামিয়াবীর রাহায় এসেছ। এটাই সীরাতে মুস্তাকীম।'

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বধূ-মাতা ও সহায়-সম্পদ ফেরৎ দিবেন কি?'

'আমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা যা হারিয়েছ এর ওপর কোনই অধিকার নেই তোমাদের। অবশ্যই সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার একত্ববাদের ওপর ঈমান এনেছ তোমরা, কাউকেই আমি নিরাশ করব না। তোমাদের সহায়-সম্পদ প্রিয়, না তোমাদের বধূ-মাতা?'

'আমাদের বধূ-মাতা-ই প্রিয়!' প্রতিনিধি মুখপাত্র বললেন।

রাসূলে খোদা (সাঃ) রহমত বশতঃ হুকুম দিলেন, হাওয়াজেন গোত্রের নারী-পুরুষদের ফিরিয়ে দেয়া হোক।

হাওয়াজেন কবিলা ধারণাও করতে পারেনি যে তাদের বধূ-মাতাদের ফেরৎ দেয়া হবে। এ অভাবনীয় উদারতা দেখে হাওয়াজেনের সমস্ত মানুষই ইসলাম গ্রহণ করে।

এ ঘটনার ঠিক তিন দিনের মাথায় জনৈক অপরিচিত লোক মুসলিম শিবিরে এল। তার মাথা ও মুখে ছদ্মবেশ। স্রেফ চোখ দেখা যাচ্ছিল তার। তাকে থামিয়ে দেয়া হলে সে নাম পরিচয় ছাড়াই রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে দেখা করতে চাইল।

'তুমি কি তায়েফ থেকে আসোনি?' প্রশ্ন জনৈক মুজাহিদের।

'হ্যাঁ!'

এই মুজাহিদ উষ্ট্রচালক ও রাখালবেশী হয়ে তায়েফে কিছু দিন গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। ছাকীফের যুদ্ধংদেহী লোকদের আনাগোনার প্রতি পর্যবেক্ষণ করার জন্যই তাদের এই গোয়েন্দাগিরি। এই লোককে তায়েফের এক বসতি থেকে বের হতে দেখে ওই মুজাহিদ তার পিছু নেন। তার মতে ওই লোকের চলাফেরা ছিল সন্দেহজনক।

'তোমাকে আমি তায়েফ থেকে বেরোতে দেখেছি, 'মুজাহিদ বললেন, 'কসম খোদার! তুমি যে আশায় এখানে এসেছ তা পূরণ হবে না।'

'যে আশায় আমি এসেছি তা পূরণ হবেই হবে। তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহর কাছে যেতে দেবে না?' আগন্তুক বললেন।

'তার আগে তোমার নেকাব খুলতে হবে।'

আগন্তুক গালপাট্টা উন্মোচিত করলেন।

'কসম খোদার! তুমি তো দেখছি মালেক বিন আওফ। আমরা তোমার পথ আগলাতে পারি না।'

দু'তিনজন মুজাহিদ তার সঙ্গ নিলেন এবং তাকে রাসূলের খিমায় নিয়ে গেলেন।

'ইবনে আওফ! তুমি কি সন্ধি প্রস্তাব, না অন্য কোন উদ্দেশে এসেছো?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন।

'আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি।' মালেক ইবনে আওফ বললেন।

আল্লাহর নবী তায়েফের যুদ্ধংদেহী কবিলার প্রধান মালেক ইবনে আওফকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান বানান।

মালেক ইবনে আওফ কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন, এ প্রশ্নের জবাবে ইতিহাসবেত্তারা খামোশ। তার ওপর কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা ছিল না। ইনি তো সেই লোক যিনি মুসলমানদের তায়েফ অবরোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং মুসলিম সেনাদের তাঁবু গোটাতে বাধ্য করেছিলেন। তারপরও তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন? তাহলে কি তিনি হাওয়াজেন গোত্রের সাথে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অকল্পনীয় ব্যবহারে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন? মোটকথা তার ইসলাম গ্রহণে তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়। পরবর্তীতে তিনি বেশ কটা ইসলামী জেহাদে শরীক হন।

॥ দুই ॥

এর ঠিক ৬৫ বছর পর ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দের একটি ঘটনা। তায়েফের জনৈকা মা অন্তঃসত্ত্বা। বাচ্চা প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে তার। তার স্বামী পদস্থ ফৌজি অফিসার। স্বামী ছুটিতে বাড়ী এলে তিনি তাঁকে এ সংবাদ জানান।

তিনি তাকে আরো জানান, 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। খুবই পেরেশান হয়েছি তা দেখে। দেখলাম, আঁচমকা আমার ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। জমকালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। ভয় ও পেরেশানীতে মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠল। মন বলছিল, কিছু একটি হতে যাচ্ছে–কিন্তু কি হবে? জানতাম না। ঘরে আমি একাকিনী। কাউকে ডাকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। দৌড়ে পলায়ন করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু চলছিল না কদম। ভেবে পাচ্ছিলামনা কি করব---

আল্লাহকে স্মরণ করব? আওয়াজ বেরোচ্ছে না, তবে দোয়া করছিলাম বিড়বিড়িয়ে। এ সময় আকাশে একটি তারকা নজরে ভাসতে লাগল, একটু আগেও এটিকে দেখিনি। ক্রমেই এটি দেদীপ্যমান হতে লাগল। জমকালো আঁধারের মাঝে রওশন তারকা ছিল ওই একটিই। তারকাটি ক্রমশঃ নীচে নামছিল, সেই সাথে তিমিরাচ্ছন্নতাও যেন বিদায় নিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রওশন তারকার একটি গোলা যেন আমাদের আঙিনায় এসে আছড়ে পড়ল। এর রোশনাইতে আমাদের ঘর রওশন হলো। এ রোশনি জমিনের রোশনি নয়, আসমানের নূর বলেই প্রতিভাত হলো। এ সময় আমার মনের ভয় দূর হলো, হৃদয় শান্ত হলো এবং চোখ খুলে গেল।'

'স্বপ্নটা খারাপ নয়।' বললেন স্বামী।

'কিন্তু জমকালো আঁধার কেন? সেই আঁধারের কথা মনে পড়লে মন এখনও শিউরে ওঠে। আপনি কোন আলেম কিংবা স্বপ্নবৃত্তান্তকারীদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানুন তো।' স্ত্রী বললেন।

'ললাট লিখন কেউ-ই খণ্ডাতে পারে না। স্বপ্নের তাবীর উত্তম না হলে তা কেউ টলাতে পারবে কি?'

'আমার যা বিশ্বাস। স্বপ্নের অর্থ উত্তম-ই হবে। আপনি একটু জিজ্ঞাসা করুন।' স্ত্রীর কণ্ঠে মিনতি।

বিবির পীড়াপীড়িতে স্বামী স্বপ্নের নামকরা ব্যাখ্যাতা ইসহাক ইবনে মূসার কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা খুলে বলেন। ইসহাক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিনি লোকটার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে তার রেখার প্রতি গভীর নযর রাখেন। সহসা তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং হাত ছেড়ে দিলেন।

'বলো ইবনে মুসা। স্বপ্ন খারাপ হলেও বলতে দ্বিধা করো না।'

তাবীর খারাপ নয়, ইসহাক ইবনে মুসা বললেন, তোমার বিবির গর্ভে এক অসাধারণ সন্তান জন্ম নিবে। উজ্জ্বল তারকার মত খ্যাতিমান হবে সে। গোটা বিশ্ব তাকে দেখবে। দূর-দরাজে সে আল্লাহর দ্বীনের আলো বিস্তৃত করবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনাগত বংশধর তার স্মৃতি রোমন্থন করবে। তাঁর নামেই লোকেরা তোমাকে চিনবে। তার হুকুমেই ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে পড়বে। ইসহাক ইবনে মূসা এ পর্যন্ত বলে খামোশ হয়ে গেলেন। মনে হলো কি একটা কথা এখনও বাকী রয়ে গেছে।

'কসম খোদার। ইবনে ইসহাক তোমার খামোশী অর্থহীন। আমি খারাপ খবর শোনার জন্য প্রস্তুত, আমাকে দোটানায় রেখো না। তোমার গুণ-জ্ঞানে যা ধরা পড়েছে বলো তার সবই।'

'তাহলে শোন, যে তারকা তোমার ঘরে আসছে অচিরেই তা খসে যাবে। তারকাটির দেহ খসে গেলেও তার নাম জিন্দা থাকবে এবং তার অন্তর্ধানে তোমার বাড়ীতে কোন জমকালো আঁধারের সৃষ্টি হবে না। সে হয়ত থাকবে না কিন্তু লোকেরা বলবে, সে আছে।'

'আমি তার প্রতিপালন এভাবে করব যাতে সে ইসলামের এক নিবেদিত মুজাহিদ হতে পারে।'

'ওর প্রতিপালন তুমি করতে পারছ না, করবে ওর মা।'

' কেন পারব না? কোথায় চলে যাব আমি?'

'যা বলার বলে দিলাম।'

স্বামী এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্ত্রীকে শোনালে সে খুব খুশী হলো কিন্তু তার সন্তানের কম আয়ুর কথা জেনে সে দুঃখিত হলো।

॥ তিন ॥

বাচ্চা জন্মের কিছুদিন পূর্বে বাবা যুদ্ধে গেলেন এবং দুশমনের হাতে শাহাদতবরণ করলেন। ইসহাক ইবনে মূসার ভবিষ্যদ্বাণী পুরা হলো, বাচ্চার প্রতিপালন তুমি করতে পারছ না, করবে ওর মা। তিনি পরে আরো বলেছিলেন যে, স্বপ্নে ঘর তিমিরাচ্ছন্ন হবার অর্থ হলো, স্বামীর মৃত্যু আর শোক নামার পাশাপাশি আসমানের তারকার আগমন ঘটবে।

তায়েফ থেকে অনেক দূরে এ শিশুর বাবা শাহাদাত বরণ করেন। এর কিছুদিন পর তাঁর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তার প্রশস্ত ললাট টানাটানা চক্ষু এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর বহন করছিল।

সদ্যভূমিষ্ঠ এই শিশুর বাবার নাম ছিল কাসিম বিন ইউসুফ। শিশুটির নাম রাখা হলো 'মুহাম্মদ'। পরবর্তীতে ইতিহাসে এই শিশু 'মুহাম্মদ বিন কাসিম' নামেই খ্যাতি লাভ করে।

কাসিম বিন ইউসুফ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন আপন দু'ভাই। তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের খলীফা ছিলেন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান। এঁরা দু'ভাই-ই ছিলেন বীর ও নিপুণ যোদ্ধা। ফৌজে উভয়েরই ছিল উচ্চাসন। এ সে যুগের ঘটনা, যে যুগে মুসলমানদের ঐক্যে চিড় ধরেছিল, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ লাগত। এমনকি মতানৈক্যের এ ধারা খেলাফতেও লেগেছিল পুরোদস্তুর। খেলাফত শাম ও মিসর পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইরাক ও হেজাযে স্বাধীন-সার্বভৌম হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উমাইয়া খেলাফত অস্বীকারের ফলশ্রুতিই তাঁর এই হুকুমত প্রতিষ্ঠার কারণ।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পৌত্র। তিনি এজিদ ইবনে আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে হেজাজ ও ইরাকের মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। এজিদপুত্র মুয়াবিয়া ইবনে এজিদ খেলাফত থেকে সরে পড়ার পর পুরোদস্তুর উমাইয়া শাসনের সূত্রপাত ঘটে। সম্ভবতঃ এরপর থেকেই বনী ফাতেমার প্রতি অবর্ণনীয় নিপীড়ন নেমে আসে। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যিনি আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বড় বোন আসমা (রাঃ)-এর ছেলে, এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

উমাইয়ারা সর্বাগ্রে ইবনে যুবায়েরের খেলাফতকে নাস্তানাবুদ করতে ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং পরে পবিত্র হেজাযে আক্রমণ চালায়। উভয় হামলার সেনাপতি ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হেজায অবরোধ করার পর অবরোধ থেকে ইবনে যুবায়েরকে বেরিয়ে আসতে নিষ্ঠুর হাজ্জাজ পবিত্র মক্কা শরীফের কাবাঘরে পাথর বর্ষণ করেন। এতে কাবা শরীফের মারাত্মক ক্ষতি হয়। শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতি এ যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং কাবার সম্মান রক্ষার্থে শাহাদাতকেই বেছে নেন ইবনে যুবায়ের। জুলুম ও বর্বরতার মূর্ত প্রতীক হাজ্জাজ খলীফা আব্দুল মালিকের রাজ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টিকারীদের ও বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পরিণতি থেকে সকলকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে তিনি তাঁর লাশকে শূলিবিদ্ধ অবস্থায় চৌরাস্তায় টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তার ভয়ে লোকেরা এই মহান সাহাবীর লাশ স্পর্শ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি।

ইবনে যুবায়েরের আম্মা হযরত আসমা ওই সময় খুবই বৃদ্ধা ছিলেন, তদুপরি ছিলেন দৃষ্টিহীন। তিনি লাঠি ধরে ধরে চৌরাস্তায় এলেন যেখানে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের লাশ ঝুলছিল। তিনি কম্পিত হাতে লাশ স্পর্শ করে একটি কবিতা পড়েন, যার অর্থ হচ্ছে এই ঃ 'এ কোন শাহ সওয়ার যে এখনও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে না?'

ইবনে যুবায়েরের শাহাদতের পর হেজায উমাইয়াদের অধীনে চলে আসে। হাজ্জাজ তার কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এর গভর্নর নিযুক্ত হন। দেশে যুদ্ধবিগ্রহের যবনিকাপাত ঘটে।

এ দিকে ইরাকের খারেজীরা এ মর্মে গুজব ছড়ায় যে, খলীফা তাদের মস্তক চূর্ণ করতে হাজ্জাজকে পাঠাচ্ছেন। হলোও তাই। হাজ্জাজ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইরাক জয় করেন।

এই যুদ্ধে হাজ্জাজের বড় ও অপূরণীয় ক্ষতি যা হলো, তা হচ্ছে এই যে, তার বড় ভাই যিনি তার দক্ষিণহস্ত ছিলেন শাহাদত বরণ করলেন। তাঁর ঘরের উদীয়মান তারকার ঝলকানী দর্শনের নসীব হলো না। এ সেই তারকা যে তার চাচার বর্বরতাকে অনেকটা ঢেকে দিতে পেরেছিলেন। বীরত্বের এমন প্রবাদ পুরুষ বনেছিলেন যে, দুশমনরা তাঁর পূজা শুরু করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের ভাতিজা ও কাসিম বিন ইউসুফের নয়নমণি।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন খুশীর মিছিলে বেদনার প্রলেপ পড়ে। নবজাতকের বাবা এতে শরীক হতে পারলেন না। প্রসূতি মা শোকে বিহ্বল। হাজ্জাজ খবর পেয়ে দ্রুত চলে আসেন। তিনি বাচ্চাকে কোলে তুলে নেন। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করেন।

'ওর বাবা এ জগতের সফর শেষ করেছেন। কিন্তু ওকে এতিম ভেবো না ভাবী। আমি হাজ্জাজ জীবিত। আমাকেই ওর বাবা মনে কর। তোমার অজানা নয় কাসিম আমাকে কি পরিমাণ পেয়ার করতেন। সে আমাকে তোমার স্বপ্ন ও ইসহাক ইবনে মূসার তাবীর সম্পর্কে বলেছিল। তায়েফের নয় আমি ওকে গোটা আরব

জাহানের উজ্জ্বল নক্ষত্র বানাব। নিজকে বিধবা ও নিঃস্ব ভেবো না। এই বাচ্চার দাদার রক্তের শপথ। ওকে আমি শিক্ষা-দীক্ষায় এমন করে গড়ে তুলব যাতে অনাগত ভবিষ্যতের হৃদয়ে ও চির অম্লান থাকে। হাজ্জাজ শিশুর মাকে সান্ত্বনা দিলেন।'

হাজ্জাজের এই বাক্য প্রথাগত কিংবা আবেগ তাড়িত ছিল না। তিনি এই বাচ্চার শাহী তালীম–তরবিয়তের এন্তেযাম করেছিলেন। নিয়োগ করেছিলেন সুনিপুণ গৃহশিক্ষক। আশৈশব তাকে জঙ্গী ট্রেনিং দেয়া হয়। মাটির পুতুল কিংবা কাঠের বল নয়–সেই শৈশব হতেই তার হাতে তুলে দেয়া হয় তলোয়ার, তীর, ধনুক ও বল্লম। এ প্রশিক্ষণ থেকে ঘোড় সওয়ারীও বাদ যায়নি।

পিতার অনুপস্থিতি পুত্রের জীবনে যতটুকু অনুভব করার কথা, মা সেটা পুষিয়ে দেন। মায়ার আঁচলে বন্দী নয় পুত্রকে মর্দে মুজাহিদ হিসাবেই গড়ে তুলেন তিনি। তাকে একবার হাজ্জাজ বলেছিল, তোমার পুত্র মামুলি সেপাই নয় ভাবী, কমান্ডার-ইন-চীফ হবে। স্রেফ কমান্ডারই নয়, সে আরব জাহানের খলীফা হবে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তীক্ষ্ণ মেধা ছিল। যার বদৌলতে খলীফা তাকে প্রথম হেজাজ, ইরাক পরে বেলুচিস্তান, সবশেষে মাকরানের গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত করেন। হাজ্জাজ জালেম প্রজাপীড়ক হলেও তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায়েব শাসন প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত। ছিলেন ঠোঁটকাটা প্রকৃতির। খলীফা নিজেও তার এই গুণের কথা জানতেন।

॥ চার ॥

এই হাজ্জাজ-ই তার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে নিজের মত করে লালন-পালন করেছিলেন।

৭০৫ খ্রীঃ খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের ইন্তেকাল হলে তাঁর বড় পুত্র ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক খেলাফতের মসনদে বসেন। তিনি বাবার মত তীক্ষ্ণ ও সুদক্ষ ছিলেন না। ভাগ্য ভালো, তার পিতা বিদ্রোহী ও দাম্ভিকদের মূলোৎপাটিত করেছিলেন। খারেজিদের কণ্ঠানলী টিপে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর বাহিনীতে ছিলেন, কুতায়বা ইবনে মুসলিম, মুসা ইবনে নুসায়েব ও মুসলিম ইবনে আব্দুল মালিকের মত নির্ভীক ও দূরদর্শী সমরনায়ক।

নয়া খলীফার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হচ্ছে তিনি হাজ্জাজের মত সুদক্ষ এবং কঠোর উপদেষ্টা পেয়েছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন সালার অপর দিকে ছিলেন পূর্বের প্রদেশগুলোর গভর্ণর।

হাজ্জাজ নয়া খলীফার দুর্বলতাগুলো ধরে ফেললেন এবং তাঁর বিরোধিদের হাত করে নিলেন।

একবার তিনি তায়েফ গেলেন, দীর্ঘদিন পরে তিনি এখানে এলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মা এ খবর শুনে তাঁর বাড়ী এলেন।

'তুমি এলে কেন? তোমার বাড়ী যাব না এ কথা মনে করে কি এবং তোমার কাছে গিয়ে আমার ভাইয়ের আমানত দেখতে চাইব না–এ জন্যে বুঝি চলে এলে? কোথায় মুহাম্মদ? ওকে দেখতেই তো আমার আসা।' বললেন হাজ্জাজ।

'আল্লাহ্ আমার ভাইয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। আমি ওকে নয়া ঘোড়া কিনে দিয়েছি। প্রথম প্রথম ও উদাসীন হয়ে ঘোড়া ছোটাত। এখন যে ঘোড়া কিনে দিয়েছি তাতে সে শাহ সাওয়ারী করে। মুহাম্মদ জোয়ান হয়েছে। এক্ষণে ওকে জঙ্গী ঘোড়ায় চড়ানো দরকার। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে। আল্লাহ ওটি যেন ওর আয়ত্তে থাকে। ঘোড়াটি বড্ড বেয়ারা। ইবনে কাসিমের মা বললেন।

'আল্লাহ্ ও যেন মাটিতে আছড়ে পড়ে। পতিত হয়ে ওর ওঠার ট্রেনিং দরকার। ঘোড়ার পিঠে চড়ে শাহ সওয়ার হওয়া যায় না, হতে হয় তার পদতলে চাপা খেয়ে---আর শোন বোন ঘরে ফিরে এলে ওকে বুকে টেনে নিবে না। দেহ থেকে খুন টপকে পড়লে ওড়না ফেড়ে মুছে দিবে না। মাথায় পট্টি বাঁধবে না। ওকে ওর খুন দেখতে দাও। বুঝতে দাও, এ খুন কার---আমিই তোমার ঘরে আসছি।'

কিছুক্ষণ পর ভাইয়ের বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মা এ খবর শুনে বাইরে বেরুলেন। হাজ্জাজ শুধু তার মৃত স্বামীর বড় ভাই নন বরং একজন নামকরা গভর্ণরও। মুহাম্মদের বাড়ীতে তাই তার আসা অস্বাভাবিক নয়। খানিক বাদে ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেল। তিনি সেদিকে তাকালেন। জনৈক সওয়ার দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে তার দিকে আসছিল। হাজ্জাজ তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বিধবা ভাবী তার কাছে দণ্ডায়মান।

সওয়ার তাদের কাছ দিয়ে অতিবাহিত হলো। ঘোড়ার গতি এতটুকু কমাল না সে। হাজ্জাজের দিকে ফিরেও তাকাল না। হাজ্জাজের চেহারায় বিরক্তির ছাপ। এটা দাম্ভিকতা বৈ তো নয়। বনি ছাকাফী গোত্রের তায়েফবাসীর নয়নমণি তিনি।

'মনে হচ্ছে কবিলার ছেলেরা আমাকে বেমালুম ভুলেই গেছে। আমাকে প্রভাবিত করার জন্য ছেলেটা ওভাবে চলে গেল। জানো, কে এই ছেলে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'তোমারই বেটা মুহাম্মদ।' মা বললেন, 'না! আমার বেটা এতবড় হতে পারে না। মুহাম্মদকে তো কতো ছোট দেখে গেছি।'

কদ্দুর গিয়ে ইবনে কাসিম ঘোড়ার মোড় পরিবর্তন করল। ফিলে এলো পূব গতিতেই। এবারও তার ঘোড়ার গতি বলছিল সে থামবে না। কিন্তু হাজ্জাজ গতিরোধ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সে চাচার দিকে এগুলো। তিনি ওকে বুকে চেপে ধরলেন।

'ঘোড়াটি উত্তম। সওয়ার এর চেয়েও।' বললেন হাজ্জাজ।

'আপনাকে চমকে দেয়ার জন্য প্রথমে ওকে থামাইনি।'

'কসম খোদার! তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি।'

ইবনে কাসিম অন্দরে গেল।

'তোমার বেটা জোয়ান হয়েছে। ওকে আমি সাথে নিয়ে যাব।'

ইবনে কাসিমের মায়ের চোখে আঁসু উছলে ওঠল। মুহাম্মদের বয়স এখনও ষোলতে পড়েনি। মায়ের নজরে ও এখনও বাচ্চা। কিন্তু দেহ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবে পূর্ণ যুবক।

'প্রিয় বোন! এ আমানত কওমের কাছে হাওয়ালা করা দরকার তোমার। মুহাম্মদ তোমার নয়, ইসলামের বেটা। ওকে ওর বাবার স্থান দখল করতে হবে। আরো উপরে উঠতে হবে। আলমে ইসলামের চমকদার সেতারা হতে হবে ওকে।' বললেন হাজ্জাজ।

'আমি যেন এখনও খাব দেখে যাচ্ছি। আমি আমাকে ওই দিনের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যেদিন আমার কলজের টুকরা হামেশার জন্য জুদা হয়ে যাবে।

'আমি ওকে বসরা নিয়ে যাব। ওর জঙ্গী ট্রেনিং ও অন্যান্য শিক্ষা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। এক্ষণে ওকে ময়দানে নামাতে হবে। উমরাহদের মজলিসে হাযির করতে হবে। তাদের সামনে জঙ্গী কারিশমা দেখাতে হবে।'

॥ পাঁচ ॥

বসরায় হাজ্জাজের গভর্ণর হাউজ।

ওই হাউজে একটি কক্ষ ছিল। শাহী কক্ষের সাথে তাকে তুলনা করলে অত্যুক্তি হবে না। হাজ্জাজের একমাত্র মেয়ে নাম লুবনা। হাজ্জাজ তায়েফ এলে তাঁর মেয়ে বসরাতেই ছিল। মেয়েটি নব যৌবনা। রাতে তার কক্ষের দরোজায় হালকা টোকা পড়ল। লুবনা কড়া নাড়ার অপেক্ষায় থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তী হালকা কড়া নাড়ার শব্দে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আস্তে খিড়কী খুলে ও বাইরে উঁকি মারল। এরপর বাইরে পা রাখতেই এক তরুণ এগিয়ে এলো। লুবনা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'চলো এখান থেকে সামনে যাই।' লুবনা বললো, দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। খিড়কি বন্ধ করে দাও সুলায়মান।'

সুলায়মান খিড়কি বন্ধ করল। বাগানে চলে গেল দু'জনা।

খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের ছোট ভাই সুলায়মান। বয়স ষোল কিংবা সতের। লুবনার বয়সও এমন। একই ওস্তাদের শিষ্য ওরা। সেই শৈশব ধরেই লুবনা সুলায়মানের হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে ছিল। যৌবন আসতেই ওদের দু'জনার ওপর বিশেষ সতর্কতা আরোপ হয়। দু'জনই শাহী খান্দানের। সুতরাং বদনাম হয় এমন কোন ভয় ওদের ছিল-ই না। স্রেফ দেখা সাক্ষাৎ করতে পারত ওরা। লুবনার যত ভয় ওর বাবাকে নিয়ে, কেননা তিনি বড্ড শক্তপ্রাণ।

'আমরা এ লুকোচুরি কদিন খেলব কমার? সুলায়মান লুবনাকে প্রশ্ন করে। সুলায়মান প্রীতিভরে লুবনাকে কমার নামে ডাকত। 'ভাইয়াকে বলব তিনি যেন আমাদের বিবাহ করিয়ে দেন।'

'তোমার ভাই হয়তো মেনে নিবেন কিন্তু আমার আব্বা মেনে নিবেন কি-না জানি না।' লুবনা বললো।

'আমীরুল মুমিনীনের ভাইয়ের কাছে কন্যাদানে তিনি অমত করবেন?'

'কেন তাকে তোমার জানা নেই? যে কোন ফয়সালা নিতে তিনি কারো পরোয়া করেন না। খলীফার প্রভাবে এতটুকু প্রভাবিত নন তিনি।'

'আমার স্থলে তিনি আর কাউকে নির্বাচন করলে তখন তুমি কি করবে?'

'তাঁর নির্বাচনকেই প্রাধান্য দেব।

'আমীরুল মুমিনীনের ভাই-বৌ হতে না পারার আফসোস হবে না তোমার? আমার সহধর্মিণী হলে তুমি যা হাসিল করতে পারবে জগতের অন্য কারো হলে তা পারবে না।'

'সুলায়মান! আশৈশব আমরা একে অপরকে চেয়ে আসছি। তখন ছিলে তুমি আমীরুল মুমিনীনের পুত্র। তুমি এক শাহজাদা–এ জন্য তোমায় কামনা করিনি। আমার কাছে তুমি ভালো মনে হতে তাই। তুমি ভিখিরির ছেলে হলেও আমার কাছে শাহজাদা মনে হতে। এক্ষণে হয়ত তুমি আন্দায করতে পারছ না, আমি কার মেয়ে।'

'এতো আমি আজো ভাবছি না যে, তুমি হাকেমে 'আলার মেয়ে।'

কিন্তু তুমি এটা অবশ্যই ভাবছ যে, আমি আমিরুল মুমিনীনের ভাই। আর এই পদমর্যাদার দরুন আমার গর্ব করা উচিত। শুনে নাও সুলায়মান! আমি কেবল সেই যুবরাজের ওপর গর্বিত, যে প্রকৃতই আমাকে ভালবাসে এবং যে দেখে না সে কার পুত্র আর আমি কার মেয়ে।'

'আজ তুমি এ কেমন গোলমেলে কথা বলছ কমার!' সুলায়মান গাঢ় কণ্ঠে বললো, দেখছ কি প্রেম-পূর্ণিমা স্নাত এ রজনী?

'আমি তোমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিনা সুলায়মান। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এভাবে রাতে আসা-যাওয়া কঠিন। কামরার দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। খিড়কি পথে বেরিয়েছি আমি। আমি আর সেই অবুঝ ছোট্টটি নই। আর সুলায়মান---আমি ধারণা করছি আমাকে হয়ত অচিরেই কারো বউ হতে হবে। অথচ এখনও তোমার জানা নেই আমার বংশীয় মর্যাদা কি?'

'আমাদের সম্পর্ক ভালবাসার। যদ্দ্বারা আমরা বিয়ের পিড়িতে বসতে পারি। আমাদের খলীফাদের নিয়ম কোন মেয়ের প্রতি চোখ পড়লে তাকে বিয়ে করে ফেলি। একজন খলীফার তাই অসংখ্য স্ত্রী।'

'আমি ওকথা বলছি না। আমি ইসলামী বীর সেনানীদের সম্পর্কে বলছি। বলছি ওই সব জ্বলন্ত বারূদের কথা যারা বজ্র হুংকারে রোম-ইরানের তখতে তাজ উল্টে দিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য কোথায় কোথায় বিস্তীর্ণ করেছিলেন। আর এখন দেখ! আমরা কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছি। কোথাও বিদ্রোহের দাবাগ্নি জ্বলে ওঠতেই রোমের তলোয়ার আমাদের গর্দানে পৌঁছে যাচ্ছে। কি অঢেল অর্থের বিনিময়ে আমরা রোমের সাথে মৈত্রী করেছি-তা তুমি জানোনা? মজলুমকে নিরাপত্তা দিত যে

জাতি সেই জাতি আজ অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তা খরিদ করছে। এই চুক্তির মাধ্যমে দুশমনকে আমরা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা এতই কমযোর যে আমাদের দেশ ও ধর্মকে দুশমন হতে প্রতিরোধ করার শক্তিও শেষ হয়ে গেছে।'

'কমার আমার! ওই সব পেচাল পেরে তুমি আমার প্রেমপূর্ণ রজনীর বুকে ছুরি মেরে চলেছ। তোমার চাঁদনীমাখা মুখে এ ধরনের বেরসিক কথা যেন আমার কানে তপ্ত সীসা বর্ষণ করছে। তুমি যে কথা বললে মনে করছ কি তা আমি জানিনা। ভাইয়ের পর আমি খেলাফত পাচ্ছি–এটা হয়ত তোমার অজানা নয়।

'এবার আমাকে উঠতে হয়।' উঠতে উঠতে বললো লুবনা, 'মা আঁচ করতে পারলে---।'

'তিনি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। কি হোল কমার তোমার। পূর্বেতো তুমি এমন ছিলে না।' সুলায়মানও উঠে দাঁড়াল।

লুবনা চলতে শুরু করল, সুলায়মান ওকে অনুসরণ করল।

'তুমি কি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে চলে যাচ্ছ?' প্রশ্ন সুলায়মানের।

'না সুলায়মান। তোমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করব কেন? তুমি বিয়ের কথা বলেছ। আমাকে খানিক ভাবতে দাও। ভাবতে দাও সুলায়মান।'

খিড়কি পর্যন্ত এসে ভেতরে চলে গেল লুবনা।

এর কিছুদিন পর তায়েফ থেকে ফিরলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তার সওয়ারী মহলের দেউড়ীতে থামলে লুবনা দৌড়ে বেরোল। হাজ্জাজ ঘোড়াগাড়ী থেকে নামলে লুবনা তাকে জড়িয়ে ধরল। বাবা মেয়েকে সীনায় চেপে রাখলেন। লুবনার দৃষ্টি ঘোড়াগাড়ীর প্রতি নিবদ্ধ। ওখানে লম্বাদেহের সুঠাম এক যুবরাজ উপবিষ্ট। চেহারায় তার বলিষ্ঠ পৌরুষের ছাপ। বাবার বুকে মিশে ছিল লুবনা। তার বাযু খানিক ঢিল হয়ে এলে লুবনা এবার যুবককে ভালো করে দেখতে পেল।

'এসো মুহাম্মদ।' হাজ্জাজ নওযোয়ানকে আহ্বান জানান।' ও আমার মেয়ে লুবনা---আর দেখ বেটি, ও তোমার চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইবনে কাসিম। জীবনে এই প্রথম হয়ত ওকে দেখছ। ও আমার ভাইয়ের সাক্ষাৎস্মৃতি। আমাদের এখানে থাকবে কিছু দিন।'

চাচার মহলে অবস্থান মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের। লুবনা ওর সাথে সামান্য কথাবার্তাই বলতো। তবে তা শালীনতা বজায় রেখেই। কোন এক সন্ধ্যায় মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বাগানে পায়চারী করছিলেন। হাটতে হাটতে বাগানের একটি কোণ তার কাছে খুবই ভালো মনে হলো। দু'টি গাছের শাখা একত্রে মিলে যেন কানাকানি করছে। শাখা দুটি পুষ্পবহুল। ঋতুরাজ বসন্তের দিন। ওগুলো যেন গাছের মাথাকে ছাদ বানিয়েছে। মুহাম্মদ জায়গাটাকে খুবই পছন্দ করলেন। এর নীচে এসে তিনি বসে পড়লেন।

লুবনাও তাকে দেখে ফেলে। চুপি চুপি সেও এগিয়ে যায় তাঁর কাছে। 'চুপ করে বসে আছ কেন মুহাম্মদ?' প্রশ্ন লুবনার।

'পুষ্পের এই নৈসর্গিক ছাদ আর দেয়াল খুবই ভাল্লাগছে–তাই আর কি।'

'আমিও কি বসতে পারি?'

'না!'

'কেন?'

'ভাল্লাগবে না। চাচাজান দেখে ফেললে ভালো মনে করবেন না। আমি তোমার সাথে নিরিবিলিতে বসতে চাই না।'

'নিরিবিলিতে তো আমিও বসতে চাইনা।' বলেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল লুবনা।

'চেয়ে দেখ। সন্ধ্যা আঁধারী পড়ে গেছে। এ সাঁঝবেলায় যুবক-যুবতীর নির্জন বাস ঠিক নয়। তুমি কি এমনিতেই, না আমাকে দেখে এদিকে এসেছ?'

'দেখি তো তোমায় প্রতিদিনই। একাকী ভয় লাগছিল। একটা কথা বলবে? আমাকে কি তোমার ভাল্লাগছে না, না-কি আমার এদিকে আসাটাকে তুমি মেনে নিতে পারছ না?

'শেষেরটাই ঠিক। পরিষ্কার বলছি, তোমাকে আমার ভাল লাগে না। তোমার হৃদয়ের কথা আমাকে তোমার ওই দুটি চোখ ও মুচকি হাসি বাতলে দিয়েছে। এসো হেঁটে হেঁটে কথা বলি যাতে কেউ খারাপ ধারণা না করে আমাদের প্রতি।'

'মুহাম্মদ!' লুবনা তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি এখন কি করবে?'

'একটা স্থায়ী লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাব। যে ট্রেনিং আমি পেয়েছি তা আমাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেবে না কিছুতেই।'

'তুমি তাহলে সালার হবে?'

'কোন পদ মর্যাদার লোভী নই আমি। আমার চোখের সামনে একটিই রাস্তা। এরদ্বারা জাতি যেন পথের দিশা পায়। লুবনা! রাস্তা যাই হোক হাজারো লোক সে পথে অতিক্রম করে, যে-ই যায় কিছু চিহ্ন রেখে যায়। পরবর্তী চলমান লোকেরা এসে পূর্ববর্তীদের সে পদরেখা মিশিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু লোক এমনও থাকে যাদের পদরেখা মুছে না। পথহারা পথিক তাদের পদাংক অনুসরণ করে পথ খুঁজে পায়। আমিও এমন কিছু পদাংক অনুসরণ করে ফিরতে চাই।'

'কার পদাংক অনুসরণ করতে চাও?'

'খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর। এই তালিকায় আছে আরো কিছু নাম। তাঁরাই আমার দিশারী। ইসলামী খেলাফতের সীমা আরো বহুদূরে নিয়ে যেতে চাই। সালার নয়, আল্লাহর এক নগণ্য সেপাই হওয়াই আমার এক্ষণের অভিলাষ।'

লুবনা তাঁর সাথে চলছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের কথাগুলো এমন নয় যে, সে স্বপ্ন দেখছে। তাঁর কথায় ছিল দৃঢ়তার ছাপ।

'আর লুবনা---। তিনি বলে চললেন, 'আমি আমার মায়ের স্বপ্নের তাবীর। অবশ্য সেই তাবীর সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেনি এখনও। আমাকে সেই রওশন সেতারা হতে হবে–মা আমার স্বপ্নে যা দেখেছেন।'

চলতে চলতে ওরা মহলের বারান্দায় এসে উপনীত হলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম খামোশ হয়ে যান এ সময়।

'তুমি যাও লুবনা। আমি একাকীই ভেতরে যাব।'

লুবনা তাঁর সামনে দাঁড়ালো। দু'হাতে ওর চেহারা ঢাকা।

'আমি খুব সম্ভব তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম প্রিয়!' লুবনার কণ্ঠে উত্তেজনা, তোমার জীবন চলার পথের সহযাত্রী হতে মন চায়, --- আমাকে গ্রহণ করবে কি?'

'আল্লাহর মঞ্জুর হলে তো---' বলে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভেতরে চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

বসন্তের মৌসুম। এ সময় দারুল খেলাফতে নানান খেলাধুলার প্রতিযোগিতা করা হত। শাহ সওয়ারী, তীরন্দাযী, তেগ চালনা ও নৌকা বাইচ এর মধ্যে প্রধান। খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে তাঁর ফৌজ সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে লেগে থাকত। আব্দুল মালিক বিদ্রোহের শেকড় মূলোৎপাটিত করেন। এ জন্যই আজ তার পুত্রের যুগে ওইসব ঝামেলা নেই। সৈন্যরা ছিল অবসর গাছাড়া তাই তাদেরকে এসব ঠুনকো প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে রাখা হত। প্রতি বছরই দারুল খেলাফতে এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে থাকত। এ প্রতিযোগিতা এমন মারাত্মক হতো যে, অনেককে মৃত্যু বরণও করতে হত। এতে অবশ্য কোন মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হত না।

এবার খলীফার দূত বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পয়গাম নিয়ে এলেন। দূত জানালেন, এ বছরের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। খেলাধুলা ছাড়াও রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ রয়েছে আপনার সাথে। হাজ্জাজ বেজায় খুশী হলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে খলীফার সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়াও সেই খুশীর অন্যতম কারণ। এ কাজ তিনি অন্য যে কোন সময়েও করতে পারতেন। তবে বার্ষিক এই প্রতিযোগিতার সময়টা একাজের জন্য শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি মুহাম্মদকে ময়দানে নামিয়ে দেখাতে চান তার ভাতিজা এই অল্প বয়সে কি রণকৌশল রপ্ত করেছে!

তিনি মুহাম্মদ বিন কাসেমকে ডেকে বললেন, 'মোহাম্মদ।' 'জানিনা তেগ চালনা, শাহ্ সওয়ারী ছাড়া লড়াইতে তুমি কতটা পূর্ণতা অর্জন করেছ। সময়টা খুবই অনুকূল। তোমাকে প্রতিযোগিতায় নামালে আমাকে লজ্জা পেতে হবে নাতো?'

'হার জিতের এক্তিয়ার আল্লাহর হাতে চাচাজান। আমার জীবন পঞ্জিতে বড়াই শব্দটা নেই, তবে ময়দানে নামলে আপনি আমাকে কাপুরুষ বলতে পারবেন না।'

'বহুত খুব। তাহলে সফরের প্রস্তুতি নাও।' হাজ্জাজ বললেন খুশী গদগদ চিত্তে।

'আমিও যাব, 'বললো লুবনা, 'তোমার মোকাবেলা আমাকে দেখতে দিবে না?'

একমাত্র জিগরের টুকরাকে নিরাশ করতে নারাজ হাজ্জাজ। মেয়েকেও তাই সাথে নিলেন।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মেয়ে ও ভাতিজাসহ দারুল খেলাফতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ভাতিজাকে খলীফার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'কসম খোদার ইবনে কাসিম।' খলীফা বললেন, 'আমাদের খান্দান কোনদিনও তোমার বাবার অবদানকে ভুলবে না। আমাদের খেলাফত রক্ষায় তিনি জীবনের শেষফোঁটা রক্তও ঢেলে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাহাদুর ও বিশ্বস্ত। আমার যদ্দুর বিশ্বাস তুমি তোমার বাবার পদাংক অনুসরণ করবে।' ইবনে ইউসুফ! খলীফা এবার হাজ্জাজকে বললেন, তোমার ভাতিজাকে কার মোকাবেলায় নামাতে চাও?'

'এ জন্যই তাকে সাথে এনেছি আমীরুল মুমিনীন। দেখতে চাই ও কি পরিমাণ বীরত্ব অর্জন করেছে।'

'বীরত্ব অর্জন করলে আমি বাবার পদ দেব তাকে।'

হাজ্জাজ ছিলেন হাকেমে আলা। তার পদমর্যাদা আজকালকার চীফ মিনিস্টারদের সমতুল্য। ওই যুগের নিয়ম মোতাবেক তাকে খলীফা নিজ মহলে থাকার ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমও এ নিয়মের বাইরে যান না। আর লুবনাকে পাঠানো হল নারী মহলে।

ওই মহলেই থাকতেন সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক। সম্পর্কে তিনি খলীফার ছোটভাই। লুবনাকে দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। চাকরানীর মাধ্যমে তিনি লুবনাকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে খবর দিল, লুবনা হাজ্জাজের ভাতিজার কক্ষে রয়েছে।

'সে যেখানেই থাক না কেন ডেকে এনো, 'সুলায়মান বললেন, 'বলো! সুলায়মান তাকে স্মরণ করেছে।'

চাকরানী আবার ফিরে এল, জানাল সে এখনও অন্দরে পৌঁছুয়নি।

'কোথায় ছিল সে? কি করছিল?' প্রশ্ন সুলায়মানের।

'হাকেমে আলার ভাতিজার কাছে। তার সাথে হেসে কথা বলছিল।' চাকরানী বলল।

'হাজ্জাজের ভাতিজা হয়ত কিছু বলেছে।'

'তিনি বলেছেন এ কক্ষে যেন আর না আসি।'

সুলায়মান রাগে অগ্নিশর্মা।

ওই দিন সন্ধ্যার ঘটনা। লুবনা মহলের একটি বাগিচায় পায়চারী করছিল। ওখানে রঙ-বেরঙের ফুল। এ অংশটি বাগানের মধ্যে সবচে নয়নাভিরাম। জায়গাটি লুবনার কাছে ভালো মনে হওয়ায় সে ওখানে গেল। লঘু পায়চারী করা কালে কে

যেন পেছনে থেকে এসে ওর নাম ধরে ডাকলো। হেসে লুবনা বলল, কেন ডাকছ মুহাম্মদ। এরপর পেছন ফিরেই লুবনা থ মেরে গেল। বললো, 'ওহো সুলায়মান! জানতাম তুমি আসবে।'

'না না, তোমার আশা ছিল ইবনে কাসিম আসবে। ওর নামই প্রথমে তোমার মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

'কেন তার নামোচ্চারণে গোনাহ হবে কি?'

'কাউকে ধোকায় রাখা গোনাহ। আমাকে ধোকার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করোনা লুবনা। ইবনে কাসিম ও আমার মাঝে তোমার ফায়সালা করা দরকার। অবশ্য এতে তোমাকে হতে হবে দূরদর্শী। আমি ভাবী খলীফা হতে যাচ্ছি। ইবনে কাসিম হবে আমার সামান্য কর্মচারী। আমি তাকে সালার থেকে সেপাইতে নামাতে পারি। এমনকি বানাতে পারি ভিখারীও। কি এমন দেখলে তার মাঝে যা আমার মাঝে নেই?'

'তাঁর মোহাব্বতে কোন খাঁদ নেই। আমি তাকে তখনও চাইব যখন সে সালার। আবার চাইব তখনও যখন সে সেপাই। ভিখারী হলে পূর্বের চেয়েও অধিক তাকে কামনা করব। আমার প্রেম তার শানে পদমর্যদা কিংবা আভিজাত্যের নিরিখে নয়।'

লুবনা একথা বলে দ্রুত স্থানত্যাগ করল। সুলায়মান ওর পিছু নেন। দৌড়ে গিয়ে পথ আটকান। এবার তিনি প্রেম ভিক্ষা চান। লুবনাকে শৈশব-কৈশোরের কথা মনে করিয়ে দেন। লুবনা ওখানে দাঁড়াতে চাচ্ছিল না। কিন্তু সুলায়মান তার পথ ছাড়তে নারাজ। বারবার তাকে বাধা দিচ্ছিলেন।

'সুলায়মান!' পেছন থেকে একটি ভারী কণ্ঠের বজ্রপাত হল।

সুলায়মান ও লুবনা এক নিমিষে কণ্ঠটির প্রতি মনোনিবেশ করল। পুষ্পকাননের পেছনে দাঁড়িয়ে আযরাঈল সম হাজ্জাজ।

'সব দেখেছি আমি। শুনেছি নিজ কানে তোমার কথা। শুনেছি আমার বেটির কথাও। প্রিয় আমার। যৌবন বড় উন্মাদনার বস্তু। তোমাকে এক্ষণে কিছুই বলব না। স্রেফ এতটুকু শুনে নাও। আমার বেটির হাত তোমার হাতে কিছুতেই সোপদ করব না। এ সিদ্ধান্ত আমার। মেয়ের নয়। তুমি জানো, তোমারই সমবয়সী আমার এক ভাতিজা আছে। ও আমার ভাইয়ের স্মৃতি। মুহাম্মদ বিন কাসিম তার নাম। আমার মেয়ে তারই বিবি হবে।' বললেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

লুবনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। হাজ্জাজ মেয়ের হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন। সুলায়মান ওখানে চিত্রার্পিতের মত দণ্ডায়মান। তার চেহারায় রক্তিমাভা বলছিল, যৌবনের খুন ঠিকই উন্মাদান বস্তু। তার এখন একটাই ভাবনা কি করে লুবনাকে উদ্ধার করা যায়। কি করে ইবনে কাসিমকে হাজ্জাজের চোখে খাটো করা যায়।

॥ সাত ॥

দুদিন পর এল সেই প্রতিযোগিতার ক্ষণ। মনে হচ্ছিল গোটা আরব জাতি দারুল খেলাফতে সমবেত। বাইরের দূর দরাজ থেকে আগত লোকেরা খোলা ময়দানে খিমা গাড়ল। যে দিকেই দৃষ্টি যায় সে দিকেই কেবল মানুষ, ঘোড়া আর উটের সারি। শহরের গলি ও বাজারে সমবেত জনতার ঠাসা ভীড়। খোলা ময়দান বিশাল। সেখান মানুষ আর বাহনের যেন সমুদ্র। একদিকে সামান্য উঁচু বেলকনী। ওখানে শামিয়ানার নীচে মেহমানদের জন্য সাজানো রয়েছে শাহী কুরসি। সবার সামনে খলীফার সিংহাসন। ওটায় খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক উপবিষ্ট। পাশে বসেছেন হাজ্জাজ। ডানে বামে পর্দার আড়ালে বসেছেন খলীফার বেগমগণ। সাথে আছেন লুবনা। অন্যান্য কুরসিতে সালার ও শহরের গণ্যমান্য লোকজন উপবিষ্ট। আরো আছেন কবিলার সর্দারগণ। হাজার হাজার দর্শক ময়দানে বসা কিংবা দাঁড়ানো। উট-ঘোড়ার পিঠেও কম লোক নয়। খলীফার ইশারায় সালার প্রতিযোগিতা শুরু করার ফরমান জারী করেন। ফৌজি লোকেরা পালাক্রমে এসে বীরত্ব প্রদর্শন করে যাচ্ছিল। তলোয়ার, তেগচালনা ও ঘোড়া দৌড়ের সে এক আজিমুশ্বান মহড়া।

ঘৌড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। প্রতি সওয়ারই সাধ্যানুযায়ী ঘোড়া ছুটাত। পরে শুরু হতো দ্বৈত ঘোড়া যুদ্ধ।

মুহাম্মদ বিন কাসিম না ছিলেন বেলকনিতে, না ছিলেন অন্যান্য দর্শকদের মাঝে। সুলায়মানকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দর্শকদের তুমুল করতালি আর হট্টগোলের মধ্যে কারো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। ছুটন্ত ঘোড়ার উড়ন্ত ধুলো সকলকে ঢেকে নিচ্ছিল।

'ময়দান খালি করে দাও। একটি ঘোষণা সকলকে আকর্ষিত করল,' কেউ থাকবে না ময়দানে।' ঘোষকের বার কয়েক ঘোষণার পর লোকেরা ময়দান খালি করে দিল। থেমে গেল ধূলিঝড়। একদিক থেকে একটি ঘোড়া বেরিয়ে এলো। এর পিঠে মখমলের গদি যা গর্দান পর্যন্ত প্রলম্বিত। রং গাঢ় সবুজ। জঙ্গী ঘোড়াটি জমিনে কেমন যেন খুড়িয়ে চলছিল। এর পিঠে জনৈক জোয়ান। হাতে বর্শা। কিন্তু কেউ তার সামনে এগিয়ে এল না। মূল প্রতিযোগিতাস্থল গোলাকার। সওয়ারের কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। ঘোড়াটি ময়দানে এক চক্কর দিল। সওয়ারকে মনে হচ্ছিল শাহী খান্দানের।

'তায়েফের কোন সওয়ার কি আমার মোকাবেলায় নামতে সাহস পাচ্ছে না?' বুলন্দ আওয়াজে বলল জোয়ান।

ঘোড়াটি খলীফার ভাই সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের। তিনি বিশেষ করে তায়েফের নাম নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকেই আহবান করছিলেন।

দর্শক সারি থেকে আচমকা আরো একটি ঘোড়া ক্ষীপ্র বেগে বেরিয়ে এল। এ ঘোড়াটিও উত্তম জাতের। এর সওয়ারও নওজোয়ান। তাঁর হাতে বর্শা আর কোমরে তলোয়ার।

'এসো ইবনে আব্দুল মালিক।' জোয়ান উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানালেন। 'কাসেমপুত্র মুহাম্মদ তোমাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। তায়েফবাসী এখানে একমাত্র সে-ই।'

উভয়ে চক্কর কেটে মুখোমুখি অবস্থান নিলেন। বর্শা তাক করলেন, উদ্দেশ্য বর্শা মেরে প্রতিপক্ষকে ঘোড়ার পিঠ থেকে আছড়ে ফেলা। মুহাম্মদ বর্শার আঘাত হানলেন। নিকটে এসে বর্শা মারলেন সুলায়মানও। কিন্তু কারো লক্ষ্য ভেদ হল না।

ঘোড়া পিছু হটিয়ে উভয়ে আবার হামলার প্রস্তুতি নেন। দর্শক সারিতে পীন পতন নিস্তব্ধতা। কেননা তাদের অনেকেই জানতেন এ দু' সওয়ারের একজন খলীফার ভাই। অপরজন অচেনা কেউ। এবার মুহাম্মদ বিন কাসিম রেকাবে দাঁড়িয়ে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। সুলায়মান আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সামলাতে পারলেন না। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। বর্শায় তিনি যখমী হলেন না, কেননা ওটির মাথায় চামড়ার খাপ লাগানো ছিল।

লড়াই তখনও শেষ হয়নি। তলোয়ারের যুদ্ধ বাকী। মুহাম্মদ বিন কাসিমও ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ার বের করলেন। মুহূর্তে সুলায়মানের কোষ থেকেও বেরিয়ে এলো তলোয়ার। নিকটবর্তী হয়ে উভয়ে তলোয়ার যুদ্ধ শুরু করেন। উভয়ের চাতুর্যপূর্ণ সুনিপুণ হামলা-পাল্টা হামলা চলছিল। এ লড়াই সহজে শেষ হবার নয়।

'ইবনে কাসিম!' সুলায়মান বললেন, 'পরাজয় মেনে নাও। তুমি কিংবা তোমার তলোয়ার জমিনে পড়ে গেলে আমার তলোয়ার তোমার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।'

সুলায়মানের বুকে প্রতিহিংসা। বারবার তিনি ইবনে কাসিমকে কতলের হুমকি ছাড়ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ নির্বিকার।

আচমকা মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রচণ্ড হামলা করলেন। সুলায়মানের অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেল। এখন তিনি কেবল আত্মরক্ষা করে যাচ্ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তাকে ফুরসৎ দিতে নারাজ। তাঁর একটি সাঁড়াশি আক্রমণে সুলায়মানের তলোয়ার খপ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল। সুলায়মান তলোয়ার উঠাতে গেলে মুহাম্মদ বিন কাসিম বাধা দিলেন।

সুলায়মান রিক্ত হস্ত। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাকে গুতিয়ে মাটিতে শুইয়ে ফেললেন। মুহূর্তেই তাঁর পা সুলায়মানের বুকে এবং তলোয়ার শাহরগে উত্থিত হলো।

'হাত গুটিয়ে নাও মুহাম্মদ!' বজ্রকণ্ঠে বললেন হাজ্জাজ।

'তোমাকে জীবিত ছেড়ে দিলাম। কসম খোদার! বনী ছাকীফের আত্মসম্ভ্রম ধরে আর যেন কোনদিন তোমায় আহ্বান করতে না শুনি। বললেন বিন কাসিম।

'আমি জীবিত থাকলে তোমার মত বদনসীব দ্বিতীয়টি থাকবে না পৃথিবীতে, বললেন সুলায়মান।

সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের এই শব্দ ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। ছিল না মামুলি ধমকি। এ এক প্রতিজ্ঞা। আর এ প্রতিজ্ঞা ঘুরিয়ে দিয়েছিল হিন্দুস্থানের ইতিহাসের মোড়।

মায়ারাণী

॥ এক ॥

৭০০ খ্রীঃ মোতাবেক ৮১ হিজরীতে যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স ছ'বছর তখন ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধুর রাজা ছিলেন দাহির। ওই সময় সিন্ধুরাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর একাংশের রাজধানী ছিল নিরূন (হায়দরাবাদ) অপরাংশের রাজধানী ব্রাহ্মণাবাদ। এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল রাজ। কিন্তু তিনি এক বছরের মধ্যে মারা যান। তার স্থান দখল করেন রাজা দাহিরের ছোট ভাই ধর্মসেনা। এতে রাজা দাহির খুব খুশী হন। কেননা এক্ষণে সিন্ধুর পুরোটাই তাদের কবজায়।

রাজা দাহিরের ক্ষমতারোহণের দু'তিন মাস পরের ঘটনা। রাজা দাহিরের রাণী যিনি মায়ারাণী নামে পরিচিত হরিণ শিকারে বের হলেন। ওই সময়টাতে সিন্ধুর আশেপাশে প্রচুর হরিণের আনাগোনা ছিল। ঘোড়ায় চেপে সকলে তীর দিয়ে হরিণ শিকার করত।

মায়ারাণীর বয়স কুড়ি একুশের মত। বছর খানেক পূর্বে দাহিরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দেখতে তিনি নজরকাড়া সুন্দরী। হরিণ শিকারের প্রতি তাঁর ছিল দারুণ শখ। রাজ পরিবারের মেয়ে হওয়ার দরুন ঘোড় সওয়ারী ও তীরন্দাযীতে পুরুষের সাথে মোকাবেলা করতে পারতেন। একদিন তিনি টাট্টু ঘোড়ার রথে চেপে শিকারে বের হলেন। রথ চালক যুদ্ধক্ষেত্রে রথ চালানোয় অভিজ্ঞ। হঠাৎ তাদের নযরে চার-পাঁচটা হরিণ দেখা দিল। মায়ারাণীর নির্দেশে রথ চালক ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল। বিপদ টের পেয়ে হরিণ মারল দৌড়। রথের গতিও গেল বেড়ে। রথের ঘোড়া দু'টি জঙ্গী। ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। দৌড়াতে দৌড়াতে হরিণের পাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মায়ারাণীর রথ দ্রুত চলছে। জমিনটা মরুর মত বালুকাময়।

সামনে খোলা প্রান্তর। এর পার্শ্বে টিলা। হরিণ টিলার পথ ধরল। হরিণগুলো যেন বাতাসের বেগে দৌড়াচ্ছে। মায়ারাণী তিন/চারটা তীর ছুঁড়লেন কিন্তু সবগুলোই ব্যর্থ। রথ টিলার দিকে এগুলো। এ পথ সমতল নয়। মায়ারাণী বারতিনেক পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। গিরিপথ ধরে হরিণ আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। এই বন্ধুর পথে রথ উল্টে যাবার সম্ভাবনা বেশী কিন্তু রথ চালক ছিলো খুবই নিপুণ।

সামনে টিলায় গোলাকৃতির সমতল ভূমি। টিলার আড়াল থেকে আচমকা বর্শা হাতে জনৈক সওয়ার নেমে এলেন। তিনিও ঘোড়া ছুটাচ্ছেন হরিণের পেছনে। ততক্ষণে মায়ারাণীর রথ সমতল ভূমিতে নেমে পড়ে।

'আর অগ্রসর হয়ো না।' রথ চালক চিৎকার দিয়ে বললো, 'ওটা মায়ারাণীর শিকার।' ঘোড় সওয়ার যেন শুনেও শুনল না। সে পূর্ববৎ হরিণের পেছনে ছুটতে লাগল।

'মায়ারাণী! আপনার ধনুকটা আমার হাতে দিন। লোকটা হরিণটাকে ধাওয়া করছে। হরিণের আগে বেটাকে শেষ করে নি।' রথচালক বলল।

'বেটাকে আমাদের দেশী মনে হচ্ছে না। মায়ারাণী বললেন।

হরিণ একদিকে মোড় নিল। মোড় নিলেন আগন্তুকও। তার চেহারা খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

'লোকটাকে আরবী মনে হচ্ছে। কিন্তু এদিকে আসার সাহস কোত্থেকে পেল সে'! রথ চালক বলল। রথ পূর্ণ শক্তিতে চলছে। মায়ারাণী হরিণকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছেন। এটাও ব্যর্থ। এবার সওয়ার জীনের ওপর দাঁড়িয়ে বর্শা নিক্ষেপ করল। বর্শা হরিণের গর্দানের খানিক নীচে গেঁথে গেল। হরিণ এক কদম দূরে গিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়ল।

সওয়ার ঘোড়া থামালেন। এক লাফে নেমে হরিণের কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন। মায়ারাণীর রথ তার সামনে আড় সৃষ্টি করল। লোকটা মায়ারাণীর দিকে তাকাচ্ছে। ঠোঁটে তার মৃদু হাসির রেখা। রথ চালক গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া থেকে নামল। গিয়ে দাঁড়াল আগন্তুকের সামনে।

'তুমি কি সেই আরবদের একজন, মহারাজ যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন? জানো তুমি কি মহাপরাধ করে ফেলেছ? মহারাণী তোমাকে রথের পেছনে বেঁধে আমাকে ঘোড়ায় চাবুক কষতে বলেছেন। আরবী লোক এত বেয়াদব ও বদ তমীয হয় জানতাম না। রথ চালক বলল, আমি ওই আরবদের কেউ নই। নই বদ-তমীয ও বেয়াদবও।' আগন্তুক বলেন। 'ও হো। তুমি দেখছি আমাদের ভাষা রপ্ত করেছ।'

॥ দুই ॥

মায়ারাণীরও রাগ করার কথা। গোস্বাকম্পিত বদনেই তিনি রথ থেকে নামলেন। কিন্তু জোয়ান আরবকে দেখে তার রাগ কিছুটা প্রশমিত হল। এক নিমিষে তিনি আগন্তুকের চেহারার প্রতি তাকিয়ে রইলেন। আরবী জোয়ানের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। গায়ের রং গাঢ় বাদামী। মায়াময় দুটি চোখ। মিটিমিটি করে যেন হাসছে তা। এক ধরনের স্বর্গীয় আকর্ষণ তার মুখমণ্ডলে। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। মায়ারাণীর নির্বিকার ভাব বলে দিচ্ছে সে প্রভাবিত হয়েছে এই যুবকের প্রতি। আরব যুবকের মুচকি হাসি সিন্ধুর রাণীকে যেন উপহাস করছে।

হঠাৎ অনেকগুলো ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেল। ছ'টি ঘোড়া ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মায়ারাণীর দেহরক্ষী এরা।

'সিঙ্গারাম! সওয়ারদের ওখানেই দাঁড়াতে বলো–রথ নিয়ে যাও। আমি ওকে দেখছি।' মায়ারাণী রথ চালককে বললেন।

রথচালক রথ নিয়ে চলে গেল। ঘোড় সওয়ারদের অপেক্ষাকৃত দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

'এখানে কেন এসেছ?' আরব্য যুবককে লক্ষ্য করে মায়ারাণীর প্রশ্ন, 'হরিণ শিকারের জন্যই কি? আমার অনুমতি ছাড়া এ হরিণ তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।।'

'আমার জন্য শিকার করলে মরার পূর্বেই ওকে জবাই করতাম। ওটি তোমার জন্যই শিকার করেছিলাম। তোমরা মৃত পশু ভক্ষণ করে থাক বলে জেনেছি।' বলল আরব যুবক।

'আমার জন্য কেন ওকে ঘায়েল করলে? এক নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিলে বুঝি? তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করেছ কিংবা ওটির পেছনে আমাকে ছুটতে দেখনি।'

'তা অবশ্য ঠিক। নারীই ধারণা করেছি তোমাকে তবে কমযোর কিংবা আনাড়ী ভেবে অসহায়ত্বের সুযোগ নেইনি। ওই টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। হরিণের পেছনে তোমাকে ছুটতে দেখছিলাম। দেখছিলাম তোমার তীর নিক্ষেপণ প্রক্রিয়াকেও। বেপরোয়া রথ চালাতে দেখার পর ভাবলাম হরিণটা তোমার চাই-ই। হরিণও আসছিল এদিকটায়। তাই বর্শা নিক্ষেপ করলাম।'

সৌন্দর্যের পিরামিড আরব এ যুবক যখন জবানবন্দী দিচ্ছিল তখন মায়ারাণী তার কথা গোগ্রাসে গিলছিলেন এবং যুবকের রূপসুধা পান করছিলেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়। ভাবখানা এমন যেন তিনি তার প্রভাবে মুখ খুলতেই পারছেন না।

'কেন, তুমি আমার পরিচয় জানতে না?' মায়ারাণী অনুচ্চস্বরে প্রশ্ন করেন।

'না। কিন্তু রথ সওয়ারীর সাথে আরো ছ'দেহরক্ষী দেখে ঠাহর করছিলাম এ যুবতী নিশ্চয় রাজ পরিবারের। কিন্তু তুমি যে রাজা দাহিরের রাণী—তা জানতাম না।' বলল আরব যুবক।

'এখন তো জানলে। কাজেই এখনও কি তুমি আমার ভয়ে ভীত নও?'

'না। তোমাদের দেশে ভয়ের অর্থ অন্য কিছু। আমাদের দেশে গেলে দেখবে ভয়ের অর্থ ভিন্ন রকম। আমরা স্রেফ আল্লাহকে ভয় করি। জাতিতে মুসলিম আমরা। আমাদের মধ্যে কোন রাজা-মহারাজা নেই।'

'তা তোমরা এখানে এসেছ কেন?

'একটি অপরাধে আমি তোমার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। এই প্রশ্নের জবাব দিলে সেটা হবে আরেক অপরাধ। তবে তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি, কোন অসৎ উদ্দেশে এখানে আসিনি, একমাত্র আশ্রয় নিতেই আমার এখানে আগমন।'

মায়ারাণী রথচালককে ডেকে পাঠালেন। রথ হাঁকিয়ে দ্রুত সে এগিয়ে এল। হরিণের গা থেকে বর্শা বের করে ওটি রথে রেখে দাও। রথচালক হুকুম তামিল করল। সে চলা শুরু করলে রাণী তাকে ডেকে বললেন, 'ভয় নেই সিংগারাম! ওর কাছে আমার অনেক কিছু জানার আছে। লোকটা আমাদের কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে। তোমরা এখান থেকে কিছু দূরে অপেক্ষা কর।'

'মহারাণী!' সিংগারাম বললো, 'যে মেধা আপনার আছে, আমাদের তার ধারে কাছেও নেই। তবে হুশিয়ার থাকবেন মুসলমানদের ওপর কোন ভরসা করা যায়না।'

'সে চিন্তা তোমার করতে হবে না। যাও! ও আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।'

রথচালক চলে গেল। চলে গেল রাণীর দেহরক্ষীরাও। রাণী আবারও আরব্য যুবকটির কাছে এগিয়ে গেলেন।

'তোমার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবে কি?' প্রশ্ন মায়ার।

'বলার পূর্বে আমার কিছু জানার আছে।' বলল আরব্য যুবক।

'বলো!'

'আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে অবগত। এদেশের রাজা-রাণী সাধারণ এক আগন্তুকের সাথে এ ধরনের নম্রবচনে কথা বলেনা, যেভাবে বলছ তুমি। এখানে মানুষই মানুষের খোদা বনে আছে।'

'আচ্ছা মানুষতো তুমি! নিশ্চয় তুমি কোন শাহী খান্দানের লোক। কোত্থেকে রপ্ত করলে আমাদের ভাষা? আমাদের দেশের অন্যান্য খবরও তাহলে তোমার জানা আছে বুঝি?' রাণী খামোশ হয়ে যান একথা বলে। খানিক দম নিয়ে তিনি আবারও বলা শুরু করেন, তোমার সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলার দরকার নেই। স্রেফ এতটুকু বলব, এক্ষণে তুমি আমার দেহরক্ষী দ্বারা বেষ্টিত। আমি তোমাকে আরবদের গোয়েন্দা মনে করছি। আমার এই সন্দেহ দূর করতে পারবে কি?'

'না! আমি কোন গোয়েন্দা নই। বেলাল বিন ওসমান আমার নাম। আমি আমার রাজ্যের বিদ্রোহী। শুনেছি এখানে অনেক আরব আশ্রয় নিয়েছে। এদের সকলেই আমার মত।'

এটা তুমি ঠিক বলেছ। আমরা হাজারো আরবকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছি। তুমি ওদের কাছে গেলেনা কেন?'

'ওদের ঠিকানা জানা নেই। একাকী নই আমি। আমার সাথে আরও চারজন রয়েছে। দিন চারেক ধরে আছি এখানে। ভাবছি কি করে এখানকার রাজার কাছে যাই এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমাদের ভাষা শেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলে। শোন শৈশবেই বাবার সাথে এদেশ ভ্রমণ করতে এসেছিলাম। ছিলাম বছর পাঁচেক এখানে।'

'তুমি সিন্ধুতেই অবস্থান করেছিলে?'

'না রাণী। সর্বাগ্রে সরন্দীপ গিয়েছিলাম। তুমি জানো, দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানরা ওখানে বাস করছে। এর নিকটবর্তী মালাবারেও মুসলিম বসতি রয়েছে।'

'জানি। এ আরব তারা যারা ব্যবসার উদ্দেশে এখানে এসে থেকে গেছে। মালাবারের মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে, জানি তাও। এলাকার বেশুমার বাসিন্দাকে ইতোমধ্যে তারা নিজধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে পেরেছে।'

'আমার বাবা একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন নামজাদা ব্যবসায়ী। তাঁর সাথেই আমি এদেশে এসেছিলাম। ভারতবর্ষের বেশ কিছু এলাকা ভ্রমণ করেছিলাম। ওই সময় এদেশের ভাষা শিখি। বাবা আমাকে ধম প্রচারের পদ্ধতি শেখান। কিন্তু আমার বেশী আগ্রহ ছিল যুদ্ধের প্রশিক্ষণে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি বাঁধ সাধেননি। যোদ্ধাদের হাতে আমায় সোপর্দ করলেন। জোয়ান বলে তিনি আমাকে আরবে পাঠান। খলীফার বাহিনীতে আমি নাম লেখাই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খেলাফত নিয়ে কোন্দল বাধে। ফৌজি এবং শহরের যেসব লোক খলীফার বিরোধী ছিল, মনে মনে তারা বিদ্রোহ করে বসে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে বন্দী হয়। অনেকে তখন পালিয়ে আসে এবং এখানে আশ্রয় নেয়। আমি যেহেতু তাদেরই বংশধর সেহেতু আমাকে এখানে আসতে হয়।'

'এতো বহু পুরানো কাঁসুন্দি। কিন্তু হঠাৎ করে তুমি এখানে এলে কেন?'

'আমি আসলে সেই বিদ্রোহীদের কেউ নই যারা পূর্বে বিদ্রোহ করেছিল। অবশ্য শেষ বিদ্রোহের বিদ্রোহী আমিও। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারলাম, পরস্পর লড়াই করে লাভ নেই। আমি তাই বর্তমান খেলাফতের ওফাদার বনে গেলাম। কিন্তু ওখানে এখনও বিদ্রোহী রয়ে গেছে। ওরা আমাকে হত্যার হুমকি দিল। সত্যি বলতে কি, আমি বিদ্রোহীদের বিদ্রোহী হয়ে গেলাম। এখনও আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। মন বলে, মাঝে মধ্যে ভুল করেছি। আবার বলে। না, ওদের সাথে মিশে যাই।' মায়ারাণীর চেহারার প্রতিক্রিয়া বলছিল অন্য কথা। এ প্রতিক্রিয়া কেবল এক রাণীর নয়, তা ছিল এক সরলা সুবোধ উত্থিত যৌবনা তরুণীর। কোন মানুষকে ভাল লাগলেই কেবল এই ভাব এবং আকর্ষণের জন্ম নিতে পারে। মন তখন বলে ও সামনে বসে থাক, বলতে থাকুক, আর আমি প্রাণভরে শুনতে থাকি।

'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ কি? আমি কেল্লায় যে কোন চাকরি নিতে প্রস্তুত। আমি কোথাও একটু স্থিরভাবে বসতে পারলে সিদ্ধান্ত নিতাম, যা করছি তা ভুল, না ঠিক।

'তোমার জন্য আমি কিছু একটা করব তবে তার আগে আমাদের আরেকবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।'

'যেখানে বলবে সেখানেই হাজির হব।'

মায়ারাণী কেল্লার নিকটবর্তী একটি স্থান নির্দেশ করে ওখানে হাজির হতে বললেন। এর পর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বেলাল ওখান থেকে একটি উঁচু টিলার দিকে যাত্রা করলেন। ওখানে আরো চার আরবী সাথী তার অপেক্ষায়। বেশ কিছুদিন ধরে তারা আত্মগোপন করে আছে এখানে। বেলাল রাজা দাহিরের সাথে সাক্ষাতের বাহানা খুঁজছিলেন, ঘটনাচক্রে আজ যেটা ঘটে গেল। তিনি বন্দী হবার ঝুঁকিও নিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কল্পনাও করেননি যে, মায়ারাণী তার প্রতি এতটা অভিভূত হয়ে পড়বেন।

॥ তিন ॥

সিন্ধুতে এই পাঁচ আরবীর আগমন আশ্চর্যের বিষয় নয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্মের পূর্বেই আরবের মুসলমানরা হিন্দুস্তানের যমীনে বসবাস করে আসছিলেন। ইসলামের আলো সর্বাগ্রে মালাবারে এসেছিল। ওই যুগে ওখানে চারটি ধর্ম ছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীস্ট ও ইহুদী। ইয়ামেন, হেজায ও মাস্কাটের আরবরাও ওখানে ছিলেন। পেশায় এরা জাহাজের কাপ্তান ও ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অবশ্য তখন তারা মুসলমান ছিলেন না।

রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়-ই ইসলাম মালাবারে পৌঁছে যায়। হেরার গিরিগুহা উদ্‌গিরিত আলোকচ্ছটা মালাবারের আঁধার পুরিতে এসব ব্যবসায়ীদের দ্বারা আছড়ে পড়ে। এর দ্বারা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

মালাবারের পার্শ্বেই ছিল সরন্দ্বীপ (বর্তমান শ্রীলংকা)। এখানেও আরব্য বণিক কাফেলা পৌঁছুয়। সরন্দ্বীপের বাসিন্দারা মুসলমানদের চমৎকার আখলাকে প্রভাবিত হন। তারা ইসলামী সৌ-ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদী চরিত্রে যারপর নাই বিমুগ্ধ হন। এক পর্যায়ে এখানকার রাজা পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। এমনকি তিনি রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করতে আরব দেশে রওয়ানা হন। কিন্তু আরব সাগরের কিছু দূরে জাহাজেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ইয়ামেনে তাকে সমাহিত করা হয়।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর যুগে ওসমান ইবনে আবিল আস বোম্বাইয়ের থানা বন্দরগাহে হামলা চালান। দক্ষিণের পানিপথে মুসলিম বাণিজ্য জাহাজ নির্বিঘ্নে চলতে কোন একটা বন্দর অধিকার করতেই এই হামলা।

হিন্দুস্তানে মুসলিম আক্রমণের এটাই শুরু। অবশ্য এই হামলা আমীরুল মুমিনীনের হুকুম ছাড়াই করা হয়েছিল। হামলা সফল হলেও তারা বন্দর কব্জা করতে পারেননি। ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, ওসমান ইবনে আবিল আস গনিমতের মাল মদীনায় প্রেরণ করলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে চরমপত্র লিখেন। সেইপত্র ছিল এমনঃ

'আমার ছাকাফী ভাই! তোমার এই কর্মকান্ড খুবই বিপজ্জনক। তোমাকে জাহাজে সামান্য ফৌজ দেয়া হয়। সামান্য এই ফৌজ নিয়ে তোমার হামলা ঠিক হয়নি। কসম খোদার! এরা কোন বিপদে পড়লে সমপরিমাণ লোক আমি ছাকাফীদের থেকে ছিনিয়ে নিতাম।'

এর কিছুদিন পর ওসমান ইবনে আবিল আস খলীফার হুকুমে সিন্ধুতে হামলা চালান। তিনি তার ফৌজকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একাংশের নেতৃত্বে তিনি নিজেই ছিলেন, অপরাংশের দায়িত্ব দেন তার ভাই মুগিরাকে। ফৌজের এই অংশ পানিপথে দেবলের ওপর আক্রমণ চালায়। ওসমান নিজে বুরজ নামক স্থানে হামলা করেন।

ওই সময় রাজা চাচ সিন্দুর প্রশাসক ছিলেন। সামা ছিলেন রাজা চাচের নির্ভীক সেনাধ্যক্ষ। ফৌজ নিয়ে কেল্লার বাইরে এসে তিনি ওসমানের ভাই মুগিরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুগিরা যুদ্ধ করতে করতে এদের মাঝখানে প্রবেশ করেন এবং সামাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহবান জানান। এভাবে দু'দলের সালার মুখোমুখি হন। মুগিরা বিসমিল্লাহ পড়ে সামার ওপর চড়াও হন। সামা যখমী হন। যখমী হন মুগিরাও। তবে তাঁর যখমটা মারাত্মক হওয়ায় তিনি শাহাদত বরণ করেন।

বিজয় মুসলমানদেরই হলো, কিন্তু অনিবার্য কারণে মুসলমানেরা এলাকা দখল করল না। অবশ্য এ যুদ্ধে মুসলমানদের বেশ ক্ষতি হয়।

এ ঘটনার বছর ছয়েক পর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইরান জয় করেন।

অতপর তিনি সিস্তানে হামলা করেন। ওখানকার হাকেম মরযুবান হাতিয়ার ফেলে দেন। সিস্তান পুরোপুরি জয় হলো। সালার আব্দুল্লাহ তার অধীনস্থ হাকাম তাগলাবীকে মাকরানের ওপর হামলা করতে প্রেরণ করেন। ওই সময় মাকরানের রাজা ছিলেন রাসেল। তিনি সিন্ধুর রাজা চাচের কাছে মদদ চান। চাচ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্য প্রেরণ করেন। এতে দুশমনের সংখ্যা দ্বিগুণ হলো। এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা জয়লাভ করেন।

এর পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে তাঁরই নিযুক্ত ইরাকী গভর্নর হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) রবি ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এ বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং ফৌজ বিজিত এলাকায় না রেখে ফেরৎ আনা হয়।

আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) মালে গনীমত বায়তুল মালে ফেরৎ পাঠালে হযরত ওমর (রাঃ) আবু মূসার দূতকে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন। মোবারক হোক তোমাদের বিজয়। বলো, মাকরান কেমন এলাকা। কেমন ওখানকার জনগণ?'

'আমীরুল মুমিনীন! মাকরানের যমীন শুষ্ক। ফল-ফুল হয়না। ফল উৎপন্ন হলেও তা খাবার অযোগ্য। ওখানকার অধিবাসী ডাকাত ও লুটেরা কিসিমের। আমাদের ফৌজ ওখানে রাখলে ওরা তাদের মালমাত্তা ডাকাতি করবে, পক্ষান্তরে অধিক ফৌজ রাখলে তারা রসদের অভাবে মারা যাবে।

'খোদা তোমার প্রতি মেহেরবান হোন। কাব্য-চর্চা শুরু করেছ তুমি। সঠিক অবস্থা বর্ণনা করো।'

'আমীরুল মুমিনীন! যা দেখেছি তা-ই বর্ণনা করলাম। যে কেউ সেখানে যাবে একথাই বর্ণনা করবে। সত্যকে অস্বীকার করার জো নেই।'

'না, দূত!' আমীরুল মুমিনীন বললেন, 'মুজাহিদীনে ইসলামকে ক্ষুধা পিপাসা মারতে পারে না। কাইসার ও কিসয়ার হাতিয়ার সমর্পণকারী মুজাহিদবৃন্দকে এ দোষে অভিযুক্ত করা যায় না যে, তারা অলসতার নিদ্রায় ঘুমুচ্ছে, ডাকাতরা তাদের মালমাত্তা লুট করছে। ক্ষুধা-পিপাসায় তারা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

মাকরানের সৈন্যবাহিনীকে ফেরৎ আনতে নির্দেশ দেন আমীরুল মুমিনীন। মাকরানের কিছু এলাকা কব্জায় রেখে বাদবাকীটা ছেড়ে দেয়া হয়।

হিন্দুস্তানের পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম অগ্রাভিযান থেমে থাকেনি। ঐ উপাখ্যান বড় দীর্ঘ।

খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান (রাঃ) খেলাফতের মসনদে বসেন। ঐ যুগেও পশ্চিম হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অগ্রাভিযান জারী ছিল। হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদতের পর আলী (রাঃ)-এর খেলাফত শুরু হলে মুসলমানরা কিলাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া খলীফা হন।

বনি উমাইয়ার শাসনামলেও পশ্চিম হিন্দুস্তানে মুসলিম গভর্নর শাসনকায চালাতে থাকেন। বিগত দিনে ফারানের গিরিগুহায় যে আলোকচ্ছটা ঠিকরে উঠেছিল, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তা। এ সময় ক্ষমতা ও পদলোভ পেয়ে বসে মুসলিম শাসকবর্গকে। খেলাফতকেন্দ্রিক রাজনীতি শুরু হয়। পৃথিবীর কোণে কোণে যারা ইসলামের কিরণরশ্মি ছড়িয়ে দিবে-গৃহযুদ্ধে লেগে গেল তারা। নেকী-বদী, সত্য-অসত্য ও হক-বাতিলের পার্থক্য দূরীভূত হলো পুরোপুরি। জুলুম নিপীড়নের যুগ শুরু হলো। এই ধারাবাহিকতায় যার নাম সর্বাগ্রে নিতে হয় তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের চাচা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। এই ক্ষমতালিপ্সুরা ইসলাম ও আল্লাহু আকবরকে রাজনীতির রঙে-রঙীন করেন।

ক্ষমতার যে রশি টানাটানি ওই যুগে হয়েছিল সেদিকটা খুবই স্পর্শকাতর, তাই ওদিকে যাব না। তবে এতটুকু না বললে নয় যে, খিলাফতের দুটি মেরুকরণ হয় তখন। রাজধানীও হয় দু'টি। অবশ্য খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের যুগে গৃহযুদ্ধ ও রাজনীতির যুদ্ধংদেহী মনোভাবটা পুরোদস্তুর মিটে যায়। উমাইয়া খেলাফতের ভিত মজবুত হয়। হাজ্জাজ ওই সময়টাতেই হাকেম হন এবং খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্রোহের যুগে পাঁচশত আরব রাজা দাহিরের কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করলে তিনি তাদের আশ্রয় দেন। মাকরানের আশে পাশে তারা বসবাস শুরু করেন, যে অঞ্চল রাজা দাহিরের দখলে ছিল। আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিল আলাফী খান্দানের।

বেলাল ইবনে ওসমান চার আশ্রয়কামীদের সঙ্গে এসেছিলেন্। যেহেতু তিনি অপরিচিত ছিলেন সেহেতু আত্মগোপন করে থাকতেন। তাছাড়া তিনি ভালো করেই জানতেন যে, সিন্ধুর রাজা আরবদের সাথে দুশমনি পয়দা করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আরব খেলাফতের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজার পিতা চাচও আরবদের বিরুদ্ধে মাকরাণীদের মদদ করেছিলেন।

এ জন্য বেলালের ভয় ছিল রাজা না আবার তাকে গ্রেফতার করে শ্রীঘরে পাঠায়।

॥ চার ॥

মায়ারাণী বেলাল ইবনে ওসমানকে কেল্লার অনতিদূরে একটি স্থানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। পরদিন এ উদ্দেশে তিনি রওয়ানা করলে তার সাথীরা তাকে বারণ করে। রাতে এ নিয়ে দীর্ঘ বচসা হয়। সাথীদের কেউ বলেছিল, রাণী তোমাকে প্রতারণা জালে আটকে কারাগারে পাঠাতে চান। এ সন্দেহ বেলালেরও যে ছিল না তা কিন্তু না। কেননা মায়া তাকে গুপ্তচর-ই ঠাওরিয়েছিলেন। কিন্ত এতদসত্ত্বেও বেলালের কেন যেন মনে হচ্ছিল মায়া তাকে ধোঁকা দিতে পারে না।

'যদি যেতেই হয় তাহলে আমরাও তোমার সাথে যাব।' এক সাথী বললেন।

'তোমরা কি করবে?' বেলাল প্রশ্ন করেন, 'তোমাদেরকে সাথে দেখলে হয়ত তিনি আমার সাথে দেখা করতে চাইবেন না। এছাড়া তার নিয়ত খারাপ হলে সকলকেই গ্রেফতার করতে পারেন,। তারচে তোমরা যাবতীয় ঝুঁকির মধ্যে আমাকেই ফেলে দাও। গ্রেফতার হলে আমি একাই হলাম। সন্ধ্যা নাগাদ আমি না ফিরলে মনে করো গ্রেফতার হয়ে গেছি। অতঃপর তোমরা এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেও।

সাথীরাও একথায় সায় দিলেন। কোন বিপদ হলে যাতে তারা আত্মরক্ষা করতে পারেন। সাথে সাথে তারা এ সিদ্ধান্তও নিলেন যে, মায়ারাণীর সাথে সাক্ষাতের স্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে তারা এমন এক স্থানে থাকবেন যাতে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিপদে পড়লে তারা সুযোগ বুঝে মদদ করতে পারেন।

বেলাল ইবনে ওসমান ঘোড়ায় চাপলেন। বর্ষা হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চাবুক কষালেন, তার গন্তব্য প্রায় তিন মাইল দূরে। মায়ারাণী তাকে পথ বাতলে দিয়েছিলেন।

প্রান্তর, টিলা ও উপত্যকা পার হয়ে বেলাল এমন একটি মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম ভূ-খন্ডে উপনীত হলেন যেখানটাকে দেখতে মরুভূমির মরূদ্যানের মত মনে হচ্ছিল। এছাড়া নানান গাছগাছালিতে ঠাসা ছিল স্থানটা। ছোট বড় মিলিয়ে মরূদ্যানই বলা চলে। ছিল নানান কিসিমের ঘাস। একপ্রান্ত দিয়ে বেলালের ঘোড়া এগিয়ে চলছে। ওদিক থেকে আরেকটা জমকালো ঘোড়া আসছিল। দেখলে শাহী ঘোড়া বলেই মনে হয়। বেলালের বুঝতে কষ্ট হলনা যে, ঘোড়ার সওয়ার কোন পুরুষ নয়, স্বয়ং মায়ারাণী। নিজের সৌন্দর্য দিয়ে মায়ারাণীকে মায়াজালে আটকানোর মত কাঁচা লোক নন বেলাল। তিনি ঘোড়ায় পদাঘাত করলেন। ঘোড়া ছুটল উর্দ্ধশ্বাসে। তাঁর রোখ মায়ারাণীর দিকে নয়। রাণীর পূর্বেই তিনি কথিত স্থানে উপনীত হলেন। স্থানটি আরো মনোমুগ্ধকর। পাশে একটা ছোট ঝিল। ঝিলের পার্শ্বের নাতিদীর্ঘ সবুজ গুল্মের সারি পরিবেশকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলছিল। ঘোড়াদৌড়ে বেলাল সমগ্র এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করলেন। রাণীর কোন লোক আত্মগোপন করে আছে কি-না, তা দেখতেই এই প্রদক্ষিণ-পর্যবেক্ষণ। আত্মরক্ষার ব্যাপারে বেলাল খুবই চৌকস ছিলেন। গাছপালা পশুপাখি ছাড়া তিনি অন্য কোন প্রাণীর টিকিটি খুঁজে পেলেন না।

এলাকাটা দেখে তিনি ঝিলের কিনারে চলে এলেন। মায়ারাণীর ঘোড়াও তার পাশে এসে দাঁড়াল। একলাফে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। বাচ্চাদের মত হেসে বেলালের দিকে এগিয়ে এলেন। বেলালও একলাফে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। রাণী বেলালের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। মুহূর্তে তাঁর দু'ঠোঁট নেমে এলো আরব্য যুবকের হস্তে। অতঃপর হাত রাখেন কাঁধে। বেলালের নাকে মায়ারাণীর নারী সুষমার সৌরভ। বেলাল মায়ার চোখেমুখে আকর্ষণের ও কাছে টানার আগ্রহ দেখতে পান। সজাগ হয়ে ওঠেন তিনি। এক কদম পেছনে সরে যান।

'কি হলো? আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছেনা? এদেশের রাণী মনে করে ভয় করছ বুঝি? ভয় পেওনা। জানি তুমি এদেশের প্রজা নও। আরব থেকে পলায়ন করে যারা মাকরানে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সকলেই সর্দার পুত্র। তুমিও এর ভিন্ন নও।' বললেন মায়ারাণী। 'না, রাণী! আমি ভয় পাচ্ছিনা। ভেবে অবাক হচ্ছি, এদেশের রাণী কেল্লা ছেড়ে এতদূর একাকী এলো কি করে? তোমাদের কোন দেহরক্ষী দেখছিনা যে?' বললেন বেলাল।

'না, এখানে কেউ আসবে না। প্রজাদের ওপর দাপট প্রভাব ফেলতে যারা দেহরক্ষী নিয়ে সফর করে এমন রাণী নই আমি।'

'রাজা তোমাকে একাকী বের হতে দিলেন?'

'না। তাও না। আমার একাকী ভ্রমণে তোমার আশ্চর্য হবার কথা বটে, তবে ব্যাপারটা অন্যের বেলায়, আমার বেলায় নয়।'

'সেটা কি রকম?

'সেটা না হয় এখন নাইবা শুনলে। এর আগে দেখতে চাই আমার প্রেম তোমার হৃদয়ে কতটা দাগ কাটতে পেরেছে! তোমার প্রেম আমাকে এদ্দুর টেনে এনেছে। আমি কি তোমার হৃদয় কোণে এতটুকু ঠাঁই পাবার যোগ্য নই আরব্য যুবক?

'অবশ্যই রাণী! তবে মন বলছে কি জানো! তুমি একখানা সুন্দর প্রতারণার জাল পেতেছ।' শুনেছি আরবজাতি আমাদের পুরুষদের চেয়েও ধীমান। কিন্তু তোমাকে দেখছি বিলকুল এর উল্টো। আমাদের ফৌজের পাঁচ জোয়ানও তোমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না বলে মনে করছ? তোমাকে গ্রেফতারের ইচ্ছে থাকলে রাতে ক'জন সেনা পাঠালে কি হত না?'

'তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে ঠাঁই দিতে চাও কেন রাণী! আমার চেয়ে ভালো আর কাউকে এদেশে খুঁজে পেলে না?'

'আমি এক রাণী বেলাল। তোমার চেয়ে সুন্দর যুবরাজরা আমার রূপে কই মাছের মত ছটফট করে, কিন্তু রাণীর প্রতি তাকানোর সাধ্য কার এদেশে? রাণীকে প্রজারা দেবীজ্ঞান করে। রাণীকে পূজার বেদীতে ঠাঁই দেয়। কিন্তু বেলাল, ভাগ্য বিড়ম্বিত এক রাণী আগন্তুকের কাছে প্রেম ভিক্ষা করতে এসেছে। তাও আবার এমন আগন্তুক যার সাথে কোন পরিচয় নেই, দেখা নেই। আমার যদ্দুর বিশ্বাস গত জন্মে আমরা একসাথে ছিলাম।'

'আমার ধর্ম পরজন্মে বিশ্বাস করেনা।'

'প্রেমের মধ্যে ধর্ম টেনে এনো না বেলাল। বসো কিছুক্ষণ আমার কাছে। আমার হৃদয় ভেঙে দিওনা।'

তিনি বেলালকে কাছে বসালেন। বেলালের এই পরিণাম সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্য ছিল যা ভারতবর্ষের প্রভাবশালী রাণীর ঘুম হারাম করতে পারে। আর রাণীও এমন অপ্সরার মত ভুবন মোহিনী ছিলেন যে কোন পুরুষ তাকে দেখলে জবেহকৃত মুরগীর মত ছটফট করতে বাধ্য।

॥ পাঁচ ॥

বেলাল ও মায়ারাণী যখন এই সবুজ উদ্যান থেকে বেরোন তখন সূর্য হেলে পড়েছে। গাছগাছালির ছায়া প্রলম্বিত আকার ধারণ করে চলেছে। বেলালের সাথীরা দূরে অপেক্ষমাণ। বেলাল যেখানে অদৃশ্য হয় ওরা সেদিকটায় তাকিয়ে থাকে। ওদের ধারণা ফৌজ এসে বেলালকে ঘিরে হয় কতল করেছে, না হয় গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না।

শেষ পর্যন্ত বেলালকে সুস্থ স্বাভাবিক ফিরতে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়। তিনি রাণীর সাথে সাক্ষাতের কথা বলে গেলে তাঁদের হুঁশ আসে।

'কসম খোদার! তোমাদের সকলের একটা ব্যবস্থা করে এলাম। রাণী আমাদেরকে কেল্লায় রাখবেন। আগামীকাল আবারো আসবেন তিনি।' বললেন বেলাল।

দ্বিতীয় দিন বেলাল পূর্বস্থানে রাণীর সাথে মিলিত হন। দু'জনই একে অপরের রূপসুধা পান করছেন। দূরে দু'টি কবুতর ঠোঁটে ঠোঁট মেলায়, যা দেখে তারা হাসে।

'কি তোমার সন্দেহ এখনও দূর হলনা? তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করে দেখ তো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে পারি কি না?' প্রশ্ন রাণীর।

'সে কথা সত্যি যে, তুমি আমাকে গ্রেফতার করবেনা। কিন্তু আমার সেই প্রশ্নের জবাব এখনও দাওনি যে, তুমি তোমার স্বামীকে কেন ধোঁকা দিচ্ছ? পরাক্রমশালী যুবক রাজা। শরীর গঠনও সুঠাম। কুৎসিৎ কদাকারও নন তিনি। তার জন্য তো তোমার জীবন দিয়ে দেয়ার কথা! বেলালের কণ্ঠে আগ্রহ।

'তাকে আমি ভালবাসি, প্রয়োজনে তাঁর জন্য জীবনও বিলিয়ে দিতে পারি। তাঁর গায়ে কাঁটা বিধলে সে ব্যথা আমিও পাই।' থামলেন রাণী। দম নিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করেন। 'তুমি হয়ত মানতে চাইবেনা। খুবই বিস্ময়কর একটা কথা শোনাব তোমায়। রাজা দাহির আমার স্বামী হলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা একই মায়ের আপন দু'ভাই বোন।'

বেলাল চকিতে মায়ারাণীর প্রতি তাকালেন। মায়ারাণী এমন এক কথা বলেছেন, যা বিশ্বাস করতে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় নেই!

'আমি সত্য বলছি বেলাল! রাজাদাহির আমার আপন ভাই। সেই আমার স্বামী। এক হিন্দু দম্পতির মতই অগ্নি-শীলাকে সাক্ষী রেখে ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে আমাদের বিয়ে হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে আমরা স্বামী-স্ত্রী, দৈহিক দৃষ্টিকোণে নয়। নিঃসন্তান মারা যাব আমরা। রাজা দাহির মারা গেলে তার জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত লাফ দিতে হবে আমাকে।''কিন্তু এ বিয়ে হলো কি করে? কিইবা গূঢ় রহস্য এর মাঝে?' প্রশ্ন বেলালের।

'বলছি।' মায়ারাণী আপন ভাইয়ের সাথে বিবাহ কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

মায়ারাণী যে কাহিনী শোনান তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এর প্রমাণ 'তারীখে মাসুমি' ও 'চাচনামায়' রয়েছে। সিন্ধুর রাজা হয়ে দাহির গোটা দেশে ভ্রমণ করলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হলেন। দেখলেন, সীমান্ত এলাকাসমূহ। তার এ ভ্রমণ ক'মাস ধরেই ব্যাপৃত থাকল। অতপর ফিরে এলে রাজধানী আরোড়ের লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে তার সম্বর্ধনা জানাল। পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা তাকে বরণ করা হলো।

রাজধানীবাসীর এই অকৃত্রিম ভক্তি-বিশ্বাস দেখে রাজা ওইদিনই দরবার ডাকলেন। দেশের গণ্যমান্য লোকদের পুরস্কৃত করলেন। তৃপ্তি সহকারে ভোজের ব্যবস্থা করলেন। লোকেরা বাড়ী ফিরে গেলে তিনি নিভৃতে গণক ও জ্যোতিষীদের সাথে মিলিত হলেন। তারা তাকে দেবতা সাব্যস্ত করলেন।

'আমরা মহারাজ ও মহারাজের বোন মায়ারাণীর ফাল বের করেছি, 'জনৈক জ্যোতিষী বললেন, সামনের দিনগুলোতে তেমন একটা গড়বড় নযরে পড়ছে না আমাদের। তবে মায়ারাণীর ফালনামা নিরীক্ষণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে-ই তার স্বামী হবে সে-ই হবে সিন্ধুর রাজা।'

'আমরা মৃত্যুর পর?' রাজা দাহির প্রশ্ন করেন।

'না মহারাজ! সে আপনার জীবদ্দশায়-ই সিন্ধুর রাজা হবে।'

'কে সে? কোথায় তার বাড়ী?'

'অন্ধকার মহারাজ! বিদঘুটে অন্ধকার। ভাগ্য যেখানে অন্ধকার সেখানে জ্যোতিষীদের চোখও অন্ধকার হয়ে যায়।' বললেন জ্যোতিষী।

'আমি দেখতে পাচ্ছি মায়ারাণীর স্বামী বাইরের কেউ নন। ভেতর থেকেই কেউ হবেন।' অপর এক জ্যোতিষী বললেন।

'আমার বোনের স্বামী আমাকে হত্যা করবে-এমন ঘটনা ঘটবে না তো?'

'কথায় কোন গোঁজামিল নেই। সে আপনাকে হত্যা করুক, চাই না করুক-আপনার ভগ্নিপতি যে সিন্ধুর রাজা এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মহারাজাকে হুশিয়ার করে দেয়া ছাড়া আর কিইবা করতে পারি।' বললেন জ্যোতিষী।

রাজা দাহির পন্ডিত ও জ্যোতিষীদের নিয়ে ব্যাপারটা আরো ঘাঁটলেন। কিন্তু জ্যোতিষগণ তাদের অভিমত থেকে এতটুকু টললেন না। দাহির পেরেশান। তিনি একজন হিন্দু। আর হিন্দুজাতি জ্যোতিষীদের কথা সর্বান্তকরণে মান্য করে, বিশ্বাস করে। জাতিতেও তিনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং জ্যোতিষীদের কথা তুবড়ি ছুটিয়ে উড়িয়ে দেয়ার সাধ্যি কৈ তার।

পণ্ডিত ও জ্যোতিষিগণ চলে গেলেন। রাজা দাহিরের শান্তিও সেই সাথে উঠে গেল। চোখে ঘুম নামছেনা দেখে উজীরকে ডেকে পাঠান। তার উজীরের নাম বুদ্ধমান। ইতিহাস বলে, রাজা দাহির এই বুদ্ধমানের জ্ঞান ও মেধার প্রতি অগাধ আস্থাশীল ছিলেন। উজির এলে তার কাছে রাজা দাহির জ্যোতিষীদের কথা তুলে ধরেন।

উজীর মশাই! চিন্তা করুন, কি করতে পারি আমি এক্ষণে? আমার বোনের বিবাহ আসন্ন। নিজের হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভগ্নিপতির হাতে তুলে দেব? এর দ্বারা হয়ত আমি বেঁচে যাব কিন্তু কি হবে তাতে?'

'মহারাজ! প্রজা ও সিংহাসন থেকে রাজার অব্যাহতি ভালো কথা নয়। পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যা পাঁচটি জিনিস থেকে জুদা হলে তার কোন মূল্য থাকে না। রাজা গদি ছেড়ে, মন্ত্রী মন্ত্রণালয় ছেড়ে, পীর মুরীদ ছেড়ে, দাঁত মুখ ছেড়ে ও বাচ্চা মায়ের দুধ ছেড়ে। রাজা মশাই! চিন্তা করুন। একজন উজীর হয়ে কি করে আপনাকে গদি ছাড়ার পরামর্শ দেই?'

'আমি জিজ্ঞাসা করছি কি করা এখন?'

'মহারাজ! করবেন তা যা অদ্যাবধি কেউ করেনি। বোনকে খোদ আপনি-ই বিবাহ করে ফেলুন। এবং তাকে রাণী বানিয়ে নিন। সম্পর্ক হবে স্বামী-স্ত্রীর কিন্ত বোনের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবেন। সম্পর্ক প্রয়োগে পাপ নির্ঘাত। এই বিবাহে ফায়দা যা হবে তা হচ্ছে এই, রাজা মশাইয়ের কোন ভগ্নিপতি হবে না। সুতরাং সিংহাসনের প্রতিও কোন হুমকি দেখা দেবে না।'

'বিজ্ঞ উজীর তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তোমার পরামর্শ খুবই তাৎপর্যবহুল। এছাড়া এই সমস্যার আর কোন সমাধান দেখছি না আমি। যদিও মানুষের মধ্যে ছড়াবে ঘটনা রটনা।'

'মহারাজ! কিছুদিন আগের ঘটনা, এক লোক ভেড়ার পশমে মাটি ও ছাই ফেলে দেয়। এবং উপর দিক কিছু পানি ও তুলো রাখে। কিছুদিন পর তুলো ফুলে ওঠলে তিনি ভেড়াটি বাজারে নিয়ে যান। আমিও ওই ভেড়াটি নিজ চোখে দেখেছি। লোকজনের ঠাসা ভীড় লেগে থাকত। সপ্তাহ খানেক মানুষের মাঝে আকর্ষণ থাকার পর এক সময় উৎসাহে ভাটা পড়ল। এক সময় কেউই এর পার্শ্বে ভীড় জমাল না। ভেড়াটি তাদের সামনে দিয়ে যেত কিন্তু দেখেও কেউ দেখত না। মহারাজ! আপনাদের এই শাদী নিয়ে রটনার ঝড় কিছুদিন বইবে ঠিকই কিন্তু অল্পদিনে তা চুপসে যাবে। আর কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে আপনার সামনে এসে বুক ফুলিয়ে কথা বলবে?'

রাজা দাহির উজীরের পরামর্শ মেনে নিলেন। তার সারা মন জুড়ে সিংহাসনের স্বপ্ন। বুদ্ধমান তাকে বোঝালেন, রাজার কর্মই দেশের সংবিধান। সংবিধান চলে রাজার কথায়, রাজা সংবিধানের কথায় নয়।

রাজা দাহিরের নিয়ম ছিল তিনি সকলকে খোশ রাখতে চাইতেন। এ জন্যে তিনি পাঁচশ সর্দারকে সমবেত করে জ্যোতিষী ও বুদ্ধমানের কথা শোনালেন।

'না, মহারাজ!' সমবেত শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল।

'এমনটা হতে পারে না মহারাজ!' আরেকটি কণ্ঠ ঝংকৃত হলো।

'বদনাম হবে, অন্নদাতা।' আরেকজন বললেন।

পরে সকলেই এই কর্মের বিরোধিতা করলেন।

'কিন্তু আমি যে আমার বোনকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তোমরা কি চাও, রাজসিংহাসন ছেড়ে আমি জংগলে চলে যাই। আমার রাজ্যে কারো কোন সমস্যা হলে খোলাখুলি বলে ফেলুন।' বললেন দাহির।

দরবারে পীনপতন নিস্তব্ধতা। রাজা দাহির সকলের প্রতি নযর বুলান।

'আমি তোমাদের কাউকে নাখোশ করেছি কি?'

সকলের মাথা নিচু হয়ে গেল।

'বলো! আমি আমার বোনকে স্রেফ বিয়ে করব, স্ত্রীর মত ব্যবহার করব না।'

'তাহলে ঠিক আছে মহারাজ।' একটি কণ্ঠের সম্মতিসূচক আওয়াজ এল।

পরে সকলেই এমতের সমর্থন জানালেন।

দু'তিন দিনের মধ্যে রাজা দাহির আপন বোনকে বিবাহ করলেন। এ এমন প্রথা যা খুব গোপনে সম্পন্ন হলো। মানুষের মধ্যে এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। যে শুনল সেই চোখে মুখে আঙ্গুল দিল। জিভ্ কাট্ল। কিন্তু বোনকে বিবাহকারী দেশ হচ্ছে এই সিন্ধু আর এর রাজা।

॥ ছয় ॥

'এভাবে আপন ভায়ের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হলো'। বেলালকে বিস্ময়কর এ কাহিনী শোনাচ্ছিলেন মায়ারাণী, 'ভায়ের জন্য আমি নিজকে বলী দিলাম। তাছাড়া ভাই আমার রাজ্যহারা হোক আর আমার স্বামী তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করুক সেটা চাইতাম না।'

'তুমি জানতে না তোমার শাদী কার সাথে হতে যাচ্ছিল?' বেলাল প্রশ্ন করেন।

'তা জানতাম বৈ কি। তিনিও এক রাজা। ভাটিয়া রাজ্যের রাজা তিনি। নাম সোহান। ব্রাহ্মণাবাদে আমি আমার অপর ভাই ধর্মসেনার কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে রাজা দাহিরের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যতশীঘ্র সম্ভব সোহানের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিতে বলেন। ধর্মসেনা আমার বিবাহের পয়নামাও দিয়ে দেন। যার মধ্যে পাঁচশ ঘোড়া, দু'শো ঠাকুর ও একটি কেল্লা ছিল উল্লেখযোগ্য।'

ইতিহাস বলে, রাজা দাহির মায়ারাণীকে বিবাহ করেছেন এই খবর ধর্মসেনা শুনতে পান এবং রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। তিনি দ্রুত মায়ারাণীকে সোহানের কাছে বিবাহ দিতে চাপ দেন। উত্তরে দাহিরও কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহ করেন–এর কারণ জানান। এ ও বলেন, বোনকে বোনের মর্যাদা-ই দিবেন, বাস্তবোচিত স্ত্রী বানাবেন না।

কিন্তু ধর্মসেনার রাগ প্রশমিত হলো না এতে। সসৈন্যে তিনি রাজধানী অবরোধ করেন। রাজা দাহিরের কাছে অধিক পরিমাণে সৈন্য ছিল। তিনি সৈন্যদের এ অবরোধ ভাংতে নির্দেশ দেন। ফৌজ বাইরে বেরিয়ে এলো। ধর্মসেনার বাহিনী দাহিরের সামনে টিকতে পারবেনা দেখে তার কাছে পয়গাম পাঠিয়ে বলেন, সে যেন কেল্লার বাইরে তার সাথে সাক্ষাত করেন।

খোদ দাহির-ই এ পয়গাম পাঠান যে, তুমি আমার ভাই। কেল্লায় আসতে তোমার অসুবিধাটা কোথায়?' শেষ পর্যন্ত দাহির যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি হাতিপৃষ্ঠে সওয়ার হন। বাইরে উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন ধর্মসেনা। উজীর বুদ্ধমান ছিল দাহিরের সামনে ঘোড়পৃষ্ঠে। হাতি কেল্লার দরোজায় পৌঁছুলে উজীরের খানিক সন্দেহ হল। তিনি কারো ইশারা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা দাহিরকে বাইরে বেরুতে নিষেধ করলেন।

ধর্মসেনা বারবার হাতির দিকে তাকাচ্ছিলেন। দাহির হাওদায় দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং ফটকের কিছু একটায় ঝুলে পড়লেন। হাতি বেরিয়ে গেল। কেল্লার দরোজা বন্ধ করা হলো। বাইরে এসে হাতি থামলে ধর্মসেনা দাহিরকে দেখতে পেলেন না।

অতঃপর উজীরকে বাধা দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন রাজা দাহির।

'ধর্মসেনা বাইরে নিয়ে আপনাকে হত্যার ফন্দি এঁটেছিল। আপনি দরোজার কাছাকাছি যেতেই আমার এক গুপ্তচর খবর পাঠায়।'

ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়, প্রকৃতই ধর্মসেনা দাহিরকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। দাহিরকে হত্যা করতে না পারার পাশাপাশি তৎক্ষণাৎ বাহিনী নিয়ে ধর্মসেনা খুবই ফাঁপড়ে পড়লেন। যুদ্ধে খুব চোট পেলেন তিনি। এছাড়া গরমও ছিল ওই সময় প্রচণ্ড। ধর্মসেনা জ্বরে আক্রান্ত হন। তার গায়ে পচন ধরে এবং দিন চারেকের মধ্যে ছাউনীতেই তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনা ৬৭২ খ্রীস্টাব্দের। ধর্মসেনা তখন ৩০ বছরের যুবক।

'কি বুঝলে বেলাল?' বেলালকে পুরো কাহিনী শুনিয়ে মায়ারাণী জিজ্ঞাসা করেন, 'রাজা দাহির আমার প্রতি কোন ধরাবাধা নিয়ম ও সীমাবদ্ধতা রাখেননি। আমাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের। তিনি জানেন আমি ভরা যৌবনা নারী। এ বয়সে আমাকে স্বামীর কাছে থাকার কথা। যৌবনপুষ্ট দেহের চাহিদাও তার অজানা নয়। সিংহাসন রক্ষার্থে তিনি আমার যৌবনকে জলাঞ্জলি দেন।'

'শুনেছি এদেশে যুবতী নারীদের উৎসর্গ করা হয়।'

'ঠিক শুনেছ। কোন পণ্ডিত বা জ্যোতিষী মানব জাতির উপর বালা মুসিবত নিপতিত হবার খবর দিলে কোন যুবতীকে তাদের কাছে হাওয়ালা করা এদেশের প্রথা আবহমান কালের। পরে একে বলী দেয়া হয়।'

'আমরা একে গোনাহ বলে জানি। তোমাদের ভগবান কেমন যিনি তার সৃষ্ট মানুষের খুন দেখতে ভালবাসেন?'

'সেই প্রথমই বলেছি, আমার সাথে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে কথা বলোনা। আমি যখন তোমার কাছে আসি তখন হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন থাকেনা। আমি এক নারী আর তুমি টগবগে যুবক। নারী তাকেই পছন্দ করে যে তার হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। আমি রাণী। জিঞ্জিরে পেঁচিয়ে তোমাকে আমার গোলাম বানাতে পারতাম। কিন্তু আমি নিজেই প্রেমের জিঞ্জিরে আটকে তোমার দাসী হয়ে গেছি--। আমি তোমার সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি যে, কেন আমার স্বামীকে ধোঁকা দিয়ে চলেছি। কেন তাকে আমার প্রেমের অযোগ্য ঠাওরাচ্ছি।'

আমি বলেছি, আমার ভাই আমার প্রেমের দুনিয়া দুমড়েমুচড়ে আমাকে তৃষ্ণাতুর মরুতে তড়পাতে ফেলে রেখেছেন। যেখানে আমি পিপাসিতা, অস্তিত্বের প্রতিটি অঙ্গ আমার জ্বলে ছাই। তিনি পুরুষ ও রাজা। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করতে পারেন তিনি। মহলে দাসীদের কমতি নেই। এক স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করারও কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই তার। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক্তিয়ার দিয়েছেন। তবে আমি যে এক রাণী। আমার আত্মসম্ভ্রমকে তো আর বিলীন করে দিতে পারিনা। আমি কারো স্ত্রী হতে পারি না। সহজাত প্রবৃত্তির গলাও টিপে দিতে পারি না। হৃদয়ে যে প্রেমাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তাকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। আমি কারো স্ত্রী হতে পারি না যিনি আমাকে সোহাগে ভরিয়ে দিবেন এবং যার সাথে জীবন যৌবনের পথে চলতে এতটুকু অসুবিধা হবে না আমার।

'আমি বুঝে গেছি রাণী। তুমি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছ। কিন্তু আমি এক আগন্তুক। এভাবে গোপনেই কি আমাদের অভিসার হবে?'

'না! আমি তোমাকে আমার সাথে রাখব।'

'রাণী! আমি দেশান্তরী না হলে তোমাকে মুসলমান বানিয়ে বিয়ে করতাম।'

'তুমি ফের ধর্মের নাম নিলে যে! আমি না স্বধর্ম ত্যাগ করব, না তোমাকে আমাদের ধর্মে টানার চেষ্টা করব।'

॥ সাত ॥

এর ছ'বছর পর।

রমলের রাজা দাহিরের রাজ্যে আক্রমণ করেন। তিনি দাহিরের কিছু এলাকা কব্জা করে অগ্রসর হলেন। তার বাহিনীতে ছিল হাতি। সেগুলো ছিল বিশালাকার। ওগুলোকে অঢেল খাদ্য দেয়া হত। যার কারণে শক্তি ছিল প্রচুর। হামলার পূর্বে হাতিগুলোকে মদপান করানো হত। হাতির পাশাপাশি রমলের অসংখ্য সৈন্য সমাগমে রাজা দাহির ঘাবড়ে যান। তার বাহিনী এ বিশাল সৈন্যের মোকাবেলা করতে অপারগ। দাহির তার উজির বুদ্ধমানের সাথে পরামর্শে বসলেন।

'মোকাবেলা করুন মহারাজ। আপনার সৈন্য কম তাতে কি হয়েছে। ধন ভান্ডারের দরজা খুলে দিন যেগুলো আপনি এতদিন বন্ধ করে রেখেছিলেন। জনগণের মাঝে তা বিলিয়ে দিন। এরপর তাদেরকেও দুশমনের বিরুদ্ধে নামতে বলুন। বীরত্বের সাথে যারা লড়তে পারবে তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করুন।' বললেন বিজ্ঞ উজীর।

'জনগণের তো অভিজ্ঞতা নেই। আনাড়ী লোক দুশমনের তোপের মুখে টিকতে পারবে না।' বললেন রাজা দাহির।

'তাহলে দুশমনের সাথে সন্ধি করে ফেলুন।'

'এর চেয়ে কি মৃত্যু শ্রেয় নয়? জানিনা দুশমন সন্ধির বদলে কি মূল্য চাইবে। সন্ধির অর্থ হাতিয়ার সমর্পণ। আর আমার পক্ষে হাতিয়ার সমর্পণ সম্ভব নয়।'

'তাহলে একটা পন্থা-ই অবশিষ্ট থাকে। মহারাজ। আরবদের যে সব বিদ্রোহীকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলুন।'

'কিন্তু তাদের সংখ্যা তো মাত্র পাঁচশ-এর মত। এর থেকে সামান্য বেশীও হতে পারে। এই নগণ্য লোক নিয়ে আমরা পেরে ওঠব না।'

'মহারাজ! আরবদের আপনি জানেন না। এ সেই জাতি যারা পার্সী ও রোমানদের পরাস্ত করেছেন এবং তাদের জঙ্গী শক্তি মিসমার করেছেন। এ জাতি যেমন নির্ভীক তেমনি স্বল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে অভিজ্ঞ।'

'চাচনামা' ও 'তারীখে মাসুমীর' মতে উজীর বুদ্ধমানের এই পরামর্শ রাজা দাহিরকে সন্তুষ্ট করেছিল। তিনি আশ্রয়ী মুসলমানদের কাছে গেলেন। তারা সংখ্যায় পাঁচ শতাধিক। এরা সবাই আরব্য কবিলার সর্দার ও সর্দার-পুত্র। বিদ্রোহী হয়ে এরা সিন্ধুতে আশ্রয় নিয়েছিল। এদের সর্দার ছিলেন মোহাম্মদ আলাফী। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তার নাম মোহাম্মদ হারেছ আলাফী। তিনি ছিলেন বনি উসামার সর্দার। সিন্ধুতে আগত আরব্য বিদ্রোহীরা তাকে আমীর নিযুক্ত করে। আলাফী গোত্র খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাকরানের আমীর সাঈদ ইবনে আসলাম কেলাবীকে হত্যা করে।

'মহারাজ!' আলাফী অগ্রসর হয়ে দাহিরকে অভিনন্দন জানান। বলেন, 'আপনি এবার সেভাবে আসেননি অন্যসময় যে ভাবে এসে থাকেন।'

'তোমাদের তলোয়ারই আমার শান-শওকত বাঁচাতে পারে। আমি প্রতিদান কিংবা খোঁটা দিতে আসিনি। দোস্তির প্রাপ্য নিতে এসেছি।' বললেন রাজা দাহির।

আলাফী তাকে বসালেন এবং জনাচারেক সর্দারকে ডেকে পাঠালেন।

রাজা দাহির তাদের জানালেন, বিশাল শক্তিধর এক রাজা তাদের বিরুদ্ধে হামলা করতে আসছেন। সিন্ধু থেকে মাত্র দশবারো মাইল দূরে তারা ছাউনী ফেলেছেন।

'খোদার কসম! আরব্য মুসলমানরা প্রতিদানের বদলা দিতে ভুল করেনা। আমরা দোস্তির প্রাপ্য মেটাব।' আলাফীর কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'তোমরা প্রস্তুতি নাও এবং আমার রাজ্যোদ্ধার কর।' দাহির হতাশা ও বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আমি আরো শুনেছি দুশমনের কাছে পাগলা হাতি রয়েছে। ওদের

আক্রমণ খুবই ভয়ানক। ওগুলোর চিৎকার বিপক্ষ বাহিনীর মাঝে ভীতির সৃষ্টি হয়। তোমরা এই হাতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে কি?'

'হে সিন্ধুর দাহির!' জনৈক বুড়ো আরব মুসলমান বলেন, 'আজ থেকে ৪০ বছর আগেকার দিনটির কথা স্মরণ করুন। আপনি তখন দুধের বাচ্চা। পারস্যের পরাস্ত অগ্নিপূজক জাতি আমাদের থেকে কোণঠাসা হয়ে বিপুল সৈন্য নিয়ে কাদেসিয়া প্রান্তরে সমবেত হয়েছিল। অগ্নিপূজকরা হাতিও এনেছিল। হাতি ছিল তখন আমাদের জন্য এক নয়া ও ভীতিজনক চীজ। আমি তখন জোয়ান। ওই রণাঙ্গনের একজন যোদ্ধা। হে সিন্ধুর রাজা দাহির, আপনার হয়ত জানা নেই, পারস্যদের হাতির জোগান দিয়েছিল তদানীন্তন সিন্ধুরাজ। এগুলো হিন্দুস্তানের জঙ্গী হাতি। চল্লিশ বছর চলে গেছে কিন্তু সেই হাতির রণহুংকার আমার কানে গুঞ্জন তোলে এখনও। ওই হাতি আমাদের সীমাহীন ক্ষতি সাধন করেছিল। কিন্তু আমরা হাতির শুঁড় কেটে দিয়েছিলাম। এ কাজ কি খুব সহজ?

'না, আমার শ্রদ্ধেয় দোস্ত। কাজটা খুব সহজ নয়। আমি তখন ছোট। বড় হয়ে শুনেছি, কাদেসিয়া প্রান্তরে মুসলিম জাতি পারসিকদের শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছিল। যখমী হাতিবহর উল্টো নিজ দলেরই শেষ পর্যন্ত অধিক ক্ষতি করেছিল।'

কাদেসিয়া যুদ্ধ হয়েছিল ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে। তদানীন্তন পারস্য সম্রাট ছিলেন ইয়াযদগরদ। ইসলামী সয়লাব রুখতে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রসমূহের কাছে সৈন্য চেয়েছিলেন। সিন্ধুর রাজার কাছেও তিনি মদদ চেয়েছিলেন। সিন্ধুরাজ তাকে কিছু সৈন্য ও যুদ্ধনিপুণ হাতি দিয়েছিলেন। জানা নেই কি পরিমাণ হাতি তিনি দিয়েছিলেন। হাতিগুলো হালকা সাদা রঙের ছিল। কাদেসিয়া প্রান্তরে ওই হাতিপৃষ্ঠে সওয়ার ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ বীর রুস্তম। মুসলমানের হাতে তিনি কাদেসিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারান।

'এজন্যেই আমি তোমাদের কাছে এসেছি। হাতির মোকাবেলা তোমরাই করতে পার। আমি তোমাদের মদদ করেছিলাম। এখন তোমরা আমার মদদ করো।' রাজা দাহিরের কণ্ঠে অনুনয়।

'আমরা অবশ্যই আপনাকে মদদ করব। আমাদের ভরসা আল্লাহর ওপর। হাতি রণাঙ্গনে আসতেই দেবনা। আমাদের মধ্যে যারা লড়াকু আছে তারা লড়বে। আপনার কাছে স্রেফ কিছু সৈন্য চাইব। বাকী সৈন্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবেন। দুশমন ছাউনীর কিছুদূরে আপনার বাহিনী ছাউনি ফেলবে এবং চারদিকে পরিখা খনন করবে। পাঁচশ সৈন্য হলেই আমার চলবে। অতঃপর পরবর্তী পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখবেন।' বললেন আলাফী। যুদ্ধ কাতার-আরব্য স্টাইলেই সাজানো হলো। পরে এর ফল স্রেফ দাহির-ই দেখল না, দেখল গোটা বিশ্ব, লিখে রাখল ইতিহাসের কলম।

রাজা দাহির আলাফীর কথামত পাঁচশ সৈন্য তাকে দিলেন। আলাফী এদেরকে ঘোড়ায় চাপালেন। দাহির বাহিনী কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেল এবং রমলের রাজার ছাউনি থেকে মাইল তিনেক দূরে ছাউনি ফেলল। অবশেষে পরিখা খনন করা হল।

ওই সময় আলাফী ছদ্মবেশে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করতে দুশমন শিবিরে গেলেন। পর্যবেক্ষণ করলেন এদের সৈন্য ও অস্ত্রের ফিরিস্তি। সংখ্যায় ওরা অশেষ। সন্ধি ছাড়া দাহিরের কোন গতি নেই।

রমলের রাজা দাহির বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সংখ্যায় এদের অতিনগণ্য দেখে তিনি নিশ্চিন্ত থাকলেন। দাহিরের পক্ষ থেকে হামলার কোন সম্ভাবনা দেখলেন না আপাতত।

গভীর রাত।

রমল বাহিনী ছাউনীতে গাঢ় নিদ্রায় বিভোর।

আরব ও সিন্ধুর সম্মিলিত বাহিনী আচমকা শিবিরে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করল। মুহূর্তে গোটা ছাউনিতে আগুন লেগে গেল। সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যু বিভীষিকা। পলায়ন করা ছাড়া দুশমনের সামনে আর কোন পথ নেই। কিন্তু আলাফীদের প্রচন্ড অগ্নিবাণ উপেক্ষা করে পলায়ন সে মুহূর্তে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। হাজারো সেপাই পুড়ে ছাই হলো। বন্দী হলো কয়েক হাজার। ধরা পড়ল গোটা পঞ্চাশেক হাতি। রমলের রাজার কোমর ভেঙ্গে গেল।

রাজা দাহির আরব্য মুসলমানদের পুরস্কারে দু'হাত ভরে দিলেন। শুধু পুরস্কারই নয়, মাকরানের বিশাল এলাকাও তাদের কব্জায় দিয়ে দিলেন।

ওই সময় বেলাল ইবনে ওসমান ও তার চার সাথী মহলের বিশেষ আস্তাবলে ঘোড়ার দেখভালের চাকরীতে কর্মব্যস্ত। মায়ারাণীর নজর বেলালের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত। প্রথাগতভাবে তিনি দাহিরের স্ত্রী হলেও নেপথ্যে তার সর্বান্তঃকরণ ছিল বেলালেরই। মায়ারাণী শিকারে বের হলে তার সাথে থাকতেন এই আরব্য পাঁচ জোয়ান।

॥ আট ॥

সময় চলে যায় আপন গতিতে। দাহিরের রাজ্য ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করে। এক সময় মুলতান পর্যন্ত তার অধীনে চলে আসে। সীমান্তের কিছু এলাকাও তিনি দখল করেন। দক্ষিণে মালাবার, গুজরাট ও গোয়ালিয়রের অংশ বিশেষ তিনি কব্জা করেন। কালক্রমে মায়ারাণীর চুল পেকে সাদা হয়ে যায়। বেলাল ইবনে ওসমানের দেহেও নেমে আসে বার্ধক্য। তারা একে অপরকে দেখে জীবিত থাকতেন।

রাজা দাহিরের প্রশাসন আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এতে তার মানসিকতা সংকীর্ণ হয়। তিনি হয়ে পড়েন স্বেচ্ছাচারী স্বৈরাচারী। তিনি রাজ্যব্যাপী জুলুম ও নৈরাজ্যের নরককুণ্ড স্থাপন করেন। ওই যুগে দাহিরের দেশে বৌদ্ধ জাতিই ছিল সংখ্যাগুরু। এরা ভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বী। দাহির এদের ওপর খুব জুলুম করেন। বৌদ্ধ বিহারগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন।

তিনি এক পর্যায়ে আরব্য উদীয়মান মহাশক্তির সাথে টক্কর দেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইরাকের গভর্নর হলে দাহিরের জুলুমের মাত্রা বহুলাংশেই বৃদ্ধি পায়। যে সব আরব বিদ্রোহী তার দেশে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মাধ্যমে তিনি আরব

শাসকের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়িয়ে দেন। হাজ্জাজের কাছে এ খবর পৌঁছুলে তাঁর প্রতিশোধ বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ওদিকে হাজ্জাজ তখন পুরো মুসলিম বিশ্বের অর্ধেকটার হাকেম। তিনিও জুলুম ও স্বৈরাচারের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন। তার ভয়ে আরো কিছু বিদ্রোহী বাগদাদ ছেড়ে সিন্ধুতে আশ্রয় নেয়। রাজা দাহির এদের কেবল রাজনৈতিক আশ্রয়ই দিলেন না; বরং ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে জোত-জমি দিয়ে নাশকতামূলক কাজেও উৎসাহ জোগাতে থাকেন।

এসময় মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পারস্যের সিরাজ প্রদেশের গভর্নর। বয়স মাত্র সতের। কিন্তু মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলে তিনি প্রবীণদের চেয়ে বেশী। পারস্যের কুর্দীরা ছিল যুদ্ধংদেহী। পারস্যের সম্রাটও এদের বিদ্রোহের মুখে নতি স্বীকার করেছিলেন। তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী ইবনে কাসিম এদেরকে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করেন যে, তার কথায় এরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এর পূর্বে পারস্যের যে সকল এলাকায় মুসলমানরা জয়লাভ করলেও শাসনাধীনে আনতে পারেনি সেখানে এই তরুণ সেনাপতি ইসলামী শাসন কায়েম করেন। ওই সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সিরাজের তেমন কোন মূল্যায়ন ছিল না। এটি সামান্য এক ভূখন্ড মাত্র। মুহাম্মদ বিন কাসিম সামান্য দিনেই বিদ্রোহীদের সৌধচূড়ায় লালবাতি জ্বেলে দেন এবং সিরাজকে তিলোত্তমা করে ফেলেন। আজকের সিরাজ নগরীর তিলোত্তমা হবার গোড়া পত্তন এই তরুণের হাতেই হয়েছিল সেদিন। ওই যুগে সেটা বেশ নামযশ কুড়িয়েছিল।

এই তরুণ তখনও অখ্যাত। খ্যাতি লাভ করার অপেক্ষায় ছিল তার তকদীর। বাকীছিল শুধু একটা পরীক্ষা। তার ভাগ্যাকাশে সুরাইয়া সেতারা সেদিনই চমকেছিল যেদিন বার্ষিক খেলাধুলায় তিনি খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের ভাই সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিককে পরাভূত করেছিলেন। সুলায়মান ভেবেছিলেন, তার ভাই খলীফা ইবনে কাসিমের এই বিজয়কে নিছক খেলাই মনে করবেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে গভর্নর বানানোয় তিনি মর্মাহত হন।

ওই দিনই খলীফা ইবনে কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর সাথে মতবিনিময় করেন। খলীফা অবাক হন, এখনও দাড়ীবিহীন এই তরুণ তার ভাইকে পরাভূত করেছে। এ ছেলে সালার হওয়ার যোগ্য কি না সেটা তিনি তলিয়ে দেখতে চান।

'ইবনে ইউসুফ!' খলীফা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে বলেন, খোদার কসম, এই ছেলে বিশাল সেনাপতি হবে এবং অনাগত ভবিষ্যৎ তার পদাংক অনুসরণ করবে। এমন মানুষ সৃষ্টিজীবের জন্য আর্শীবাদ বৈ তো নয়। ওকে নিয়ে যাও ইউসুফ-পুত্র। ওকে সালারের পদ দিয়ে দাও।'

তদানীন্তন ঐতিহাসিকগণ লিখেন, মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের গাত্র বর্ণছিল দুধে আলতায় মেশানো ডাগর ডাগর চোখ। সেই চোখের চাহনি দর্শকদের আপ্লুত করত। হাত মোটা ও দীর্ঘ। গুরুগম্ভীর কন্ঠ। যাতে ছিল দাপট প্রভাব। কিন্তু ভাষা বেজায় মিষ্টি। চেহারা ও ঠোঁটে লেগে থাকত সর্বদা পরিধি বাড়ানো হাসি।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বসরা এলেন। তার চাচা হাজ্জাজ তখন এখানকার হাকেম।

'মুহাম্মদ!' হাজ্জাজ ডাকলেন, 'মৃত্যুর পূর্বে আমি একটি খায়েশ পুরা করতে চাই।'

'কি খায়েশ চাচাজান?' মুহাম্মদ বলেন।

'এ সেই খায়েশ যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি ইতোমধ্যে। আমি সিন্ধুর প্রতিটি ভূমিকণা ইসলামী খেলাফতের অধীনে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, তুমি পারবে এই কাজ।'

'আমীরুল মুমিনীনের হুকুম দরকার। হুকুম এনে দিন। আপনার খায়েশ অপূর্ণ থাকবে না।'

'অন্তরায় কেবল ওই একটাই। আমীরুল মুমিনীন এমুহূর্তে হুকুম দেবেন বলে মনে হয় না। তবে এমন বাহানার তালাশে আছি যাতে খলীফাকে বাধ্য করা যায় এবং সিন্ধু অভিযানের অনুমতি হয়ে যায়। স্রেফ সিন্ধু নয় গোটা ভারতবর্ষ আমি ইসলামী খেলাফতে শামিল করতে চাই। তোমার গৃহশিক্ষক নিশ্চয় ইতিহাস পাঠে বলেছেন, কাদেসিয়া প্রান্তরে হাতি দিয়ে সাহায্য করেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী, চাণক্যবাদী হিন্দুস্থানী প্রশাসন।'

'হ্যা! চাচাজান। এর দু'বছর পূর্বে সালাসিল প্রান্তরে হিন্দু জাঠেরা শরীক হয়েছিল।'

'আমার গুপ্তচর সিন্ধুতে রয়েছে। তারা আশ্রয় প্রার্থীর ছদ্মাবরণে সিন্ধুর সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে আছে। নিয়মিত তারা আমার কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে। রাজা দাহির জলদস্যুদের পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতা করছে। মালাবার ও সরণদ্বীপের মুসলমানরা সমুদ্রপথে জাহাজে করে হজ করতে আসেন আর বণিকরাও ব্যবসাক্ষেত্রে পানিপথ ব্যবহার করেন। বণিকরা খবর দিয়েছেন, তাদের দু'তিনটি জাহাজে হামলা হয়েছে। অবশ্য জলদস্যুরা কামিয়াব হতে পারেনি। ওদের বিফলতার কারণ, ওদের কাছে পালতোলা জাহাজ ছিল যেগুলো দিয়ে বড় জাহাজকে রোখা সম্ভব হয় না। একটি জাহাজে তারা অগ্নিতীর ছুঁড়েছে। মাল্লারা জাহাজের গতিপথ বদলেছে। অবশ্য একটি জাহাজের পালে আগুন লেগেছিল। তিনি জাহাজ বাঁচিয়ে আনতে পেরেছিলেন অতিকষ্টে।'

'ওই জাহাজগুলোকে নির্বিঘ্নে চলতে আমাদের নিশ্চিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি স্রেফ একটা পন্থা জেনেছি। সিন্ধু কব্জা করতে পারলে সিন্ধু উপকূল আমাদের হাতে চলে আসবে। সিন্ধুর সর্বাপেক্ষা বড় বন্দরের নাম দেবল।'

'আমীরুল মুমিনীন থেকে এজাযত এনে দিন। অতঃপর দেবল বন্দর আপনার হাতে তুলে দেব।' ইবনে কাসিমের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'অনুমতির জন্য যারপরনাই কোশেশ করব আমি। তবে কামিয়াবী এতে কতটুকু হবো জানি না। দাহিরের লাশ আরব্য ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ হতে দেখা ছাড়া আমার স্বস্তি নেই---রাজা দাহির---আপন বোনের স্বামী।' দাঁত কটমট করে শেষের শব্দগুলো উচ্চারণ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

একমাস পর।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়েছে।

খানা খেয়ে গভর্ণর হাউজে বিশ্রাম নিচ্ছেন হাজ্জাজ। এ সময় বাইরে তিনি শোরগোল শুনতে পেলেন। তাঁর দেহরক্ষী কাকে যেন বারণ করে চলেছে। আগন্তুকের চিৎকার হাজ্জাজের কানে পৌঁছুতে শুরু করেছে।

'হাজ্জাজ! ----- হাজ্জাজ! ---সাহায্য----সাহায্য হাজ্জাজ!'

দারোয়ানকে ডেকে পাঠালেন হাজ্জাজ। বললেন, বাইরে হচ্ছেটা কি!'

'জীর্ণ শীর্ণ এক লোক জনাব।' দারোয়ান বললো, ' সে নাকি সরণদ্বীপ থেকে এসেছে। জলদুস্যরা জাহাজ লুন্ঠন করেছে এবং যাত্রীদের বন্দী করেছে।'

'তাকে ফওরান ডেকে পাঠাও। আমার মুখের দিকে তাকিও না। জলদী।'

হাজ্জাজের ধৈর্যচুতি ঘটল। ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তিনি স্থির বসে থাকতে পারলেন না। দারোয়ানের পিছু নিলেন তিনিও। মহলের বাইরে এক লোক ঘোড়ার পিঠে। কাঁপছেন তিনি। নেয়ে ঘেমে ঘোড়া ও সওয়ার একাকার। সওয়ারের মাথা নীচু। চিবুক সীনার সাথে লাগানো। মাথা ওঠাল সে। চোখ অর্ধনিমিলিত। মুখ খোলা। ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে। দেহে ধুলোবালি।

'হে হাজ্জাজ!' হাজ্জাজকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে সে বললো, 'সিন্ধুর জলদস্যুরা আরবদের জাহাজ লুন্ঠন করেছে এবং যাত্রীদের রাজমহলে ধরে নিয়ে গেছে।

সওয়ারকে পানি পান করানো হলো। কথা বলতে বলতে হাজ্জাজ তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সে বললো, 'মৃত্যু আমাকে বোধহয় ফুরসৎ দেবে না--- আমি এক আরব্য তরুণীর ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি। খুব সম্ভব আমি আর বেশীক্ষণ শ্বাস নিতে পারব না।'

এদিকে এই ঘটনাটি ছিল এইরূপ ঃ সরণদ্বীপে আরব্য মুসলমানের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছিল। এখানকার রাজা মুসলিম চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হন। তিনি মুসলিম খলীফার সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে চাইলেন। এজন্যে তিনি আটটি জাহাজ ভর্তি তোহফা প্রেরণ করেন। জাহাজ যথাসময়ে রওয়ানা হল। ঘোড়া ছাড়াও আরো মূল্যবান সামগ্রী ছিল এতে। হাবশী গোলামও ছিল।

এই তোহফার পাশাপাশি জাহাজে বেশকিছু মূসলিম নরনারীও ছিলেন। কিছ ব্যবসায়ীও ছিলেন। এদের কেউ আপনজনের সাথে মিলিত হতে আর কেউ ওমরাহ আদায় করতে যাচ্ছিলেন। তন্মধ্যেকার অনেকেই সরণদ্বীপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং এখানেই জোয়ান হয়েছিলেন। নিজদেশ আরব দেখতে ছিল তাদের যাত্রা।

মালাবারবাসীরা সিন্ধু উপকূল এড়িয়ে জাহাজ চালাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। জাহাজের কাপ্তানরা সেমতে জাহাজ চালনা করছিল। কিন্তু আচমকা আবহাওয়ায় পরিবর্তন এলো। সিন্ধু উপকূল তখনও বেশ দূরে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তাদের নিয়ন্ত্রণের মোড় ঘোরাল। কাপ্তানরা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না। বাতাস ও ঢেউয়ের মর্জির উপর জাহাজ ছেড়ে দিলেন। তারা রাস্তা পরখ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাতাস এত প্রবল ছিল যে, জাহাজ যেতে যেতে সিন্ধু উপকূলেই উপনীত হলো।

আচমকা বিশেষ এক ধরনের তুফান উছলে উঠল। এটা মানুষের তুফান। তুফান ছিল জলদস্যুদের। এই তুফান তামাম জাহাজকে ঘিরে নিল। এদের 'নাকামারা' বলা হত। ওরা বেশুমার। তারা জাহাজগুলোয় তীরবৃষ্টি আরম্ভ করে দিল এবং এতে চেপে বসল। যাত্রীরা যেহেতু যোদ্ধা ছিলেন না সুতরাং তারা মোকাবিলা করতে পারলেন না। যারা তলোয়ার উঠালেন তাদের কতল করা হলো।

জাহাজ মূল্যবান উপঢৌকনে বোঝাই। জলদস্যুরা এই তামাম উপঢৌকন লুণ্ঠন করল। যাত্রীদেরও বন্দী করে নিয়ে গেল। যাত্রীদের মধ্যে অনেক বধূ-মাতাও ছিলেন। তাদেকে দেবলের বন্দীশালায় আটকে রাখা হোল।

জীর্ণশীর্ণ লোকটা পুরো কাহিনী হাজ্জাজকে শোনালেন। তার আওয়াজ ক্রমশঃ বসে আসছিল। যবান ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। হাজ্জাজ তার মুখে পানি দিলেন। তিনি এগুলো গ্রহণ না করে বললেন, বন্দিশালার সেই হতভাগ্য আরব্য তরুণীর পত্র পৌঁছিয়ে আমি শান্তির চিরদম নিতে চাই।

'তিনি আরবের এক যুবতী। নাম জানা নেই। ইয়ারবুয়া খান্দানের সে। আমরা বন্দি অবস্থায় দেবলে উপনীত হলে নির্যাতন শুরু হলো। ওরা আমাদের মেরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলছিল। বনু ইয়ারবুয়ার এই যুবতী থমকে দাঁড়ালেন। তিনি আরবদেশের দিকে মুখ করে আসমানে হাত ওঠালেন। চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন, হে হাজ্জাজ! সাহায্য কর। সাহায্য কর।' আগন্তুকের তোতলামিজনিত একথায় হাজ্জাজের শিরার খুন টগবগিয়ে ওঠল। তিনি উত্তেজনাভরে বলে ওঠলেন, 'লাব্বাইক বেটি, লাব্বাইক! আমি হাজির বেটি, হাজির!'

ঐতিহাসিক বালাযুরী এই মেয়ের নাম উল্লেখ করেননি। ইয়ারবুয়া গোত্রের মেয়ে বলেছেন। কিছু কিছু সূত্র তার নাম নাহিদ বলেছে।

'হাজ্জাজ!' আগন্তুক বললো, 'ওখান থেকে কোন কয়েদী-ই বেরুতে পারবে না। ওখানকার এক আরব আমাকে ও আমার সাথীদের বের হবার মওকা দিয়েছে। ওখানে কিয়ামতের বিভীষিকা। ভগ্ন জাহাজ দেবল উপকূলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমরা পথিমধ্যে ওগুলো দেখে এসেছি। জলদস্যুরা এদিকে আসছিল। জনৈক আরব আমাকে বললেন, মাথা নীচু করো। এভাবে আমরা ভগ্ন জাহাজের তলে লুকোলাম। এই আরব বয়সে বুড়ো। তবে থুত্থুড়ে নয়।'

'জলদস্যুরা কয়েদীদের হাঁকিয়ে নিয়ে গেলে আরব বলল, 'বেলাল বিন ওসমান আমার নাম। যৌবনে স্বেচ্ছায় আরব থেকে দেশান্তরী হয়েছিলাম। খেলাফত আমাকে করেছিল বিদ্রোহী। আমি দেবলবাসী নই। দেবল থেকে বহুদূরে রাজা দাহিরের মহলে থাকি। আমি তার রাণীর দেহরক্ষী। তিনি আজ সামুদ্রিক সফরে এখানে এসেছেন। তোমাকে দেখলাম আমার দেশী। জলদস্যুরা আরবদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। তোমাদেরকে দু'টি ঘোড়া দিচ্ছি। সোজা বসরায় পৌঁছে যাও। পথিমধ্যে কোথাও থেমো না। বসরায় গিয়ে বলো, এই জলদস্যুরা রাজা দাহিরের লোক। দাহির যাকে দেবলের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন এদের পৃষ্ঠপোষক তিনিই।"

জলদস্যুদের হাত থেকে কারো বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। ঘটনাচক্রে মায়ারাণী দেবল ভ্রমণে এসেছিলেন। বেলাল তার সঙ্গে ছিল। বেলাল কোনভাবে দু'টি ঘোড়ার এন্তেজাম করে দিলেন এবং সন্ধ্যার পর আমাদের দেবল থেকে বের হবার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

'আমার সাথীর ঘোড়া ক্ষুধা পিপাসায় পথিমধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ল। সাথী ঘোড়াকে পরখ করল। আমি নামলাম। তড়পাতে তড়পাতে ঘোড়াটি মারা গেল। অতঃপর তাকে আমার পেছনে ওঠালাম। সামনে একটা চৌকি দেখে সেখান থেকে তাজাদম ঘোড়া নিলাম।' আগন্তুক চুপ হয়ে গেলেন। তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি বিড় বিড় করে বলছিলেন, হাজ্জাজ! সাহায্য কর। সাহায্য!' পর মুহূর্তে তার ফরিয়াদী কণ্ঠ চিরদিনের তরে খামোশ হয়ে গেল।

হাজ্জাজ অগ্নিমূর্তি ধারণ করে উল্কাপিণ্ডের মত পায়চারী শুরু করলেন।

॥ নয় ॥

ওই সময়টি ছিল ইসলামী খেলাফতের কাল। মাকরান ছিল খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। মোহাম্মদ ইবনে হারূনকে ওখানকার গভর্ণর বানান হাজ্জাজ। তিনি দাহিরের নামে একটি পত্র লিখেন। তার পত্রে লুণ্ঠিত জাহাজের মাল ও যাত্রীদের সসম্মানে ফেরৎ দানের নির্দেশ ছিল এবং ক্ষতিপূরণদানেরও কথা ছিল। খলীফার মোহর না লাগিয়ে হাজ্জাজ নিজে নাম দস্তখত করেন ওই পত্রে। দূত না পাঠিয়ে মাকারানের হাকেম মারফত এই পত্র দাহিরের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। পেরেশানীতে তার ঘুম উঠে যায়। রাজা দাহিরের জবাবের এন্তেযার না করে তিনি সিন্ধুর করদ রাজ্যগুলোয় হামলা করে বসেন।

রাজা দাহিরের জবাব এলো। হাজ্জাজের দূত হাজ্জাজকে জানাল, মাকরানের গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে হারূন এক পদস্থ অফিসারসহ সিন্ধুর রাজধানী ব্রাহ্মণ্যবাদে গেছেন। তাকে হাজ্জাজের পয়গাম দেয়া হয়েছে। দোভাষীর মাধ্যমে তা দাহিরকে বুঝানো হয়েছে। এতে দাহিরের কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। মোহাম্মদ ইবনে হারূনকে তাঁর পদমর্যাদা এমনকি একজন দূত হিসাবে যে সম্মানটুকু পাওয়া দরকার তাও দেয়নি রাজা দাহির। তিনি সংক্ষিপ্ত জবাবে বলছেন, জাহাজ লুণ্ঠিত হয়েছে সিন্ধু উপকূলে। আর সিন্ধু প্রশাসনের ওপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

অপর এক ঐতিহাসিক মোহাম্মদ ফারিশতা তার ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখে ফারিশতায়' লিখেছেন, হাজ্জাজের দূতের কাছে দাহির বলেন, যে জাতি মুসলিম জাহাজ ও এর যাত্রীদের আটক করেছে তারা শক্তিধর। তারা ধারণাও করতে পারে না যে, ওগুলো কেউ উদ্ধার করতে পারে।

দাহিরের এ কথার উদ্দেশ্য, তোমাদের জাহাজ আমরা লুট করেছি আর এর উদ্ধার তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এ ঘটনা তখন পর্যন্ত খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিককে জানাননি। কিন্তু দাহিরের পত্রের জবাব আসার পর তিনি খলীফার নামে দীর্ঘ এক পত্র লিখেন। পত্রের উপসংহারে লিখেন, আমাকে সিন্ধ আক্রমণের অনুমতি দেয়া হোক।

দরবারে খেলাফত থেকে হামলা না করার উত্তর এলো। খলীফা এই না এর কোন কারণ উল্লেখ করলেন না।

হাজ্জাজ এতে গর্জে ওঠলেন। তিনি খলীফাকে আরেকটি পত্র লিখলেন। এতে তিনি খলীফার আত্মসম্ভ্রমবোধের ওপর আঘাতপূর্বক বলেন, জাহাজে যেসব মহিলা ছিলেন তারা অধিকাংশই ওমরাহ্ গমনেচ্ছু। এখন তারা হিন্দু রাজার বন্দী খানায়।'

'আমিরুল মুমিনীন!' হাজ্জাজ উপসংহারে লিখেন, নিশ্চয় আপনি এভয়ে অনুমতি দিচ্ছেন না যে, এত দূরপাল্লার অভিযানে খরচ বেশী। আমি আমিরুল মুমিনীনকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই যুদ্ধে যে খরচ হবে তারচেয়ে অধিক আমি বাইতুল মালে জমা দেব।' এরপর খলীফা হামলার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হাজ্জাজ যে বাহিনী ইতোপূর্বে গোপনে জমা করেছিলেন তাদের মার্চ করার হুকুম দিলেন। এই বাহিনীর সালার ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহান। এ বাহিনীর গতি ছিল খুবই ক্ষীপ্র। ক'দিনের ব্যবধানে তারা দেবলে উপনীত হলেন।

হাজ্জাজের একটি ভুল হয়েছিল। তার গুপ্তচর রাজা দাহিরের যুদ্ধশক্তির সঠিক রিপোর্ট দিয়েছিল; কিন্তু ওদের সমর কৌশলের পুরোটার প্রতি তিনি অবগত না হয়েই বাহিনী প্রেরণ করেন। এটা ছিল বড় ভুল। তিনি পরে এ ভুলের মাশুল দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় চোট হাজ্জাজের এটা ছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে নুবহান পয়লা দিনেই শাহাদত বরণ করেন। ইতিহাস কালের সাক্ষী, আব্দুল্লাহর বীরত্বে এতটুক খাদ ছিল না। তিনি শাহাদতবরণ করায় সৈন্যদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। দাহির বাহিনী কেল্লার বাইরে এসে প্রচণ্ড হামলা চালায়। মুসলমানরা এ হামলার ধকল সহ্য করতে পারে না। অবশেষে তারা রণে ভঙ্গ দেয়।

হাজ্জাজ এই শোক সামলে বুদায়েল ইবনে তোহফাকে সিন্ধু আক্রমণের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

মর্মান্তিক

॥ এক ॥

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এই পরাজয়ের চোট সহ্য তো করলেন; কিন্তু আহার-নিদ্রা যেন হারাম হয়ে গেল। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন বদমেজাজী, রাগী। চরিত্রে তার ছিল গোস্বা পরিপূর্ণ। তার জুলুম দেখলে মনে হত লোকটার মাঝে, রহমের 'র' নেই। মুসলিম যে সব বিদ্রোহী আরব থেকে পলায়ন করে মাকারানে এসে ঠাঁই নিয়েছিল, যেকোন শর্তে তারা দেশে ফিরতে চেয়েছিল; কিন্তু হাজ্জাজের ভয়ে তারা দমে থাকল। এরা উমাইয়া খেলাফতের বিদ্রোহী। তারা মনে করত, খলীফার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন; কিন্তু হাজ্জাজের ডায়েরীতে ক্ষমা শব্দটি নেই।

এ সেই হাজ্জাজ, খলীফা ওয়ালিদ পর্যন্ত যাকে সমীহ করে চলতেন। সেই তিনি কি করে পরাজয়কে হজম করবেন। সুতরাং তার প্রেরিত আব্দুল্লাহ শাহাদতবরণ করলে তিনি বুদায়েল কে নয়া সেনাপতি বানান। তাকে বলেন;

'আর তুমিও ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে ওখনকার বিদ্রোহী সর্দারদের কাছে যেও, যারা মাকরানে বসবাস করছে। তাদের জন্য আরব-ইরাকের দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহর মত ওখানেই মরতে হবে। দেবলের কেল্লা ও দাহিরের লাশ চাই আমি।'

'তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক হাজ্জাজ! আব্দুল্লাহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। ওখান থেকে ফিরে আসার পূর্বে সেপাইদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম পরাজয়ের কারণ। সব সৈন্যই তাদের সালারের অকৃত্রিম প্রশংসা করেছিল। তিনি দুশমনের ওপর প্রভাব রেখেই মরেছেন, প্রভাবিত হয়ে নয়।

ওদের প্রভাবান্বিত করতে তিনি কাতারের মাঝখানে ঢুকে গিয়েছিলেন। দাহির হাতির ওপর সওয়ার ছিলেন। নুবহানের শাহাদতের ওপর কালিমা লেপন করো না হাজ্জাজ। তুমি ইরাকের গভর্ণর। খোদায়ী কুদরতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে যেও না।' ইবনে তোহফা বললেন।

'ইবনে তোহফা! খোদার কসম তোমার বীরত্বে আমি খোশ। অনেক পেরেশানী থেকেই এ কথা বেরিয়ে গেছে অজান্তেই। একটু ভেবে দেখো, খলীফা সানন্দে সিন্ধুতে হামলার অনুমতি দেননি। বড্ড কষ্ট করে তাঁকে রাজি করিয়েছি। পরাজয়ে আমি অতটা চোট পাইনি যতটা পেয়েছি পরাজয়ের পর তাঁর প্রেরিত ফরমান দ্বারা। তিনি বলেছেন, এখনো তোমার বুঝে এলো না, সিন্ধুতে হামলার বিরুদ্ধে কেন ছিলাম আমি?'

'তাহলে 'এখন দরবারে খেলাফত থেকে এজাযত মিলবে কি?' প্রশ্ন বুদায়েলের।

'আমি কারো এজাযতের তোয়াক্কা করি না। এ পরাজয় আমার। পরাজয় ইসলামের। বিজয় দ্বারা একে বদলে দিতে চাই আমি। খলীফাকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই, সিন্ধুতে হামলা ও কব্জা করার জরুরত কত---তুমিও বুঝে নাও ইবনে তোহফা। দুটি লোক আমাকে পরাজিত করেছে। এক, রাজা দাহির। দুই, ইবনে আব্দুল মালিক। তুমিও যদি সে কাজ কর যেটা করেছে নুবহান, তাহলে আমার হাত চিরদিনের তরে তার শক্তি খোয়াবে। হিন্দুরা মুসলমানদের কমযোর ঠাওরাতে থাকবে। এরপর সিন্ধু উপকূলীয় ও সরন্দীপের মুসলমানদের স্রেফ জাহাজ লুণ্ঠন-ই নয়, তাদেরকে বলির পাঁঠা সাব্যস্ত করবে।'

'এমনটি হবে না ইবনে ইউসুফ।' বুদায়েল বললেন।

'এটাও ভেবে দেখ ইবনে তোহফা। দেশ ও জাতির এক তরুণী আমার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছে। দাহিরের কয়েদখানায় সে বন্দী। সেই পয়গাম বাহক আমার সামনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।'

বসরায় যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তার নয়া সালার বুদায়েলকে প্রস্তুত করছিলেন, তখন রাজা দাহির তার রাজধানী আরোড়ে খাস কামরায় বসে ছিলেন। তিনি আরব্য সর্দার আলাফী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ঘরোয়া মিটিং ডেকেছিলেন। হাজ্জাজ প্রেরিত সালার নুবহানের শাহাদতের পর এই প্রথম দাহিরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ।

'তোমার দুশমনকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছি বলে তুমি খোশ হওনি?' রাজা দাহির বললেন।

'না। এ পরাজয় বনি উমাইয়ার নয়, পরাজয় ইসলামের।' আলাফী বললেন।

'তাহলে আমাদের বিজয়ে তুমি খোশ নও?'

'মহারাজ! আপনার চেহারা ও চোখ বলছে, আপনি আমার সাথে কোন বিশেষ কথা বলতে চান। যে কথার জন্য ডেকেছেন সেটা আগেভাগেই পেশ করা কি সমীচীন নয়?

'হ্যাঁ আলাফী! পরামর্শের জন্যই তোমাকে ডাকা---। আরবরা কি ফের হামলা করবে?'

'ওদের আত্মসম্ভ্রম বলে কিছু থাকলে অতি অবশ্যই। খলীফা ভেটো দিলেও ইরাকের কট্টর গভর্নর হাত ধুয়ে বসে থাকবে না। এই পরাজয়কে সে সহজেই হজম করবে না। আপনার ফৌজের যুদ্ধ কৌশল জেনে গেছেন তিনি। এবার হয়ত তিনি পরাস্ত হবেন না।'

'তুমি আমাদের মদদ করবে না? তোমাদের দেশ এক্ষণে এটা, আরব নয়।'

'মহারাজ! আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমরা আরব। ওটাই মাতৃভূমি। মাতৃভূমির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পারি না।'

'কিন্তু আরবরা হামলা করলে তোমাদের মদদ লাগবে যে আমার। ওই মদদের যে প্রাপ্য চাও দেব। যে এলাকায় তোমরা থাকছ তার পুরোটাই তোমাদের দিয়ে দেব। ওখানে তোমাদের স্বাধীন রাজ্য কায়েম হবে।'

'এতটুকু মদদ পেতে পারেন যে, আপনার বিরুদ্ধে আমরা লড়ব না। আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকব।'

'চিন্তা করে বলছ তো আলাফী! আমি তোমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দিয়েছি। এক্ষণে তোমাদের বরবাদও করতে পারি। দেশছাড়া করাও আমার সাধ্যাতীত নয়। এমনকি সকলকে পুরতে পারি অন্ধকার কারাগারেও।'

'মহারাজ! আমাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করার আগে ভেবেচিন্তে নিন। উজির বুদ্ধমানের সাথে সলা-পরামর্শ করুন। আপনাকে আবারও বলছি, আরব-সিন্ধুর যুদ্ধে আমরা তৃতীয় পক্ষের ভূমিকায় থাকব। আপনি যেন ভুলে না যান, যে সব আরব্য কাফেলার নারী পুরুষদের বন্দী করেছেন তাদের সাথে আমাদেরও সম্পর্ক আছে অনেকের। আপনি আমাদেরকে দেশছাড়া করার হুমকি ছেড়েছেন। এর জবাবে আমরা ওদের মুক্ত করার ঝুঁকি নিতে পারি। আপনি তো ধমক দিলেন, দেখি আমরা কি করতে পারি।'

'তোমাদেরকে কি করে বোঝাই যে, কয়েদীদের অবস্থানও আমার জানা নেই। আমি তো কাউকে জাহাজ লুণ্ঠনের হুকুম দেইনি। প্রভাবশালী কবিলা-ই জাহাজ লুণ্ঠন করেছে। শেষ পর্যন্ত তোমরাও আমাকে ওই অভিযোগে অভিযুক্ত করলে? এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তোমরা আমার ওপর ভরসা স্থাপন করতে পারছ না।'

'মহারাজ!' আলাফী উঠতে উঠতে বললেন, 'আমরা এমন এক দুশমনকে মেরে তাড়িয়েছি, যারা পুনরায় সিন্ধু আক্রমণ করতে প্রমাদ গুনবে। হিন্দুস্তানে আপনার বিরুদ্ধে কোন শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে আমরা তাদের মূলোৎপাটিত করব। এতদসত্ত্বেও আরবদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব না। আমাদের বিরোধিতা খেলাফত নিয়ে, প্রশাসনের সাথে; ধর্ম, জাতি ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নয়।'

'এতে পার্থক্যটা হলো কি? রাজা ও রাজ্যের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? যে আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাকে আমার দেশ, জাতি ও সাম্রাজ্যের গাদ্দার মনে করব।'

'মুসলিম সাম্রাজ্যে কোন রাজা হয় না। রাজ্য হয় আল্লাহর। খলীফা বাদশাহ হয় না। কওম হয় না প্রজা। কাজেই কেউ খলীফার বিরোধিতা করলে খলীফা তাকে খেলাফত কিংবা সালতানাতের বিদ্রোহী বলতে পারেন না। কিন্তু মহারাজ! এসব কথা থাক। আমাদের প্রথম ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটাই যে, আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যাব না।'

মোহাম্মদ আলাফী রাজা দাহিরের সাথে আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন। তার ঘোড়া বাইরে বাঁধা ছিল। ঘোড়ায় তিনি সওয়ার হলেন। মহল থেকে কিছুদূরে যাওয়ার পর এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ। আগন্তুক সালাম দিলে তিনি ঘোড়া থামান।

'কে তুমি?' আলাফী সিন্ধুর স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন।

'তোমার স্বজাতি। নাম বেলাল ইবনে ওসমান।' তিনি আরবী ভাষায় উত্তর দেন।

'কসম খোদার! তোমার চোখ আমাকে দেশের বালুতে চমকানো আলোর দ্যুতি দেখাচ্ছে। কিন্তু তুমি এখানে কেন?' প্রশ্ন আলাফীর।

'আমি রাজমহলের দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্য। বনু উমামার লোক আমি। কেন, তুমি আমার বাবাকে চেন না? ওসমান ইবনে হিশামকে কেইবা না জানে?'

'ওহ্‌হো! যখন আমরা দেশ ছাড়ি তুমি তখন ছোট। তোমার বাবা ছিলেন নামকরা লোক। তার খোদাভীতি ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি সর্দার ছিলেন না, কিন্তু সর্দারদের মাথা তার সামনে নুয়ে পড়ত। এখন বলো, তুমি এখানে এলে কি করে? আমাদের কাছে কেন গেলে না।'

বেলাল আলাফীকে ইশারা করলেন। আলাফী ঘোড়া থেকে নামলেন। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। বেলাল তার সিন্ধুতে পৌঁছার কাহিনী বলে গেলেন। অবশ্য মায়ারাণীর সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন।

'এখন আপনাকে সে কথাটি বলছি যে জন্য থামিয়েছি আপনাকে। কিন্তু ভয় করছি, আপনি রাজার অনুগ্রহে ধন্য। রাজার মেহেরবানী এতই বেশী ভোগ করছেন যে, তাতে আপনার ঈমানে কমযোরী এসে গেছে।' বেলাল বললেন।

'একথা কেন ওসমান-পুত্র?'

'কাফেরদের মেহেরবানীর ওজন এত বেশী যে, তার তলে ঈমান পিষে চ্যাপ্টা হতে বাধ্য। ও কথা এজন্য বলেছি যে, রাজা দাহির আরব্য জাহাজ লুণ্ঠন করেছেন। যাত্রীদের নির্যাতন করে বন্দী করেছেন। এদের মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ছিল। আরব্য ফৌজ দেখে মনে আশা জেগেছিল, বন্দীরা মুক্ত হবে। কিন্তু আমাদের বাহিনীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে হলো।'

'কিন্তু তোমার মনের কথা বলছ না ইবনে ওসমান। যেটা আমি আগেভাগেই জানি, সেটা বলছ না কেন?'

'কয়েদীদের রেহাই করার জন্য আপনার কি কিছুই করার নেই? বনি উমাইয়ার দুশমনি কি আপনাকে কিছু করতে বাধ সেধেই চলতে থাকবে?'

আলাফী বেলালকে রাজা দাহিরের সাক্ষাতের কথা শুনিয়ে যান এ প্রশ্নের জবাবে।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, একটি পরাজয়েই সিন্ধুর বন্দী মুসলমানদের ভুলতে বসেছেন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক।'

'কিন্তু হাজ্জাজ ভুলবে না। আমি তাকে জানি। খুনের বদলা তিনি খুন দ্বারাই নিয়ে থাকেন।'

'অপেক্ষা আমার জন্য মৃত্যুতুল্য। বাপের রক্ত আমার গায়ে প্রবাহিত। ওই রক্ত আমার শিরায় টগবগিয়ে ওঠছে। আমার কি করণীয় তা নিয়ে কথা বলার মত আমার কোন পরামর্শদাতা নেই। আপনাকে দেখে সাহস করে দাঁড়ালাম তাই।'

'কি ইচ্ছা তোমার?'

'আমি কয়েদীদের মুক্ত করব। কিন্তু কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে ওরা যাবে কৈ? আপনি আশ্রয় দিতে পারবেন কি?'

'ইবনে ওসমান! তুমি যদি কয়েদীদের মুক্ত করে আমার কাছে পৌঁছে দিতে পার, তাহলে অবশ্যই তাদের আশ্রয় দেব এবং মওকা মত জাহাজে তুলে দেব। কিন্তু তুমি তাদের রেহাই করবে কি করে?'

'রাতে কয়েদখানায় ঢুকতে হবে। জান নিয়ে খেলতে হবে। এমনও হতে পারে, কয়েদখানায় প্রবেশ করতে পারলে আর ফিরে হয়ত নাও আসতে পারি।'

'ক'জন যাবে?

'বেশী না। তিন কি চার জন।'

বেলাল ও আলাফী চলতে চলতে বন্দীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন।

এক সময় তারা কেল্লার ফটক পর্যন্ত চলে এলেন। আলাফী চলে গেলেন।

কেল্লায় ঢুকে কয়েদীমুক্ত করার ফন্দি মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল বেলালের।

আলাফী সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। চমৎকার এক পরিকল্পনা বাতলেছেন তিনি। মায়ারাণীর প্রতি বেলালের গোসসা হয়। যৌবনের সেই মায়া আর এই মায়ার মধ্যে কত পার্থক্য। সেই মন গলানো কথা আর এখনকার কথার বিস্তর ফারাক। তিনি রাণী, বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই রাণীসুলভ ব্যবহার তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে। এখনও তিনি মাঝে মধ্যে বেলালকে ডেকে নিঃসঙ্গ আলাপ করেন।

আরব্য বণিক কাফেলা লুণ্ঠন ও যাত্রীদের বন্দী করলে বেলাল রাজা দাহিরের কাছে তাদের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করতে বলেছিলেন মায়ারাণীকে।

না বেলাল! রাণী বললেন, 'ভায়ের ওপর আমার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। আমার কথায় তিনি কান দেবেন না।'

বেলাল প্রেমের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন। কিন্তু রাণী তার সিদ্ধান্তে অটল। এমনকি তিনি এও বলেছিলেন, তুমি রাজদরবারের কোন কাজে নাক গলাতে পারবে না।'

মায়ারাণী বেলালকে নিরাশ করলেও তার প্রতি এতটুকু রাগ করেন না তিনি। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন, দাহিরের কাছে মায়া সম্পূর্ণ অসহায়। তিনি মায়ার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বরদাশত করেন না।

॥ দুই ॥

এদিকে সিন্ধুতে বেলাল ও আলাফী যখন কয়েদী মুক্ত করার পরিকল্পনা বানিয়ে ফেলেছিলেন, ওদিকে তখন বাগদাদে হাজ্জাজ বুদায়েলকে আখেরী পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ওই সময় বুদায়েল তার বাহিনীর সাথে ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

'ইবনে তোহফা! তোমার হয়ত বুঝতে বাকী নেই, সিন্ধুতে হামলা জরুরী কেন। বহুত পূর্ব হতেই আমি সিন্ধুর উপকূলীয় এলাকা কব্জা করতে চেয়েছিলাম। এ উদ্দেশ্যও তোমার অজানা নয়।'

'হ্যাঁ ইবনে ইউসুফ! সিন্ধু উপকূল নিরাপদ থাকলেই কেবল আমাদের সরন্দীপমুখো জাহাজগুলো নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে।'

'খোদার কসম! তুমি আমার মনের কথাটাই আঁচ করতে পেরেছ। একথাও তোমার অজানা নয় যে, আমীরুল মুমিনীন শান্তিকামী মানুষ। তিনি আরাম-আয়েশের সাথেই ক্ষমতা চালাতে চান। এমনকি তিনি দুশমনকে দোস্ত বানাতে চান।

কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না, এতে দুশমন দুশমনই থাকে। আর যে পূর্বে দোস্ত ছিল, সে দুশমন হয়ে যায়। তিনি তো আমাকে সিন্ধু আক্রমণই করতে দিবেন না। আমিও তার অনুমতির তোয়াক্কা না করে তোমাকে পাঠাচ্ছি।'

'আমীরুল মুমিনীন এতে চটবেন না তো?'

'চটে করবেনটা কি। কওমের ইজ্জত-আবরু আমার কাছে বড়। খেলাফতের তুলতুলে গদিতে বসে খলীফা ওয়ালিদ ঠাহর করতে পারছেন না যে, আজ এক হিন্দু রাজার প্রভাবে দমে গেলে কাল সে আমাদের টুটি চেপে ধরতে আরবেই সরাসরি হামলা করে বসবে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মানসিকতা আমার অজানা নেই। আপন বোনকে যে কুলাঙ্গার বিয়ে করতে পারে, তার ওপর আবার ভরসা কিসের।'

'একটা ব্যাপার নিয়ে তুমিও চিন্তা করোনি ইবনে ইউসুফ। সিন্ধুর রাজা পাঁচ/ছয়শ আরবকে আশ্রয় দিয়েছে। শুনেছি ওই দেশের হয়ে ওরা একটি লড়াইতে অংশগ্রহণও করেছে এবং প্রভাবশালী এক দুশমনকে পরাস্ত করেছে। ওই আরবরা আসন্ন লড়াইতে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে না?'

'হ্যাঁ পারে। গুপ্তচর দ্বারা ওদের ওপর কড়া নযর রাখছি আমরা। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে বলে এমন কোন খবর এ যাবত পাইনি। ময়দানে এলেও ভয়ের কিছু নেই, কারণ ওরা আমাদের বিদ্রোহী। বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে ওদের মনে যে আগুন, তা এই যুদ্ধে ওদের প্রলুব্ধ করলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এ পরিস্থিতি সামাল দিতেও তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আমি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। কিন্তু কথা যা তাহলো এই যে, যেদিন থেকে মুসলিম জাতি পরস্পরের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করা শুরু করেছে, সেদিন থেকে এ জাতির পতন শুরু হয়েছে। আমার তলোয়ারের সামনে এলে কেউই রেহাই পাবে না। কিন্তু ইবনে ইউসুফ! মুসলমানদের ওপর তলোয়ার ওঠালে আমার হাত ঠিকই কাঁপবে।'

'তাহলে ওই মুসলমানদের তলোয়ারই তোমার গর্দান আলাদা করে ফেলবে। খলীফার অনুমতি ছাড়াই এই দূরপাল্লার কষ্ট সহিষ্ণু পথে তোমাকে পাঠাচ্ছি ইসলামের সম্ভ্রম রক্ষার্থে। মসনদের জন্য খলীফা যেভাবে তার ভাইকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি, সেভাবে আমিও ইসলামকে অজেয় করতে এসব বিদ্রোহীকে খতম করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করব না। উমাইয়া খেলাফতের নেমকখোর আমি। এতদসত্ত্বেও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে আমি এমন প্রভাবশালী হতে চাই যাতে খলীফার কাছে কোন ব্যাপারে আমার জবাবদিহি করতে না হয়। আর বুদায়েল! তোমার ভাগ্য তোমায় হাতছানি দিচ্ছে। সিন্ধু বিজয় করতে পারলে তুমিই ওখানকার হাকেম হবে।'

হাজ্জাজের কর্মকান্ড প্রমাণ করে, ওই সময় তিনি গভর্ণর হয়েও খলীফার সমপর্যায়ের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করতে চাইতেন। অবশ্য কওমের দুশমনকে এতটুক

ছাড় দিতে তিনি ছিলেন নারাজ। তিনি স্বতন্ত্র একটি শক্তি হিসাবেই আবির্ভূত হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মুসলিম বণিক কাফেলা ও বধূ-মাতাদের বন্দী করার প্রতিশোধ নিতে হাজ্জাজ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। যে মাথা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে হাজ্জাজ সে মাথা ধুলোয় ফেলেই তবে ক্ষান্ত হবেন–এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি তার শাসন ক্ষমতা চালাতেন।

'ইবনে তোহফা!' হাজ্জাজ বলেন, 'এখন তোমাকে আর আম্মান যেতে হবে না। তোমাকে স্রেফ তিনশো সেপাই দিচ্ছি। মাকরানের হাকেম তোমাকে তিন হাজার সেপাই দিবেন। তুমি সোজা মাকরান যাবে। পরবর্তী নির্দেশ তিনিই দিবেন। যেসব গুপ্তচর ওখানে কাজ করছে, তাদের প্রধান ওই হাকেমই।'

॥ তিন ॥

রাজা দাহির তার উজির বুদ্ধমানকে ডাকলেন। উনি এলে তিনি বললেন, উজির মশাই! আপনি যুদ্ধের কোন সংবাদ দিতে পারবেন কি? আরব থেকে কি আরেকটি ধূলিঝড় এগিয়ে আসছে?'

'ধূলিঝড় তো এসেই থাকে মহারাজ! কখনও পূর্ব থেকে আবার কখনও পশ্চিম থেকে। দেখার বিষয়, আমরা এই ধূলিঝড়ের মুকাবিলা ঠিকমত করতে পারছি কি-না। নিশ্চিত বলতে পারি, আরবের ধূলিঝড় আসবে। মুসলিম জাতি পরাজয় সহজে হজম করার জাতি নয়। মহারাজকে তাই থাকতে হবে সদা সতর্ক।' বললেন বুদ্ধমান।

'রমলের রাজা সিন্ধুর ওপর চড়াও হলে তুমি আরব্য আশ্রয়ীদের যুদ্ধে শামিল করাতে বলেছিলে। সেই যুদ্ধে তোমার পরামর্শমত কাজ করে আমরা প্রভাবশালী দুশমনকে কুপোকাত করেছিলাম। এবারও আমি আরব্য ওই আশ্রয়ীদের কাছে আসন্ন যুদ্ধে শরীক হতে আহ্বান জানিয়েছিলাম, কিন্তু তারা মুসলমানের মুকাবেলায় নামবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ওদের সর্দার কয়েদীদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এক্ষণে বলো, মুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করা উচিত? ওদেরকে অবাধ্যতার মজা আস্বাদন করাব কি?'

'না মহারাজ! শত্রুসংখ্যা অহেতুক বাড়াতে যাবেন না। এদের দুশমন বানালে আমাদের বিরুদ্ধে সিনা টান করে দাঁড়াবে। ওদের সাথে সম্পর্ক আরো নিবিড় করতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে গুপ্তচর। জানতে হবে ওদের মানসিকতা। ওদেরকে মিত্র বানালেও ওদের উপর ভরসা স্থাপন করা যাবে না। মুসলিম জাতিকেই হামেশা দুশমন মনে করবেন। ওদেরকে নিজ ভূমিতে থাকতে দিন। গোটা রাজ্যে বিচরণের অনুমতি দিলে ওরা তবলীগ শুরু করে দেবে। মহারাজার ছত্রছায়ায় থেকে ওরা ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে। ওরা সেই অন্ধকার মহারাজ, যা কিনা চেরাগের নীচেই থাকে।

‘ওরা আরব্য হামলাবাজদের পাশাপাশি হামলা করে বসলে সবগুলোর মস্তক ছেদন করব। সিন্ধু তথা গোটা ভারতবর্ষে কেবল একটিই ধর্ম থাকবে। আর সেই ধর্ম আমাদের এই ধর্ম।’

‘মহরাজ! ওই কয়েদীদের ছেড়ে দেয়ার কথা ভেবেছেন কি?’

‘না বুদ্ধমান। কখনও ভাবিনি। ওদের ছেড়ে দিলে আরব শাসকরা আমাকে কমযোর ঠাওরাবে। এছাড়া আরব দূতের কাছে আমি বলেছি যে, কয়েদীরা আমার অধীনে নেই। এখন কোন্ মুখে বলব, ওরা আমার কাছে আছে। না না, এটা কখনও হতে পারে না। ওই কয়েদীদের আজীবন জেলের ঘানিই টানতে হবে।’

সমস্ত ঐতিহাসিকের মতে, যাত্রীদেরকে ধরে এনে দেবলের কয়েদখানায় বন্দী রাখা হয়েছিল। ওই কয়েদখানার জেল সুপারের নাম ছিল কুবলা। ইতিহাস তার ধর্মমত সম্পর্কে নিশ্চুপ। তবে সে যে মুসলমান ছিল না এটা নিশ্চিত।

আজ সেই কয়েদখানার কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। দাহিরের যুগের এটি ছিল একটি বিখ্যাত কয়েদখানা। এর ভিতরের পরিবেশ ছিল খুবই বিভীষিকাপূর্ণ। ওই কয়েদখানায় যে ঢুকত, সে-ই ইনসানিয়াতের বহির্ভূত বলে গণ্য হত। তাদের ওপর নেমে আসত অমানুষিক নির্যাতন।

আরব্য মুসলিম যাত্রীদের এই কয়েদখানার প্রথম রাত। জেল সুপার মধ্যরাতে এদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে। এদের চালান হয়ে আসার সময় কুবলা দেখেছিল। কয়েদীদের মধ্যে যুবতী এবং শিশুও ছিল। এই কয়েদীদের খেয়ালেই কুবলা জেলখানায় এসেছিল। প্রতি কয়েদীকে গোলাম মনে করা হত। কয়েদী নারীরা তার রক্ষিতা হত। বিশেষ করে সমুদ্রযাত্রী এই আরব্য নারীদের ব্যাপারে কুবলা ভাল কোন ব্যবহার করবে এটা আশা করা যায় না।

সে জেলখানায় সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে গানের গুঞ্জন শুনতে পেল। কয়েদীদের চিৎকার, ব্যথার আর্তনাদ সবই তার কানে এলো। কিন্তু জেলের এই নারকীয় পরিবেশে গানের কলি রীতিমত ভৌতিকই বটে!

কয়েদখানায় প্রচুর সংখ্যক কারারক্ষী ছিল। তাদের একজনকে আসতে দেখা গেল।

‘সে কুবলাকে জানালো ঃ এরা আজকে আসা কয়েদী। যখন থেকে এসেছে, তখন থেকেই ইবাদতে মশগুল।’

কুবলা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। কারাগারের এই মধুর আওয়াজ তার কাছে ভালো লাগল। কুঠরির সামনে দিয়ে সে এগিয়ে গেল। সকলেই কিবলামুখী সেজদাবনত। সকলেই কলেমার আওয়াজ বুলন্দ করছে। কেউই দরোজার দিকে তাকিয়ে দেখল না যে, কে হেঁটে যাচ্ছে। কুবলা শেষ কুঠরি পর্যন্ত গেল। জনৈক সান্ত্রীকে সে কানে কানে কিছু বলল।

‘সমস্ত কয়েদীরা খামোশ হয়ে যাও।’ সান্ত্রী চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করল, জেল সুপার তোমাদের উদ্দেশে কথা রাখবেন।’

কয়েদীরা খামোশ হয়ে গেল। লৌহ শলাকার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সকলে। তাদের চিৎকারে কারো আওয়াজ শোনা গেল না। সান্ত্রীরা সেলের লৌহ শলাকায় ডাভা দিয়ে পিটুনি শুরু করল।

'একজনে কথা বলো। আমি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।' বললো কুবলা।

'এদিকে!' জনৈক বয়োবৃদ্ধ আরব বললেন, 'কে তুমি? আমার সাথে কথা বলো।' কুবলা সেলের দরোজায় এসে দাঁড়াল।

'তুমিই কি এই কয়েদখানার সুপার?' বৃদ্ধ গোসসা কম্পিত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি অপরাধে আমাদের বন্দী করা হয়েছে?'

'কাউকে বন্দী করা কিংবা মুক্ত করা আমার আওতাধীন নয়। হুকুমের গোলাম আমি। কাজেই আমার নিন্দামন্দ করো না। আমি তোমাদের উদ্দেশে কিছু কথা রাখতে চাই। তোমরা সকলে মিলে কি গাইছিলে? ওই আওয়াজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ওই আওয়াজ কি তোমার হৃদয়কে মোমের মত গলায়নি?'

'একটা প্রতিক্রিয়া যে হয়নি, তা নয়। আমাকে ওই গীতের শব্দ আবার শোনাও।'

এই বুড়ো মালাবারে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবসা করে আসছেন। ভারতবর্ষের বেশ কিছু এলাকার ভাষা তিনি রপ্তও করেছিলেন।

'এটা গীত নয়, এটা আমাদের কলেমা। যার অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসূল। এভাবে আমরা কোরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্মিলিতভাবে উচ্চারণ করি।' বৃদ্ধ বললেন।

'এর দ্বারা তোমাদের ফায়দাটা কি শুনি?' প্রশ্ন কুবলার।

'আত্মিক প্রশান্তি। খোদার সন্তুষ্টি। জাহান্নাম থেকে মুক্তি।'

'তোমরা সবে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে বলে মনে কর?'

'আমরা অপরাধী হলে অপরাধের সাজা স্বরূপ কারাবাস মেনে নিতাম। পরে আল্লাহর কাছে মুক্তি নয় কৃত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চাইতাম। নিরপরাধ আমরা। সম্পূর্ণ বেআইনী আমাদের পাকড়াও করা হয়েছে। আমাদের বৈধ মাল ক্রোক করা হয়েছে। আল্লাহ-ই আমাদের মদদ করবেন। তোমার ও তোমাদের রাজার কাছে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তবে রাজার পতনের খুব একটা বাকী নেই।'

'তোমরা তার পতনের দোয়া কর বুঝি?'

'না! আমরা কারো অনিষ্টকামী নই। পুরস্কার-তিরস্কারের মালিক আল্লাহ। ভালো কাজের প্রতিদানে তুমি ভালো ফল পাবে আর খারাপ কাজের প্রতিদানে খারাপ ফল ভোগ করবে।' বৃদ্ধের অকুতোভয় উক্তিতে কুবলা প্রভাবিত হল। যে অসৎ উদ্দেশে সে এসেছিল তা উবে গেল। রাজা দাহিরের অনুমতি ছাড়া সে কয়েদীদের মুক্ত করতে পারে না, কিন্তু সে যে প্রভাবিত হয়েছিল সেটা কয়েদীদের পক্ষের হয়েই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, কুবলা খুবই ধীমান ছিল। জ্ঞানী ও লেখক ছিল। অবাক লাগে, এমন চৌকস লোককে কেন কি উদ্দেশে জেল সুপার বানানো হয়। জেল সুপাররা ওই যুগে কসাই প্রকৃতির হয়ে থাকত। এরা অসহায় ও দুর্বল মানুষের ওপর ডান্ডা ঘোরাত যাচ্ছে তাই।

॥ চার ॥

যেদিন সালার বুদায়েল ইবনে তোহফা বসরা থেকে তিনশো' সেপাই নিয়ে রওয়ানা দেন, সেই দিন মুসলমানদের বন্দী করে রাখা দেবলের সেন্ট্রাল জেলের সুউচ্চ দেয়ালের পাশে বেলাল তার তিন সাথী নিয়ে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে মযবুত একটা রশি ছিল, যার দু'কোণে দুটি লোহার কড়া লাগানো। রাত্রি তখন শেষ প্রহর।

বেলাল ও তার সাথীরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে জায়গাটা উঁচু-নীচু। টালি আর কংকরে পরিপূর্ণ। অন্ধকার রাত। এদিক সেদিক দেখে বেলাল এই জায়গাটা রশি নিক্ষেপের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন। দেয়ালের ওপর ছোট ছোট বুজ বানানো ছিল। ওখানে দাঁড়ালে কারাগারের চারদিক এক নজরে দেখা যেত। প্রতিটি বুর্জে এক একজন সান্ত্রীর প্রহরা ছিল।

বেলাল তার সঙ্গীদের এমন এক ঢিবিতে নিয়ে যান যেখান থেকে সহজে প্রাচীরে চড়া যায়। ওখানে দাঁড়িয়ে বেলাল প্রাচীরে রশি নিক্ষেপ করলেন। লোহার কড়া প্রাচীরে আটকে গেল। আঁধার রাতে কড়া প্রাচীরে পতিত হওয়ার শব্দ সান্ত্রীদের কানে যায়। বেলাল ও তার সাথীরা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে দ্রুত ঢিবি থেকে নেমে দেয়ালে মিশে যায়। তারা উপরের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ তাদের কানে তেমন কোন আওয়াজ এলো না। সর্বপ্রথম বেলাল রশি ধরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ওপরে ওঠতে থাকেন। প্রাচীরটা কেল্লার মতই। প্রাচীরের উপরিভাগ এত সমতল যে, একটি ঘোড়া সহজেই দৌড়াতে সক্ষম। বেলাল প্রাচীরের ওপর গিয়ে বসে পড়েন। তার এক সাথী ওপরে ওঠছিল। সেও এক সময় পৌছে গেল। একে একে সকলে পৌঁছে গেল। তাদের কাছে তলোয়ার। কোমরের বেল্টে খঞ্জর।

এদের কেউই কয়েদখানার ভেতরের খবর জানে না। কয়েদখানা বেশ প্রশস্ত। প্রাচীরের গায়ে দপদপে মশাল জ্বলছে। বেলাল কয়েদী মুক্তির জন্য পাগলপারা। এজন্যে তার সর্বাগ্রে জানার দরকার ছিল কয়েদখানার ভেতরের অবস্থান ও পরিবেশ কেমন। তিনি আলাফীর সাথে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন, পথিমধ্যের কারারক্ষীদের হত্যা করতে হবে এবং তাদের হাতিয়ার কয়েদীদের দিতে হবে। কারারক্ষীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলে তারা প্রধান ফটক খুলে দেবে এবং গোটা কয়েদীদের ছেড়ে দেবে।

বেলাল তার সাথীদের রশি নিক্ষেপের স্থানে রেখে যান। তিনি এক কর্নারের বুর্জে পৌঁছে যান। কখনও ঝুঁকে আবার কখনও লঘু পায়ে চলছিলেন তিনি। তার চলার গতি ঠিক জেল সুপারের মত। মহলের দেহরক্ষী বাহিনীতে বেশ ক'যুগ চাকুরী করার দরুন তিনি ফৌজি পরিভাষা ও বিশেষ আওয়াজ রপ্ত করেছিলেন।

বুর্জের কাছে পৌঁছুলে প্রহরী ডেকে বলল, কে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! ওখানেই থাক।'

কয়েদী কারাগারের অফিসার মনে করে যথাস্থানেই দাঁড়িয়ে রইল। বুর্জগুলো সাধারণ ছাদবিশিষ্ট। চারদিক থেকেই খোলা। বেলাল ভেতরে গিয়েই প্রহরীর সিনায় তলোয়ার ধরলেন। বললেন,

'তলোয়ার ফেলে দাও।'

প্রহরী তলোয়ার ফেলে দিল। বেলাল তাকে বিছানায় বসিয়ে শাহরগে তলোয়ার উথিত করলেন। বললেন,

'আরব্য কয়েদীরা কোথায়? ঠিক ঠিক বলবে। জলদি।'

কয়েদী ভয়ে ভয়ে বললো, 'ওই দিকে সেল-এ।'

'রাস্তা বল। এও বল সেলের চাবি কার কাছে?'

'আমি তোমাকে সবকিছুই বলছি। এ কয়েদখানা না আমার বাপের, না আমার বাবা এখানকার সুপার। আমরা নিছক পেটের দায়ে এই চাকুরী করি। তুমি আমাকে হত্যা করো না, আমিও তোমার পথ আগলাব না। আমার গর্দান থেকে তলোয়ার নামাও।'

বেলাল গর্দান থেকে তলোয়ার নামালেন।

'এখন বলো!' বেলাল বললেন।

'আমি তোমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেছি, আমার সাথে তেমন আচরণ করো। যদি তুমি একা হও কিংবা তোমার সাথে স্রেফ চার-পাঁচ জন লোক থেকে থাকে, তাহলে বলব, তুমি এখান থেকেই ফিরে যাও।'

'কেন?'

'কয়েদীদের মুক্ত করতে চাইলে পারবে না। তোমাদের সঠিক মত ও ইচ্ছা আমাকে জানালে পথ দেখাব। যদি আমাকে অবিশ্বাস করো, তাহলে জেনে নাও, তোমরা সফল হতে পারবে না।'

'তার আগে বলো, আমার সাথে এত পীরিত তোমার হোল কি করে? মৃত্যুকে কি তুমি এতটা ভয় পাও? আমি একাকী আমার স্বজাতির জন্য জীবন নিয়ে খেলছি। আর তুমি---।' বললেন বেলাল।

'আমি কার জন্য জীবন নিয়ে খেলব? ওই বে-গোনাহদের জন্য, যাদের পাকড়াও করা হয়েছে? এ ধরনের পাপ রাজা-মহারাজারা করতে পারেন। সুতরাং তাদেরকে কেউ উদ্ধার করতে এলে উদ্ধারকারীদের পথ আগলে জান দিতে যাব না আমি। সাধ্যে কুলালে ওদেরকে সেলের তালা খুলে বের করে দিতাম। আমি এও জানি, ওদের জন্যই আমাদের দেশে মসিবত নেমে আসছে। এই আপদ তোমাদের আরব থেকেই জুটেছে।'

'আমার ধারণা ছিল, তুমি একটা বেকুফ। কিন্তু কথায় তুমি বেশ পটু।'

'ঠিক বলছ আমার আরবী দোস্ত! একথা আমাকে আমার বাবা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের রাজা আরবদের একবার পরাজিত করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন। তিনি আরবদের টের পাননি। আরবরা আবারো আসবে। আমাদের রাজা নিজেকে আসমানের দেবতা জ্ঞান করেন। এক্ষণে তার সাজা হওয়া দরকার। তিনি আপন বোনকে বিবাহ করে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন।' সান্ত্রী বললো।

সান্ত্রী তাকে পথ বাতলে দিল এবং বললো, চাবি কারারক্ষীদের কাছে থাকে না। চাবি একটি বিশেষ কামরায় থাকে। ওই কামরাও বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। ওখানে দু'পাহারাদার আছে। কামরার চাবি ওদের কাছে। এরা সাধারণ রক্ষী নয়। পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার। তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। কয়েদীরা কোথায় আছে এবং কোথায় কোথায় পাহারাদার আছে।

এই সান্ত্রীর মাথায় পাগড়ী ছিল। বেলাল সহসাই তার মাথার পাগড়ী খুলে তাকে ল্যাং মেরে ভূতলশায়ী করলেন। পাগড়ী ফেড়ে হাত-পা বেঁধে মুখে এক টুকরা গুঁজে দিলেন।

'তোমাকে জানে মারব না দোস্ত! কিন্তু তোমার প্রতি ভরসাও স্থাপন করতে পারছি না। কেউ এলে সে-ই তোমার বাঁধন খুলে দেবে।'

বেলাল সাথীদের কাছে এসে গেলেন। ওদের নিয়ে এলেন সেই বুর্জে। বুর্জের মেঝেতে বিছানো ছিল মোটা একটা কাঠ। ওটি সরিয়ে সিঁড়ির পথ পাওয়া গেল। তারা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। প্রহরী তাদের ভুল পথ বলেছে। পথটি গর্তের মত। এ পথে তারা চাবি রাখা কামরার সামনে বহু কষ্টে পৌঁছলেন। ওখানকার লৌহ শলাকার দরোজা খোলা। দরোজাটি খুবই মযবুত। এখানে বিশাল দু'টি তালা। কেল্লার প্রবেশ দ্বারের মত। ওই কক্ষের চারপাশে দেউড়ি।

খোলা কামরায় প্রবেশ করলেন বেলাল ও তাঁর সাথী। দেয়ালে দপদপ করছে দু'টি মশাল। মশাল হাতে নিলেন বেলাল। চার জনই কামরায় ঢুকে দেখলেন ছাপপড়খাটে দু'লোক নিদ্রামগ্ন। তারা এদের জাগালেন। ধড়ফড়িয়ে উঠল তারা। নাঙ্গা তলোয়ার দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল।

'কারার সেলের চাবি দাও। বাইরে বেরোবার দরোজার চাবিও।' বেলালের কণ্ঠে নির্দেশের সুর। তাদের একজন দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আরেকজন বের করল একটি পাথর। একজন আগন্তুকের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, এ পাথরটি দেয়াল থেকে আলাদা করা হয়। সান্ত্রী দেয়ালে হাত দিয়ে চাবি বের করল এবং বেলালকে দিয়ে দিল।

'আমি সেল ও প্রধান ফটকের চাবি তলব করেছি।'

প্রহরী ভয়ে ভয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে তালাবদ্ধ কামরা খুলল। অতঃপর বেলালের মুখের দিকে তাকাল। বেলাল মশাল নিয়ে তার কাছে গেলেন। সে বেলালকে কামরায় নিয়ে গেল। একটি কক্ষের দেয়ালে বড় বড় চাবির গোছা ঝুলছে। সান্ত্রী দু'গোছা চাবি বেলালের হাতে দিলো। সে সেল ও প্রধান ফটকের চাবি বুঝিয়ে বলল।

কক্ষটি বেশ প্রশস্ত। দেয়ালে চাবির পাশাপাশি বর্শাও লটকানো।

তাঁর চার সাথী এদেরকে হাত-পা বেঁধে কক্ষে শুইয়ে রাখল। বাইরে বেরিয়ে তারা কক্ষের দরোজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। মশাল যথাস্থানে রাখলেন বেলাল। ওই আলোতে কুঠরিতে কাতরানো সান্ত্রীদের গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তারা সেল-এ এসে পৌঁছলেন। গর্তাকৃতির ওই সেলগুলো, যা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। গর্তাকৃতির স্থান মাড়িয়ে ডানে মোড় নিতে হবে বলে জানিয়েছিল বুর্জের সান্ত্রী। ওখান থেকে বড় বড় সিঁড়ি ভূগর্ভে নেমে গেছে। এই পথ-নির্দেশনা মোতাবেক এরা অগ্রসর হলো। সিঁড়ির পার্শ্বে জ্বলছে লণ্ঠন।

সেলে পৌঁছে বেলাল কতকটা বুলন্দ আওয়াজে বললেন, আজ তোমরা এই নরককুন্ড থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছ।

কয়েদীরা নিদ্রামগ্ন ছিলেন। সময়টা তখন শেষ প্রহর। বেলালের আওয়াজে সকলে জেগে শোরগোল করে ওঠল।

'খামোশ। বেলাল বললেন। এখনও তোমাদের বড় সফর বাকী। আমাদের লড়াই করতে হতে পারে।

যেভাবে শোরগোল উঠেছিল, সেভাবে আবার থেমে গেল। একটা কিছু ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তে জনৈক কয়েদী আর্তনাদ করে ভূতলশায়ী হয়ে পড়ল। তার পিঠে বর্শা গেঁথে গেছে। রক্তে মেঝে লাল। বাকী সাথীরা উপরের দিকে তাকাল। সিড়িতে জনা সাতেক কারারক্ষী বর্শা উঁচিয়ে দন্ডায়মান।

বেলাল দেখলেন বুর্জের সেই পাগড়ীবদ্ধ সেপাইও আছে এদের সাথে। যিনি তাকে না মেরে কেবল বেঁধে রেখে এসেছিলেন।

'আরবী দোস্ত হে!' ওই সান্ত্রী বললো, 'আমি তোমাকে ভূ-গর্ভে যেতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথায় তুমি আস্থাশীল হওনি। খুব সম্ভব ভেবেছিলে, রাতভর আমি ওভাবেই পড়ে থাকব। কিন্তু জানতাম, কিছুক্ষণ পর আমার পরবর্তী শিফটের ডিউটিম্যান আসবে। তোমার বন্ধুত্বের প্রাপ্য আমি মিটিয়েছি। এবার যাদের নেমক খেয়েছি তাদের প্রাপ্য মেটানোর পালা। এক্ষণে তুমি এখানেই থাকবে। এখান থেকে কোন কয়েদী মুক্ত হতে পেরেছে বলে কোন রেকর্ড নেই। একমাত্র জল্লাদ-ই তোমাকে এই সেল থেকে বের করে নেবে।

'তলোয়ার ফেলে দাও।' সান্ত্রীর কণ্ঠে অফিসারের সুর, 'তলোয়ার ফেলে উপরে চলে এসো। নইলে বর্শা তোমার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।'

'বন্ধুরা আমার।' বেলাল অনুচ্চ স্বরে সাথীদের বললেন, 'ওরাও তো আমাদের যিন্দা ছাড়বে না। এসো লড়াই করে মরি।'

চার সাথী একত্রে তলোয়ার উঠালেন। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মত তারা সিঁড়ির ওপরে উঠলেন। ওপরের লোকদের বর্শা তাক করাই ছিল। বেলালের দু'সাথীর বক্ষ ছ্যাদা হয়ে গেল। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে তারা নীচে পড়ে গেলেন। বেলাল ও অবশিষ্ট সাথীটি একজনকে ঘিরে নিলেন। বেলালের সাথী পর্যায়ক্রমে তিন বর্শাধারীকে খতম করলেন। বেলালের পা পিছলালে তিনি নীচে গড়িয়ে পড়লেন। তিনি ওঠতে গেলে সান্ত্রীরা তাকে পাঁজাকোলা করে জাপটে ধরল। তাকে এমন এক কুঠরীতে নিয়ে আসা হোল, যেখানে মানুষের খুনের দুর্গন্ধ আসছিল। মনে হচ্ছিল এখানে প্রতিদিনই মানুষ জবাই করা হয়। দেয়ালে দেয়ালে খুনের ছাপ।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন।

রাজা দাহির মহলের খাস কামরায় সিংহ-শার্দুলের মত পায়চারী করছিলেন। তার স্ত্রী মায়ারাণী মাথা নীচু করে বসা।

'তোমার কথা মত আমি চার কুলাঙ্গারকে দেহরক্ষী বাহিনীতে ঢুকিয়েছিলাম।' রাজা দাহির বলছিলেন, 'তোমার কথামত এ কাজ করেছিলাম, নইলে এ ঝুঁকি নিতে যেতাম না। গোটা বিশ্বে তাকাও। কোন দেশের রাজা-প্রজা মুসলিম জাতির ওপর ভরসা করে না। গো-মাতার মাংস ভক্ষণকারীদের ওপর কোন ভরসা নেই। তুমি অভিযোগ করেছিলে, আমি চার/পাঁচশ' আরব্য বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্ত দেখনি, তাদের রেখেছি কোথায়? মাকরানের সেই স্থানে এখন প্রহরা বসিয়েছি। কিছু যাযাবর লোক তাদের আশেপাশে বসতি নির্মাণ করেছে। ওরা ভবঘুরে বেদুঈন নয়। ওরা আমার ফৌজেরই পদস্থ লোক। প্রকাশ্যভাবেই যারা বেদুঈনের বেশে বসবাস করছে। আরব থেকে আরেকটি হামলা আসন্ন। আমি জানি, এই আরব্য জাতি তার জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গ দেবে অতি অবশ্যই।' বললেন দাহির।

'ওদেরকে ওফাদার ও ধর্মভীরু ভেবেই আপনাকে ওই অনুরোধ জানিয়েছিলাম। একে আমার অদূরদর্শিতা বলেও ভাবতে পারেন। কৃতকর্মের সাজা পেয়ে গেছে ওরা। জীবন্ত ধরা পড়েছে বেলাল। আজীবন কারার ঘানি টানাতে পারেন ওকে, কিংবা--।'

'আমি ওই নেমকহারামকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। সুপারকে বলে দিয়েছি, নির্যাতন করে কথা বের করতে এবং এই ষড়যন্ত্রে আর কে কে শরীক তা জানতে। এর একটা সম্পর্ক আলাফীর সঙ্গে রয়েছে বলে আমার ধারণা। কিংবা আরব্য গুপ্তচরদেরও এতে হাত থাকতে পারে। কয়েদখানার অফিসারগণই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি সে মুখ না খোলে, তবে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করতে বলেছি।'

এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত কোন প্রতিক্রিয়া মায়ারাণীর মাঝে দেখা গেল না। বেলালের প্রতি তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, তাকে মহলের দেহরক্ষী বানিয়েছিলেন। রাণীর ভয়, বেলাল তাকে ছেড়ে না যায়। এজন্যেই তাকে এই পদ দেয়া। আজ সেই বেলাল মৃত্যুর মুখোমুখি। সেও আবার যেমন–তেমন মৃত্যু নয়, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

অতি সকালেই সুপার এসে কয়েদখানার খবর জানিয়েছিল। রাজা দাহির ওই মুহূর্তেই বেলালের ফয়সালা করেছিলেন। তিনি বেলালের সাজাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড। বেলালের সাথীদের লাশের ব্যাপারে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন– এদের লাশ দাফন কিংবা না পুড়িয়ে শূলিবিদ্ধ করে চৌরাস্তায় লটকে রাখতে।

রাজা দাহিরের হুকুম মত বেলালের ওপর নেমে এলো লোমহর্ষক নির্যাতন। তাকে একটি প্রশস্ত বেঞ্চের ওপর উর্ধ্বমুখী করে শুইয়ে রাখা হোল। হাতের দু'কব্জি লৌহ কড়ায় আটকানো। পা'ও সেভাবে আটকানো। ওই বেঞ্চ প্রচন্ড বেগে ঘুরানো হলো। বেলাল মনে করলেন তার গোটা হাড্ডির জোড়া ভেঙ্গে যাচ্ছে।

‘বলো তোমার সাথে আর কে কে ছিল?’ জল্লাদ আকৃতির একজন ওই বেঞ্চ ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল, ‘মাকরানের আরবরা কি এর সাথে আছে?’

ঘেমে বেলাল একাকার। দাঁত তার ঠক্‌ঠক্‌ করছে।

‘না! আমার সাথে স্রেফ এই তিন সাথী ছিল, যারা নিহত হয়েছে।’ বেলাল বললেন।

‘আরবী সর্দার আলাফী তোমাকে কি বলেছিল?’

‘আমি কখনও মাকরান যাইনি।’

দুপুরের দিকে তিনি হুঁশ হারান। বেঞ্চ থেকে তার বাঁধন খোলা হলে ঢলে পড়েন। কোশেশ সত্ত্বেও দাঁড় করানো গেলন না। ফরাশেই তাঁকে শুইয়ে দেয়া হলো। পানি চাইলে পানি তার মুখের কাছে এনে সরিয়ে নেয়া হত। পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ।

বিগত রাতে তাঁকে যে কামরায় রাখা হয়েছিল, সেটায় তালা লাগানো হলো। কামরার পচা রক্তের সাথে তাঁর অজস্র ঘামও দুর্গন্ধ বাড়াতে থাকল। নিম্নমুখী হয়ে তিনি নিথর ফরাশে পতিত। ছোট বড় পোকা-মাকড় তাঁকে পেয়ে বসল। বিষাক্ত পোকা তাঁকে কামড়ও বসাল; শরীর চুলকাতেন তিনি।

মধ্য রাতে দরোজা খুলে গেল। এবার তাঁকে কামরায় অবস্থিত গোলাকার চাকতিতে চড়ানো হলো। এবার তাঁর দু'পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। শুরু হলো কোড়াঘাত। জিজ্ঞাসা করা হলো, মাকরানের কোন্ কোন্ আরব ছিল তোমার সাথে বল।’

‘ছিল না কেউ।’

চামড়ার কোড়াঘাতে বেলালের শরীরে গর্ত হয়ে কালো দাগ পড়ে যেত। ‘আর কে ছিল, বল?’

‘যারা ছিল তারা মারা গেছে।’

‘বদ নসীব ইনসান! কি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখোমুখি তুমি। সত্যি বলে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করো। ওরা ছাড়াও আরো কেউ তোমাদের সাথে ছিল।’

‘হ্যাঁ! আর ছিলেন আমার আল্লাহ।’

আবার সপাং সপাং কোড়াঘাত। নিম্নমুখী তার শরীর কেঁপে ওঠে।

‘ডাকো তোমার আল্লাহকে! বলো, তোমাকে ও অন্যান্য কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিতে।’

‘আল্লাহই তাদের ছাড়িয়ে নেবেন। আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।’

রাত পোহাল, বেলাল বেহুশ হয়ে গেলেন। চাকতি থেকে নামিয়ে তাকে আবার সেই দুর্গন্ধময় জমকালো কুঠরীতে ঢুকানো হলো। কোন খানাপিনা দেয়া হলো না। সকালের বেশ কিছু পরে হুশ এলে নতুন পদ্ধতিতে তাঁর দৈহিক শাস্তি চলল।

দিনভর চলল এই নির্যাতনের মর্মান্তিক পালা। রাতে সামান্য বিশ্রাম দেয়া হলো। পরে আবার সেই কামরায় ঢোকানো হলো কিছুক্ষণের মধ্যে আবারো বেহুশ।

পরদিন সকালে দাহিরকে জানানো হলো, বেলাল কারো নাম বলছে না।

'যে শাস্তি তাকে দেয়া হয়েছে, গভারও হয়ত তা সহ্য করতে পারবে না। মনে হচ্ছে এই তিন জনই তার সাথে ছিল। মাকরানের আরবরা খুব সম্ভব এতে শামিল ছিল না।' সংবাদদাতা জানাল।

'জল্লাদের কাছে তাকে হাওয়ালা করে দাও। অবশ্য এখন থেকে যৎসামান্য খানাদানার এন্তেযাম করো। কাউকে ভুখা-নাঙ্গা মারা ভালো কথা নয়।' বললেন দাহির।

বেলালকে খানা দেয়া হলো। দেয়া হলো পানিও। এতে তাঁর বাকশক্তি ফিরে এলো। সন্ধ্যার দিকে তাঁকে জানানো হলো, এটাই তাঁর জীবনের শেষ রাত্রি।

'কোন খায়েশ থাকলে বলতে পার।' সুপার বললো।

'আমার খায়েশ একটাই। এই বে-গোনাহ মুসাফিরদের ছেড়ে দাও। পুরুষদের না হলেও কমপক্ষে নারী ও শিশুদের।'

'আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি মায়ারাণীর বহুত খেদমত করেছি। তিনি এলে তাকে শেষবারের মত দেখে নিতাম এবং মাফ চেয়ে নিতাম।'

'এটাও সম্ভব নয়। রাণীকে আমরা কি করে ডাকব।'

'মরার পূর্বে আমার প্রতি এতটুকু দয়া করো। মায়ারাণী পর্যন্ত আমার এ খবরটা পৌঁছাও। দেখবে তিনি এসে যাবেন।'

কুবলা খুবই রহমদিল ছিলেন। তিনি বললেন, বেলাল! মায়ারাণী যদি এসেই থাকেন, তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেও। তিনি রাজাকে যে কোন কথায় রাজি করাতে পারেন। তিনি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিতে সক্ষম।'

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালে মায়ারাণী ডেথ সেলে এলেন। বেলালের আশা ছিল মায়ারাণী তার অমানুষিক নির্যাতনে জর্জরিত দেহের প্রতি তাকিয়ে না বলতেই ক্ষমা করে দেবেন। মায়ারাণী একজন রাণীর বেশেই এলেন। তার আশেপাশে দশ/বারো জন দেহরক্ষী। সেলের চারপাশে তারা দাঁড়ানো। লৌহ শলাকার ভেতরে মাথা নীচু করে বেলালকে বসা দেখা গেল। রাণীর ডাকে বেলাল গ্রীলের কাছে এলেন।

'এসেছেন মহামান্য রাণী! আমার বিশ্বাস ছিল আপনি আসবেন।'

'কিন্তু আমি কল্পনাও করতে পারিনি তুমি এই মহা অপরাধ করবে।'

'আমি বে-গোনাহ স্বজাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। এ কাজটুকু আপনিই সমাধা করতে পারতেন। কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন।'

'বলো এ কাজে কে উৎসাহ দিয়েছিল? তুমি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক। অন্যের কথায়-ই তুমি এসেছিলে। বলো, কে সে?'

'এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য লোকেরা আমার হাড়-মাংস জুদা করেছে। এ প্রশ্নের কোন জবাব আমার জানা নেই। জবাব থাকলে আমার এই দশা হত না।'

মায়ারাণী এবার তার প্রেমের দোহাই পেড়ে কে কে শরীক ছিল জানতে চাইলেন। আলাফীর ষড়যন্ত্রে এই কাজ করেছে বলে মুখ খুলতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত চেপে গেলেন বেলাল। এই একটি বিষয়ের রহস্য জাল খুলতেই রাণীর আগমন। নয়ত বেলালের মত মহা অপরাধীর সাথে সাক্ষাৎ করতে তার বয়েই গেছে।'

'মায়া! তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে পারবে কি? রাজা কেবল তোমার কথাই রাখতে পারেন। আমাকে মুক্তি দিলে তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাব।'

'না! তোমাকে একটা কথাই জিজ্ঞাসা করেছি আর তুমি সেটার মিথ্যা উত্তর দিয়েছ।'

'না মায়া না। সত্য কিছু থাকলে এ মুহূর্তে লুকোতাম না। আমি তোমার সাথে কোন দিনও মিথ্যা বলিনি। তোমার আমার সম্পর্ক এমন নয় যাতে আমি কিছু লুকোতে পারি। আমি তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাই– রাণী আমাকে বাঁচাও।'

বেলালের শারীরিক দুর্বলতা এত যে, তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি লৌহ শলাকা আঁকড়ে ধরলেন। মানসিক দুর্বলতা দৈহিক দুর্বলতার চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশী। এ ধরনের অমানবিক শাস্তি তাকে জীবনমৃত করে ছেড়েছে। এজন্য তিনি জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন। শক্তিতে কুলালে তিনি এমন অনুনয় করতেন না।

'আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না।' মায়ারাণী বললেন।

'সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তুমি আমার কাছে প্রেম ভিক্ষা করতে। ওই লুকোচুরি তুমি কি ভুললে রাণী, যখন তুমি আমাকে তোমার চোখের আড়াল হতে দিতে না।' বেলাল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।

'প্রেম!' রাণী তাচ্ছিল্যের সুরে উচ্চারণ করলেন, 'বেলাল ওকে প্রেম বলো না। প্রেম বলে ওতে কিছু থাকলে তা ছিল দৈহিক ক্ষুধা। তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল। তোমাকে সেভাবে পুষতাম, যেভাবে মনিব কুকুর পুষে থাকে। সে সময় ফুরিয়ে গেছে। যৌবনের সে পিচ্ছিল পথ অতীত ইতিহাস। এজন্যেই তোমাকে বলতাম, ধর্মের নাম নিও না। তোমার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ থাকলে ধর্মান্তরিত হয়ে যেতাম। কিংবা তোমাকেই আমাদের ধর্মে টেনে নিতাম। এক্ষণে তুমি আমাদের আসামী। তুমিই যদি রাজা দাহির হতে, তাহলে এ ধরনের অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারতে কি?'

'কি হুকুম মহারাণী?' কুবলা জিজ্ঞাসা করেন।

'সাবেক হুকুমই।' মায়া বললেন।

মায়ারাণী কয়েদখানা থেকে বেরোলে বেলালকে কক্ষ থেকে বের করা হলো। তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নেয়া হচ্ছিল। পিঠমোড়া দিয়ে তাঁর হাত বাঁধা হোল। দু'পা বেঁধে নিম্নমুখী করে ফেলে রাখা হোল। জল্লাদ তাঁর মাথা নীচু করে দিল। এক কোপেই তাঁর দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হলো।

॥ সাত ॥

এর দু'তিন দিন পর সালার বুদায়েল ইবনে তোহফা ৩/৪শ' সেপাই সহকারে মাকরানে উপস্থিত হলেন। ওখানকার হাকিম মোহাম্মদ ইবনে হারুন তিন হাজার ফৌজ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সালার ওখানে মাত্র এক রাত থাকলেন। বাদ ফজর দেবলের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মুসলমানরা তখনও জানে না, কয়েদীদের কোথায় রাখা হয়েছে। সালার বুদায়েলও না। এর দ্বারা বোঝা যায়, মাকরানের হাকেমও তা জানতেন না।

হাজ্জাজের নির্দেশ ছিল সর্বাগ্রে দেবল কব্জা করতে হবে। সিন্ধুর একমাত্র বন্দর এটা। বর্তমানে যাকে আমরা 'করাচী' বলে জানি। বন্দর কব্জা করা গেলে উপকূল আমাদের দখলে আসবে এবং রসদ পাঠাতে সুবিধা হবে। সেই নির্দেশ মেনে বুদায়েলের দেবল যাত্রা।

আরব্য খেলাফতের বিদ্রোহীদের প্রতি নজর রাখতে রাজা দাহির বেদুঈন বেশে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। এ উদ্দেশে তাদের বিবি–বাচ্চাদেরও ওখানে প্রেরণ করেন। এদেরই কেউ বুদায়েল ইবনে তোহফার বাহিনীকে দেখে ফেলে। তারা দ্রুতগ্রামী উটে করে একজনের মাধ্যমে দেবলে খবর পাঠায়।

দেবলবাসী এ ঘটনা জানত না। উট সওয়ার সেই বার্তাবাহী মুসলিম বাহিনীর একদিন পূর্বেই দেবলে আগমন করে। সে আরব অভিযানের কথা গভর্নরকে জানায়। জানায় তাদের সৈন্য সংখ্যার কথাও।

'দেবলবাসী!' দেবলের সরকারী অফিসারগণ বলেন, 'আরব্য মুসলমানদেরকে মৃত্যু আরেকবার ডেকে আনছে– হুশিয়ার! খবরদার! যুবকরা হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে শহরে ওঁৎ পেতে থাকবে। তোমাদের বাহিনী বাইরে লড়বে। দেবল মন্দিরে মৃত্যু ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

দেবলের সর্বাপেক্ষা বড় মন্দিরের নাম দেউল। এই নামেই অত্র শহর খ্যাত। দেবলের হিন্দু গভর্ণর ওই সওয়ারকে আরোড় গিয়ে রাজা দাহিরকে আরব বাহিনীর আগমনের সংবাদ দিতে বলেন। তিনি তার বাহিনী কেল্লার বাইরে নামান এবং দেবল থেকে অনতিদূরে ছাউনি ফেলেন। এলাকাটি বন্ধুর। টিলা ও টিবির মোড়ে সৈন্যদের সারি মোতায়েন করেন। উদ্দেশ্য ঘাঁটির আড়াল থেকে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করা। এই ঘাঁটি মুসলমানদের জন্য খুবই খতরনাক প্রমাণিত হয়েছিল।

সিন্ধীদের মনোবল এজন্য বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা ইতঃপূর্বে আরবের এক বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল এবং দু'জন সালার তাদের হাতির পদতলে পিষ্ট হয়েছিল। তারপর মুসলমানদের হতাশা ও লেজ গুটিয়ে পালানোয় ওরা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। সিন্ধু কমাণ্ডারগণ সেপাইদের এই বীরদের স্মৃতিচারণ করাচ্ছিল। এতে সৈন্যদের মাঝে নব জীবনের সূত্রপাত হয়।

সালার বুদায়েল ইবনে তোহফা সসৈন্যে দেবলমুখো হতে থাকেন। আরব্য সমর কৌশল মোতাবেক তিনি প্রথমে অগ্রজ বাহিনী প্রেরণ করেন। এরা এসে জানাল, সামনে দুশমন ঘাঁটি গেড়েছে। তারা তাদের প্রস্তুতিরও আগাম সংবাদ পরিবেশন করে।

বুদায়েল ছিলেন অভিজ্ঞ সমরবিদ। তিনি আঁচ করতে পারেন, দুশমন তাদের আগমন সংবাদ টের পেয়ে গেছে। তিনি তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। দেবলের সড়কে দু'অংশকে নিয়োগ করেন। এর মধ্যে এক দলকে রাস্তার পার্শ্বে, আরেক দলকে রাস্তা থেকে সামান্য দূরে থাকতে বলেন। বুদায়েল রাস্তা থেকে হটে অগ্রসর ফৌজকে বললেন, সামনে দুশমনের ঘাঁটি। তিনি এদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেন।

দুশমন ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে ছিল। এরাও কিছু লোককে আগাম সংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তারা মুসলমানদের যুদ্ধকৌশল পরিবর্তনের ঘটনা আঁচ করতে পারল না। ওদের দৃষ্টি সালার বুদায়েলের ওপর-ই আটকে থাকল। এদেরকে প্রধান দল মনে করে সালার তার বাহিনীর গতি কমিয়ে দিল। সে বুদায়েলের বাহিনীকে ঘাঁটিতে পৌঁছার মওকা দেয়।

শেষ পর্যন্ত অপর দুই বাহিনী ওই এলাকা পেরিয়ে যায়, যেখানে বুদায়েলের অপেক্ষায় দুশমন বাহিনী চুপটি মেরে ছিল। সালার বুদায়েলের দু'অংশই দেবল বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালালো। ঘাঁটির দুশমন ঘাঁটিতে থাকল। হিন্দুরা এ কৌশল প্রতিহত করার উপায় জানত না। তাদের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল।

সালার বুদায়েল নিকটে পৌঁছুলেন। তাঁর অগ্রগামী ফৌজ হামলা করছে দেখে নিজের অংশ নিয়ে তিনিও প্রচণ্ড হামলা চালালেন। হিন্দুরা এই সাঁড়াশি আক্রমণে বিলকুল ভগ্নোৎসাহ হলো। হিন্দুদের যুদ্ধ এক্ষণে জয়ের জন্য নয়, যুদ্ধে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। তারা পালানো শুরু করল। ময়দানে শুধু মুসলমানদেরই দেখা গেল।

দেবল বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হলো। সূর্য না ডুবলে সেদিন তাদের অর্ধেক ফৌজই মারা পড়ত। সন্ধ্যার আঁধারিতে দুশমন পলায়ন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লড়াই ওদিনের মত ক্ষান্ত করা হোল।

সালার বুদায়েলের বাহিনী দেবল যাত্রার মত শক্তি পাচ্ছিল না। অনেকে মাকরান থেকে এসেই যুদ্ধে নেমেছিল। সন্ধ্যায় এরা বিলকুল নেতিয়ে পড়ল।

অতি সকালে সালার বুদায়েল তাঁর বাহিনীকে দেবল অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। দুশমনের লাশ ময়দানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কেউ তাদের লাশের সৎকার করতে এগিয়ে এল না। রাতের বেলা শেয়াল-কুকুর ও বনবিড়াল ওগুলো খেতে লাগল। সকাল বেলা দেখা গেল গীধরদের ভীড়।

মুসলিম বাহিনী বেশী দূরে যেতে পারেনি। এমতাবস্থায় ঈশান কোণে যেন নতুন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা দিল। সালার-সেপাইদের ওপর এই মেঘ তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। এই মেঘ ছিল দেবল বাহিনী। সালার তাঁর বাহিনীকে রণ-কাতারে সাজালেন। ওই মেঘমালা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছিল। দাহিরের বাহিনী ওটা। সংখ্যায় চার হাজার। এরা সবাই অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী। সামনে বিশাল চারটি হাতি। সামনে এক হাতিতে দাহির-পুত্র জয়সা উপবিষ্ট। ওই ফৌজের সালার জয়সা নিজেই। এই বাহিনী আরোড় থেকে দেবলের উদ্দেশে যাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী এগিয়ে আসছে জেনেই রাজা দাহির এদের দেবলে পাঠিয়েছিলেন। পুত্রকেই এর সেনানায়ক করলেন দাহির। ওই বাহিনীও জানতে পেরেছিল দেবল বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে ইতোমধ্যে।

সালার বুদায়েল তার বাহিনীর গতিরোধ করলেন। ফৌজ তিন অংশে ভাগ করে ছড়িয়ে দিলেন। এক্ষণে মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের কিছু কম। প্রথম যুদ্ধে শহীদ ও যখমী হওয়ায় এ সংখ্যার কমতি দেখা দেয়। অগ্র বাহিনীর আধিক্য স্রেফ ঘোড়া, উটে এবং হাতিতে। ওরা সংখ্যায় হাজার চারেক হলেও বিপক্ষের বেশ ক্ষতি সাধন করার শক্তি রাখে ওগুলোর বদৌলতে।

সালার বুদায়েল দুশমনকে সর্বাগ্রে হামলার সুযোগ দিতে চাইলেন। হিন্দুরা প্রচণ্ড গতিতে হামলা চালাল। মুসলমানরা বিভিন্ন দিক দিয়ে হামলার কোশেশ করলেন। কিন্তু দাহির-পুত্র অত্যন্ত নিপুণ হাতে তার বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। বুদায়েল বাহিনীও জানবাজী রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

এ এক তুমুল রক্তক্ষয়ী লড়াই। হাতির হাওদা থেকে অবিরাম ধারায় নেমে আসছিল তীর। শেষ বিকেলে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। বুদায়েল তড়িতবেগে জয়সার হাতি পর্যন্ত পৌঁছুতে কোশেশ করলেন। তিনি তার দেহরক্ষীসহ ওই হাতির কাছে উপনীত হন।

হাতির শুঁড় কাটতে তিনি অগ্রসর হলেন। হাওদা থেকে সোঁ সোঁ রবে বর্শা নেমে আসছিল। একবার তিনি হাতির শুঁড়ের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। পেছন থেকে কোন মুসলমান হাতিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে। আহত হাতি প্রচণ্ড শক্তিতে চিৎকার মারে। সালার তখন একেবারে হাতির নিকটে। হাতির চিৎকারে বুদায়েলের ঘোড়া ভয় পেয়ে যায়। এক সময় সেটা সালারকে মাটিতে আছড়ে ফেলে। শত্রু বাহিনী যেন এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা তাঁকে ঘিরে নিল। ওঠার মওকা দিল না। তাঁকে গ্রেফতার করা হলো।

'ওকে ছেড়ে দাও।' জয়সা চিৎকার দিয়ে বললো, 'জীবিত থাকার কোনই অধিকার নেই ওর।' বুদায়েলকে ছেড়ে দেয়া হলো। তিনি নিজেকে সামলে নিচ্ছিলেন। হাওদা থেকে একটি বর্শা এসে তাঁর কণ্ঠনালীতে গেঁথে গেল। মর্মান্তিকভাবে বুদায়েল শহীদ হলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই চলল। মুসলমানদের তীর ফুরিয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে লড়াই শেষ হলো। কাণ্ডারীহীন নৌকার মত মুসলমানরা লড়ে যাচ্ছিল। পরিণতি যা হবার হলো। মুসলমানরা রণে ভঙ্গ দিল। অন্ধকারের কারণে পলায়নপর বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে পারল না জয়সা। যাদেরকে সম্ভব গ্রেফতার করে হিন্দুদের গোলাম বানানো হলো।

॥ আট ॥

পরাজয়ের এই মর্মান্তিক কাহিনী শুনে শোকে-দুঃখে হাজ্জাজের মাথা নুয়ে এলো। যে বর্শা বুদায়েলের কণ্ঠনালীতে গেঁথেছিল সেটা প্রকারান্তরে হাজ্জাজের সিনায়-ই লেগেছিল। চেহারা উঠালেন তিনি। রক্ত জবার মত তা টকটকে লাল। চোখে আগুনের হল্‌কা।

'বুদায়েল তো বুযদিল ছিল না,' হাজ্জাজ গোসসাসুলভ মেযাজে উচ্চারণ করেন, 'শক্র বাহিনীর একাংশকে পরাভূত করে সে দ্বিতীয় হামলায় পরাভূত কেন হলো?'

'আমীরে ইরাক!' দেবল ফেরত তিন ফৌজি অফিসারের একজন বললেন, 'আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ ইবনে তোহফার বীরত্ব ও শাহাদাত কবুল করুন। তিনি বুযদিল ছিলেন না। তিনি দুশমনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। সালার থেকে হয়েছিলেন সেপাই। তিনি হিন্দু সেনাপতির রক্ষাব্যূহ ভেদ করেছিলেন। সকলকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। হাওদা থেকে আচমকা নিক্ষিপ্ত বর্শার কথা বর্ণনাতীত। খোদার কসম, ইবনে তোহফা ভয়কাতুরে ছিলেন না।'

'তুমি কি তার সাথে ছিলে?' প্রশ্ন হাজ্জাজের।

'হ্যাঁ আমীরে ইরাক। আমি প্রত্যক্ষদর্শী, বর্শা যখন লাগে, তখন তাঁর থেকে সামান্য দূরে ছিলাম।'

'এরপর তুমি পলায়ন করলে? তাঁর সাথে শহীদ হলে না? তুমি আমার শেরদিল সালারকে একাকী ছেড়ে এলে?'

'চাচনামার' বর্ণনা মোতাবেক হাজ্জাজ এ প্রশ্ন করে তলোয়ার বের করলেন এবং ওই অফিসারের মাথা দেহ থেকে এক কোপে আলাদা করে ফেললেন।

'লোকটা কাপুরুষ না হলে সালারের সাথে শহীদ হত।' বলে হাজ্জাজ খাদেমের হাতে তলোয়ার দিয়ে দিলেন।

এই পরাজয়ের কাহিনী দামেশকে বসে খলীফা ওয়ালিদও শুনতে পান। তিনি হাজ্জাজকে দামেশকে ডেকে পাঠালেন।

'আমীরুল মুমিনীন!' হাজ্জাজ পত্র মারফতই ওয়ালিদের হুকুমের জবাব দেন, 'আপনি যদি এই জবাবদিহিতার জন্য আমাকে ডেকে থাকেন যে, আপনার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দ্বিতীয়বার সিন্ধু আক্রমণ কেন করলাম এবং এত জানমাল কেন ক্ষয় হল, তাহলে আমি এই মুহূর্তে দামেশক যাব না। প্রথম হামলার আগে আপনার কাছে ওয়াদা করেছিলাম, যে পরিমাণ জানমালের ক্ষতি হবে, তার চেয়ে দ্বিগুণ বায়তুল মালে জমা দেব। আমার এই শর্ত পূরণ করেই তবে দামেশকে যাব। আমাদের জন্য সিন্ধু আক্রমণ পূর্বাপেক্ষা জরুরী হয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এবার আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে সিন্ধু পাঠাব। আমার আশা, খলীফার আত্মসম্ভ্রমও এতে সাড়া দেবে এবং তিনি আমার পথ আগলাবেন না। আমাকে জাতির সামনে অপদস্থ করবেন না মাননীয় খলীফা।'

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক জানতেন হাজ্জাজ চিজখানি কি। হাজ্জাজ একটি শক্তি। হাজ্জাজের দাপটের সামনে খলীফাও তটস্থ ছিলেন।

ওই সময় আমের ইবনে আবদুল্লাহ নামক এক সালার হাজ্জাজের কাছে এলেন।

'হাজ্জাজ! আপনি আমাকে সিন্ধু প্রেরণ করলে বিগত দু'সালারের প্রতিশোধ নেব। যে জানমালের ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করব।

'তোমার হৃদয়ে সালারীর খায়েশ না থাকলে এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই এবং তোমার জযবার প্রতি দেই সাধুবাদ। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম-ই এই অভিযানে সত্যিকারের সার্থকতা বয়ে আনতে পারবে।'

হাজ্জাজ তার শহীদ সালার বুদায়েলকে খুবই পেয়ার করতেন। তাঁর বীরত্ব ও কৌশলী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। বুদায়েল শহীদ হলে তিনি মসজিদের মুয়াজ্জিনকে ডেকে বলেন, 'আল্লাহ তোমার কণ্ঠস্বর সুন্দর করুন। আজকের আজান শেষে বুদায়েলের নামোচ্চারণ করবে। যাতে কেউ তাকে না ভুলে এবং আমি তার প্রতি ফোঁটা খুনের বদলা নিয়ে তবেই ক্ষান্ত হব।'

॥ নয় ॥

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তখন সিরাজের আমীর। সিরাজেই বাস। ক'দিন আগে হাজ্জাজ এক ফরমানে জানিয়েছিলেন, রায়ের যে যুদ্ধংদেহী কবিলাকে তুমি ওয়াজ করে শান্ত করছ, তারা এতে সুপথে ফিরবে না। তাদের ওপর আক্রমণ কর। এই ধরনের দাম্ভিকতার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে তলোয়ার।

ইবনে কাসিম যখন এই আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই হাজ্জাজের পয়গাম নিয়ে এলেন তাঁরই জনৈক দূত। হাজ্জাজের ফরমান অতি সংক্ষিপ্ত।

'আমার ভাতিজা। এসে গেছে সে সময় যার জন্য তোমাকে প্রতিপালন করেছিলাম। রায়ের যুদ্ধ স্থগিত করে সিরাজেই অপেক্ষা কর। আমি ফৌজ পাঠাচ্ছি। সিন্ধুতে হামলা করতে হবে। আমি সিন্ধু রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে দেখতে চাই। বাদবাকী নির্দেশনা পরে পাবে। সিন্ধুতে উপর্যুপরি আমাদের দ্বিতীয় পরাজয়ের কাহিনী দূতের মুখেই শুনবে।'

হাজ্জাজের কর্মব্যস্ততা এ সময় ছিল সিন্ধুকেন্দ্রিক। ফৌজ প্রস্তুতি, অস্ত্র তৈরী, সেনা মহড়া সবই এ জন্যে।

জুমুআর দিন নামাযের পর বসরাবাসীকে একবার তিনি খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

'হে লোকেরা। এ বাস্তবতার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সময় দ্রুত পরিবর্তনশীল। সময় দোধারী তলোয়ারের মত। এটা কখনও আমাদের পক্ষে থাকে আবার কখনও দুশমনের পক্ষে। এটা আমাদের পক্ষে থাকলে অলস ও বেখবর হয়ে বসে থেকো না। এ সময় সৈন্যবাহিনী গোছাবে। পরে আচমকা ওটা দুশমনের পক্ষে গেলে যেন মসিবত ও বিপর্যয় দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পার। যে কোন অবস্থায় আল্লাহর শোকর কর। আল্লাহর নেয়ামতের স্মৃতিচারণ না হলে তিনি তা কেড়ে নেবেন।

আমি সালার বুদায়েল ইবনে তোহফাকে ভুলতে পারছি না। তার জান্নাতী আত্মা তোমাদেরকে ডাকছে। বলছে, হাজ্জাজ প্রতিশোধ, চরম প্রতিশোধ। আমি সে ডাকে সাড়া দিয়েছি। ইবনে তোহফার খুনের বদলায় ইরাকের গোটা সম্পত্তি বিলিয়ে দেব। আমার প্রতিশোধ বহ্নি সিন্ধু রাজার কর্তিত মস্তক না দেখা পর্যন্ত নিভবে না।

উপস্থিত শ্রোতা! আরবের আব্রু নয়, ইসলামের আব্রু তোমাদের ডাকছে। সিন্ধুর এক নপুংসক রাজা তোমাদের বধূ কন্যাদের আটকে রেখেছে। তারা তোমাদের কাছে ফরিয়াদ করছে। দুশমনকে জানিয়ে দাও, বধূ-মাতারা কাদেরকে ডাকছে। সকলেই 'হাজ্জাজ প্রতিশোধ' বলে চিৎকার দিল।

ষড়যন্ত্র

॥ এক ॥

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দূত সিরাজে পৌঁছুলে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তার হাত থেকে ফরমান নিলেন। তার চেহারা কুঞ্চিত হয়ে গেল। ঝুঁকে পয়গামটি তিনি একপাশে রেখে দিলেন।

'আমার চাচা তো এতো বুড়া হননি।' ইবনে কাসিম বললেন, 'চিন্তা করতে তাঁর দেমাগ এত অসাড় প্রমাণিত হল কি করে? সিন্ধুতে হামলার জন্য আর কোন সালার তিনি খুঁজে পাননি? তিনি কি জানেন না, আমি দাম্ভিক গোত্রগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে যাচ্ছি? সিন্ধুর রাজার কারাগার হতে এখনও কি কয়েদী ছাড়ানো সম্ভব হলো না?'

'আমীরে সিরাজ! আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হোন। দু'দুজন সালার সিন্ধুর মাটিতে বুকের তাজা খুন নযরানা দিয়েছেন ইতোমধ্যে।' দূত বললেন।

'দু'সালার?' ইবনে কাসিমের কণ্ঠে বিস্ময়। 'বলো কারা তারা?'

'প্রথম অভিযানের সিপাহসালার আবদুল্লাহ ইবনে নুবহান। তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। আমাদের বাহিনী পরাস্ত হয় সেবার। অতঃপর যান বুদায়েল ইবনে তোহফা। তিনিও শাহাদত বরণ করেছেন এবং আমাদের বাহিনী এ জন্যই পরাভূত হয়। আবদুল্লাহ-পুত্র আমের তৃতীয় বারের মত সিন্ধু অভিযানে নেতৃত্ব দানের প্রস্তাব পেশ করলে আপনার চাচা বললেন, এবার যাবে আমার মরহুম ভায়ের স্মৃতিবহ ভাতিজা।'

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের চেহারায় আরেক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি কুরসী থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। হাত দুটো একত্রিত করলেন। মাথা নীচু। দূত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

'ইবনে নুবহান ও ইবনে তোহফা পরাভূত হবার মত সেনাপতি নন।' মুহাম্মদ বলেন।

'কসম খোদার। তারা পিছু না হটে দু'জনই আগে বেড়েছিলেন। উভয়েই দুশমনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন।' দূত বললেন।

দূত সিন্ধুর কাহিনীর আগাগোড়া শোনালেন। জানালেন হাজ্জাজের মানসিক হালতও।

'তার হালত এমনই হওয়া দরকার। নাওয়া-খাওয়া আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। বিবির কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়া দরকার। খানিক আরাম করে চাচাজানের কাছে গিয়ে বলো, তোমার ভাতিজা তোমার কৃত ওয়াদা পূরণ করেই ছাড়বে

ইনশাআল্লাহ। কয়েদীদের শৃঙ্খল-মুক্ত সে করবেই। খোদা মুখ তুলে চাইলে সিন্ধুর সর্ববৃহৎ মন্দিরে ইসলামী পতাকা উড়বেই উড়বে।' শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে ইবনে কাসিমের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

দূত বিদায় নেয়ার পর মুহাম্মদ ইবনে কাসিম উপদেষ্টাদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। সকলকে তিনি হাজ্জাজের ফরমান শোনালেন।

'আমীরে মুহতারাম! রায়ের অভিযান স্থগিত করার নির্দেশ হাজ্জাজের ঠিক হলো না। সিন্ধু অভিযানে স্রেফ আপনি যাচ্ছেন। রক্ষীবাহিনী ছাড়া আর কেউ যাচ্ছে না আপাতত। আপনি অনুমতি দিলে আপনার অনুপস্থিতিতে আমরাই ওই অভিযান পরিচালনা করব।' বললেন জনৈক সিপাহসালার।

'আমরা এই অভিযান স্থগিত রাখলে গোষ্ঠীগত দাম্ভিকতা বহুলাংশেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আপনি চলে গেলে পায়ের ওপর পা রেখে আমরা বসে তো থাকতে পারব না।' বললেন আরেক সালার।

'আমি তোমাদের সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি। তবে মনে রেখ, সিন্ধুতে দু'দফা পরাজিত হবার পর হাজ্জাজ তৃতীয়বার পরাজয় শব্দটা শুনতে পছন্দ করবেন না। খুব সম্ভব ক্ষমাও করবেন না। আপনারা সকলেই তাকে চেনেন। এ মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা আমার ভালোভাবেই জানা আছে।' বললেন ইবনে কাসিম।

'এতদসত্ত্বেও বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তার এই অকস্মাৎ স্থগিতাদেশ আমরা মুলতবি করব না।' বললেন এক সালার।

অপর এক সালার বললেন, আল্লাহ হাজ্জাজের ওপর রহম করুন। হাজ্জাজের ওপর অন্য একজন আছেন। আমরা তার সন্তুষ্টি অর্জনেই লড়ব।'

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অবস্থা তখন এমন যেন তিনি সালারবৃন্দের কথা শুনেও শুনছেন না। অন্য খেয়ালে নিমগ্ন তিনি। মাকরান ও সিন্ধুর মানচিত্র সামনে পেতে তিনি উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করতে থাকেন।

॥ দুই ॥

হাজ্জাজের মানসিক অবস্থা কারো পক্ষে আঁচ করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি বিলকুল উন্মাদে রূপ নিয়েছিলেন। এ সেই হাজ্জাজ, যিনি কারো ভুল কথা কিংবা অসৌজন্যমূলক আচরণে তার শিরশ্ছেদ করতে ভুল করতেন না। কখনও মনে হত স্বজাতির রক্ত নিয়ে খেলতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইতিহাস বলছে, সামান্য ভুলেও হাজ্জাজ কাউকে ছেড়ে দিতেন না। দুশমনের খুন তিনি অতটা তার তলোয়ারে মাখাননি, যতটা মাখিয়েছেন স্বজাতির খুন। সেই হাজ্জাজ কি করে এক লিঙ্গপূজক, নপুংসক ও আপন বোনের স্বামী হিন্দু রাজার মুসলিম কয়েদীদের সাথে অমানবিক জুলুম সহ্য করবেন। এর দ্বারা বোঝা যায় নিছক ভুল সিদ্ধান্তদাতাদের প্রতি তিনি জুলুম করেননি; বরং দুশমনের বিরুদ্ধে তিনি বজ্র নিনাদ ছিলেন।

বসরার দিবস-রজনী যেভাবে বাধাহীন নদীর মত কোলাহলমুখর থাকত, সেভাবে হাজ্জাজ ত্বরা করেই তার হুকুম তামিল করতে চাইতেন। শামের ৬ হাজার

ফৌজ তিনি বাগদাদে জমায়েত করেন। এই বাহিনী জঙ্গী মহড়া শুরু করে দেয়। কঠোর মহড়া করতে করতে ফৌজ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়লে হাজ্জাজ বলতেন, ক্লান্তি এলে বেত্রাঘাত-ই তার ঔষধ।

এই মহড়ার দেখভাল খোদ তিনি নিজেই করতে থাকেন। সেপাইরা দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি তাদেরকে একত্রিত করে বলতেন, ইসলাম ও আরবের ইজ্জত-আব্রুর মোহাফেয তো তোমরাই। সিন্ধুর ভূগর্ভস্থ নরককুণ্ডে যে আরব্য বধূ-কন্যা ধুকে ধুকে মৃত্যু প্রহর গুনছে, তারা তো তোমাদেরই কারো বোন, কারো মাতা, কারো কন্যা।

'আজ তৃতীয়বারের মত বলছি আরবের এক তরুণী আমাকে সাহায্য করতে বলেছে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি একাকী কি কয়েদীদের মুক্ত করতে পারব? তোমাদের সম্ভ্রমবোধ কি একথা বলবে যে, আমি তোমাদের বধূ-কন্যাদের ভুলে যাব? না, না, আমি ওদের ভুলব না। প্রয়োজনে আমি হাজ্জাজ একাকীই সিন্ধ যাব।' এ কথাও একদিন হাজ্জাজ উত্তেজনাভরে বলেছিলেন।

'আমরা জান-কবুল লড়াই করতে প্রস্তুত। হিন্দু রাজার দম্ভের সুউচ্চ চূড়া ভাঙ্গতে প্রস্তুত।' এ একটি গর্জন, হুংকার।

হাজ্জাজ প্রতিদিন এমন আগুনঝরা বক্তব্য রাখতেন এর ফলে দিনান্তের ক্লান্তি মুছে সেপাইদের চোখে-মুখে দেখা দিত নব জীবনের প্রেরণা।

এর পাশাপাশি হাজ্জাজ বসরার সৈন্যদের মহড়ার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল ইরাক ও শামের গোটা উট ও ঘোড়া ময়দানে জড়ো হয়েছে। হাজ্জাজ দূরদূরান্তে ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করতেন। সে ঘোষণার সার কথা ছিল, বসরায় নেযাবাজি, হাতিয়ার লড়াই ও নৌকা বাইচ হবে। এই প্রতিযোগিতায় যারা জিতবে তাদেরকে ফৌজে ভর্তি করা হবে। পদও দেয়া হবে। এমন রণাঙ্গনে তাদের পাঠানো হবে, যেখানে অজস্র মালে গনীমত পাওয়ার সম্ভাবনা।

ওই যুগে জাতীয় চেতনা সুদৃঢ় ছিল। মালে গনীমত পাওয়ার আকর্ষণ ছিল। এই ফৌজি মেলা বেশ ক'দিন ধরে চলল। প্রতিদিনই বেড়ে চলছিল এর রওনক। দূর দরাজের অসংখ্য লোক যারা দেরীতে খবর পেয়ে রওয়ানা করেছিল, তারাও এসে পৌঁছুতে লাগল।

বসরার লোকদের মাধ্যমে এসব প্রতিযোগীদের কাছে হাজ্জাজ বলতেন, সিন্ধুর এক রাজা বহু আরব্য নারী-পুরুষকে আটকে রেখেছে। তাদের সামুদ্রিক জাহাজ লুণ্ঠন করা হয়েছে। হাজ্জাজের লোকেরা এদেরকে যুদ্ধে যাবার জন্য উৎসাহ যোগাতেন। এর দ্বারা হাজ্জাজের যে প্রেরণা ছিল তা মানুষের মধ্যেও জাগরিত হত।

বার দুয়েক তিনি নিজেও প্রতিযোগীদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন। এদের উদ্দেশে তিনি ওইসব বাক্যই উচ্চারণ করেন বুদায়েল ইবনে তোহফার মৃত্যুর পর বসরার জামে মসজিদে যেগুলো আউড়িয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, দামশকের ময়দানে প্রতি বছর খলীফা ওয়ালিদ জঙ্গী খেলাধুলার ব্যবস্থা করতেন। দূর-দরাজের লোকেরা তা দেখতে আসত। খলীফা যখন এই আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই মুহূর্তে হাজ্জাজের এই আয়োজন। এ সময় দামেশকে লেগে থাকত উৎসুক জনতার ঠাসা ভীড়। কিন্তু এবার দামেশকে মানুষের টিকিটি নেই।

প্রতিযোগিতার পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দিন। ময়দানে উৎসুক জনতার আগমনে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। চার ঘোড়সওয়ার অপর চারজনকে কুপোকাত করার চেষ্টা করছিল। এটা হাতিয়ারহীন লড়াই। কতকটা মল্লযুদ্ধের মতই। এতে ঘোড়সওয়ারকে কেবল ভূতলে আছড়ে ফেললেই চলবে না, ঘোড়াও কব্জা করতে হবে প্রতিপক্ষকে। এই প্রতিযোগিতায় লোকেরা জীবন বাজি রাখতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

চার সওয়ারের এই প্রতিযোগিতায় দর্শকবৃন্দের মাঝে আনন্দের বান ডেকে যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এদের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে যান। তার উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আরো উদ্দীপনাময় হয়। হাজ্জাজ সকলকে বাহবা দিয়ে চলেন।

হাজ্জাজের পেছনে একটি ঘোড়া প্রতিযোগীর মতই এড়িয়ে আসে। ওই সওয়ার হাজ্জাজের পাশটিতে এসে পৌঁছুয়। হাজ্জাজ প্রতিযোগিতায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে আছেন যে, ঠাহর-ই করতে পারেননি তার পার্শ্বে কোন ঘোড়া আছে।

'বসরার আমীর কি আমাকেও ঘোড়া থেকে আছড়ে ফেলবেন?' একটি কণ্ঠে চমকে ওঠেন হাজ্জাজ। পাশ থেকে এক ঘোড়সওয়ার হাজ্জাজকে ডেকে বললেন এ কথা।

খলীফাকে নিজের পার্শ্বে দেখে হাজ্জাজ এতটুকু চমকালেন না কিংবা পেরেশানও হলেন না। কেননা, তিনি ইতোপূর্বেই জানতে পেরেছেন খলীফা স্বয়ং দামেশক থেকে এসেছেন। খেলাফতের রাজধানী ছিল দামেশক। হাজ্জাজ ঘোড়ার জিন কষে একদিকে হটে গেলেন এবং খলীফাকে যেন তেমন একটা তোয়াক্কা করলেন না এমন ভাব নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ইবনে ইউসুফ আমাকে ঘোড়া থেকে নয়, মসনদ থেকেই আছড়ে ফেলতে চাইছেন। বসরার বিশাল মহড়ার অনুমোদন তো দূরে থাক আমাকে জানানোরও কোশেশ করোনি তুমি। তুমি জানতে না এই মহড়া খেল এ সময় দামেশকেই হওয়ার কথা?' ওয়ালিদ বললেন।

'খলীফাতুল মুসলিমীন!' হাজ্জাজ গম্ভীর স্বরে বলেন, 'আপনার এই মহড়া নিছক ক্রীড়া-কৌতুকসর্বস্ব আর আমার এই মহড়া বাস্তবোচিত অবশ্যম্ভাবী এক যুদ্ধের মহড়া। সিন্ধু অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতি। ফৌজ নির্বাচনের প্রাক নির্বাচনী। আমার যদ্দূর ধারণা, দূতের মুখে আপনি সবই শুনে থাকবেন। সে না জানালে এ মুহূর্তে আমি বসরায় থাকতাম না।

'শুধু কি তাই! তুমি আমাকে সিন্ধুর দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হবার কথাও জানানোর প্রথাটুকু পালন করোনি। এক্ষণে আবার তৃতীয় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছ। কি সেই লজ্জা যা তোমাকে আমার কাছে যেতে বাধ সেধেছে?' প্রশ্ন খলীফার।

'খলীফাতুল মুসলিমীন!' হাজ্জাজ তিরস্কারের সুরে বলেন, 'লজ্জিত হলে আমি কেবল আল্লাহর কাছেই হই। আপনি দুনিয়াতে ঠিক তখনই চোখ খোলেন, যখন আমি জোয়ান। আমি যা জানি আপনি তা জানেন না। আর আমি যা করতে পারি আপনি তা করতে পারেন না। আপনার দৃষ্টি মসনদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আর আমার দৃষ্টি ইসলাম ও আরবের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার প্রতি। জানি, আপনি কি বলতে চান।

আপনি চান, যুদ্ধের পূর্বে আপনার এজাযত চাই। এও জানি, আপনি এজাযত দেবেন না। আপনাকে বলেছিলাম, ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণ দেব। সিন্ধুর জমিন আপনার পায়ে আছড়ে ফেলব।'

'হাজ্জাজ।' খলীফা রেগে যান।

'ইবনে আব্দুল মালিক!' হাজ্জাজ খলীফার কথা কেড়ে বলেন, 'কয়েদীদের রেহাই করতে না পারলে দুশমন একদিন আপনাকেই কয়েদখানায় ঢুকাবে। এই দু'টি পরাজয়ের পরও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে দুশমন পুরো আরব দেশটাই গিলে নিতে চাইবে।'

খলীফা ওয়ালিদ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের এই রুদ্রমূর্তি দেখে হতবাক হয়ে যান। তার বলার মুখ হয়ে যায় মূক। বস্তুত খেলাফত ওই যুগে গদিরক্ষা নির্ভর হয়েছিল। এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য কথা যে, খলীফা সিন্ধু হামলার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আয়েশ-আরামের সাথেই খেলাফত কার্য পরিচালনা করতে চাচ্ছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, হাজ্জাজ বড় নির্দয় প্রকৃতির ছিলেন। তার নাম শুনতেই জালিম মুসলিমদের কলিজা কেঁপে উঠত। পক্ষান্তরে দুশমনের প্রতি তার হুংকারে আযাবে ইলাহী নাযেল হত যেন।

॥ তিন ॥

শামের যে সব সেপাইকে তিনি সিন্ধুতে প্রেরণ করতে চাচ্ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ছ'হাজারের মত। এর অধিকাংশই ঘোড়সওয়ার। সকলেই তারুণ্যের উচ্ছলতায় উদ্দীপ্ত। আধা বয়সের একজনও ছিল না। তাছাড়া বিজয়ী প্রতিযোগীদের থেকে কি পরিমাণ সৈন্য নির্বাচন করেছিলেন তা জানা যায়নি। খুব সম্ভব এদের সংখ্যাও অমন হাজার ছয়েক হবে।

হাজ্জাজ সেপাইদের এমনভাবে সাজালেন যেন এরা সেপাই নয়–শাহী খান্দানের রাজপুত্র। প্রত্যেক সেপাইকে সেলাই সুতা ও সুঁচ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে দেয়া হয়। এমনকি সালাদরূপে ব্যবহৃত সিরকা বহনের জন্য কয়েকশ উট ব্যবহার করা হয়। তুলো সিরকার মাঝে চুবিয়ে দেয়া হয়। কমান্ডারদের বলা হয় প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রতি খানায় ওই তুলো চুবিয়ে নিংড়ে যেন সিরকা বের করা হয়।

সৈন্যদের পকেট খরচা বাবদ হাজ্জাজ ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেন। নির্দেশ দেন, প্রতি সৈন্যকেই প্রয়োজন মত তার হাতে যেন তা থেকে প্রদান করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় হাজ্জাজ তার বাহিনীর প্রতি কি পরিমাণ খেয়াল রাখতেন। সিরকার একশত উটের বোঝা একটি জাহাজেও সংকুলান হয় না। ফৌজ যেহেতু পদাতিক, সেহেতু দু'হাজার দ্রুতগামী উট দেয়া হয়। আরো কয়েক হাজার উট কেবল মাল-সামান নিতে ব্যবহৃত হয়।

সামুদ্রিক জাহাজে যে মাল-সামান দেয়া হয়েছিল তাতে পাথর ছোঁড়ার কামানও ছিল। তন্মধ্যে একটা কামান এত বড় ছিল যে, সেটা উঠাতে পঁচিশ জন লোকের দরকার পড়ত। এর থেকে যে পাথর বর্ষণ করা হত সেই পাথর উঠাতেও ২০/২৫

জন মানুষের প্রয়োজন পড়ত। প্রকাণ্ড কেল্লায় কাঁপন-ফাটল ধরাতে এগুলো কাজে আসত।

এই কামানের নাম 'আরূস'।

এই বাহিনী রওয়ানা করলে বসরার মানুষ রাস্তার দু'পাশে সমবেত হয়ে তাদের বীরোচিত বিদায় জানাল। হাজ্জাজ তার বাহিনীর মধ্যে আগুনের উত্তাপ ঢেলে দিয়েছিলেন। মানুষের উৎসাহ ও দু'আ নিয়ে এ বাহিনী বসরা ছাড়ল। শেষ সেপাইটি অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত হাজ্জাজের হাত উঁচু থাকল।

এ বাহিনী প্রচণ্ড টর্নেডো চালাতে সিন্ধু যাচ্ছিল।

এই বাহিনীর প্রধান ছিল জুহাম জুফী।

॥ চার ॥

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম অধীর আগ্রহে এই বাহিনীর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মাঝে-মধ্যে ব্যস্ত হয়ে বসরা সড়কে ঘোড়া ছুটাতেন। একদিন তার অফিসের দরোজা প্রচণ্ড আওয়াজে খুলে গেল। দেখা গেল এক আগন্তুককে। এরই অপেক্ষায় ছিল ইবনে কাসিম। দিক চক্রবালে মেঘের মত বিশাল বাহিনীর রেখা ফুটে উঠেছে। কসম খোদার। এটা ঝড়ের মেঘ নয়।' আগন্তুক বলল।

'ঘোড়া তৈরী কর।'

টগবগে এক ঘোড়ায় চাপলেন উচ্ছল তারুণ্য। তার দেহরক্ষী বাহিনী পেছনে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম অনেক দূর এগিয়ে যেয়ে বাহিনীকে সম্বর্ধনা জানাল। এক্ষণে তরুণ ইবনে কাসিম-ই এদের সিপাহসালার। ইতোপূর্বের সালার জুহাম জুফী বাহিনীর সাথে ছিলেন। এখন তিনি সিপাহসালারের অধীনে এক সহকারী সালার।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাৎক্ষণিক খবরাখবর নেয়ার জন্য মাকরান পর্যন্ত অল্প দূরত্বে সংবাদ বুথ স্থাপন করেন। এগুলোতে দ্রুতগামী ঘোড়া ও উট ছিল। দেবল থেকে সংবাদ বসরায় পৌঁছুতে মাত্র এক সপ্তাহ লাগত। যেখানে একজন পর্যটককে পৌঁছুতে কমপক্ষে দেড়মাস লেগে যেত।

সালার জুহামের মুখে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে দেয়া হাজ্জাজের ফরমান ছিল এই যে, তিনি হাজ্জাজের হুকুম ছাড়া হামলা করবেন না। দেবল থেকে সিন্ধুর পথে দু'তিনটা কেল্লা ছিল। ওগুলো জয় করেই তাকে দেবলে পৌঁছা দরকার। কিন্তু দেবল থেকে অল্প দূরে হাজ্জাজের নির্দেশের অপেক্ষা করার কথা।

যেদিন বসরার বাহিনী সিরাজ উপনীত হয়, ঠিক এর পরদিন মুহাম্মদ ইবনে কাসিম মাকরানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। মাকরানের অধিকৃত অংশের আমীর ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে হারুন। তাকে আগেভাগেই এ সংবাদ দেয়া হয় যে, বাহিনী আসছে। মুসলিম বাহিনী যেদিন মাকরানে এসে পৌঁছুয়, সেদিন গভর্নর তার দেহরক্ষী বাহিনীসহ সীমান্তে অপেক্ষমাণ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমেরও আশা ছিল, আমীরে মাকরান অবশ্যই ঘোড়ার পিঠে তাদের অপেক্ষায় থাকবেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আমীরের সাথে মোসাফাহা করে অনুভব করলেন তার হাত গরম।

গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। বাইরে তার বের না হবারই কথা এ মুহূর্তে। নিছক বাহিনীর সম্বর্ধনা দিতে তার এই ত্যাগ। ইবনে হারুন সুস্থতার জন্য আর আরামের অবকাশ পাননি এর পর। ইবনে কাসিমের সাথে সাথেই থাকতে হয়েছে তাঁকে।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম স্থলপথে যখন মাকরানের পথে পা রাখেন এর কিছু দিন পরই সামুদ্রিক জাহাজ অস্ত্র, কামান ও রসদ নিয়ে মাকরান উপকূলে নোঙর ফেলে। রসদ নামাতে দিন কয়েক লাগার কথা। কিন্তু অসংখ্য জাহাজ থেকে এই উদ্দেশ্যে রসদ নামানো হলো না যে, এগুলোকে দেবলে নিয়ে যেতে হবে। এই রসদ বিভিন সৈন্য দলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারায়ও ক' সপ্তাহ দরকার ছিল। এই বিশাল বাহিনী, রসদ ও জাহাজ লুকানোর মত বিষয় ছিল না। ইবনে কাসিমও জানতেন, এ কথা ওরা জেনে যাবেই। কেননা আরব্য বিদ্রোহী মুসলমান ওখান থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। ওই এলাকায় বিদ্রোহী মুসলিম ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাস। সুতরাং দাহির আগাম কোন সংবাদ জানবে না–এটা হতেই পারে না। তিনি তার রাজধানী আরোড়-এ (বর্তমান রোহড়ি) ছিলেন। এ ভয় তার সর্বদা ছিল যে, আরব জাতি পরাজয় হজম করার জাত নয়। তারা আবারও আসবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। তিনি চৌকস ছিলেন। তাই দেবল বাহিনীকে পূর্ণ সতর্ক অবস্থায় রেখেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ছিলেন এ এলাকায় একেবারে নতুন। আদৌ জানা ছিল না তার এখানকার পথ-ঘাট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি।

আরব্য উট-ঘোড়া মরু বিয়াবানে চলতে অভ্যস্ত। এতদসত্ত্বেও এ এলাকা সম্পর্কে যুদ্ধের পূর্বেই বিস্তারিত জানা জরুরী। রাতের বেলা মোহাম্মদ ইবনে হারুনের কাছে বসে তরুণ সেনাপতি সিন্ধুর নকশায় নজর বুলাচ্ছিলেন। আমীরে মাকরান তাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। ইবনে কাসিম বললেন, 'আমীরে মাকরান। এই বয়সেই আমি বহু দুশমনকে দেখেছি। রণ অভিজ্ঞতাও কম নয় আমার। কিন্তু এখনও গাদ্দারদের লালন করতে হয়নি আমাকে। অথচ এ এলাকায় দু'একটা নয়, হাজারো গাদ্দারদের বাস।'

'আপনি কি ওই মুসলমান বিদ্রোহীদের কথা বলছেন, যারা রাজা দাহিরের আশ্রয়ে?' প্রশ্ন ইবনে হারুনের।

'আমি কেবল ওদের কথা বলছি না, বরং ওদের সংখ্যা নিয়েও পেরেশান। সকলেই যুদ্ধংদেহী। খুব সম্ভব আমাদের বিরুদ্ধে ওরা রাজা দাহিরের সঙ্গ দেবে। কেননা তার নেমক খেয়েছে ওরা।'

'বিগত দু'দুটি লড়াইতে এমন কোন খবর আমার কাছে আসেনি যাতে ওরা দাহিরের পক্ষ নিয়েছে। এ ব্যাপারে গুপ্তচররাও নিশ্চুপ। তারা স্রেফ এতটুকু জানাতে পেরেছে, দাহির আসন্ন যুদ্ধে তাদের মদদ চাইলে তাদের আলাফী আমীর সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন।'

'খোদা আপনার প্রতি সদয় হোন। আপনার বয়স ও অভিজ্ঞতার প্রতি আস্থা রেখে একথা মেনে নিলাম। তবে এটা মনে রাখবেন ইতোপূর্বে এত বিশাল আরব্য বাহিনী আসেনি। আমি তো ভেবে অবাক, ইরাক ও শামের গভর্ণর হাজ্জাজ তার বিগত দু'সালারের সাথে এত নগণ্য ফৌজ দিয়েছিলেন কেন? এবারের এ বিশাল বাহিনী দেখে দাহিরের গা জ্বালা বাড়বে বৈ কমবে না। সে বাইরের সাহায্য কামনা

করবে। সেই সাহায্যের ফিরিস্তিতে ওই বিদ্রোহী আরবদের অতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবে। যে কোন কিছুর বিনিময়ে তাদেরকে দলে ভেড়াবেই।'

'আমরা কি আলাফীদেরকে দাহিরের দলে যোগদান থেকে বিরত রাখার কোশেশ করতে পারি না? তারা দাহিরের পক্ষে একটি লড়াই করেছেন। এক শক্তিশালী রাজা সিন্ধু আক্রমণ করেছিল। আমাদের এই আরব ভাইয়েরা তার মদদ না করলে সামুদ্রিক জাহাজ লুণ্ঠন ও তাদের যাত্রীদের কয়েদী করার মত শক্তিই থাকত না তার। আচ্ছা, মোহাম্মদ হারেছ আলাফীকে এখানে ডেকে পাঠালে কেমন হয়?'

'ডেকে পাঠানো কি সম্ভব?'

'হয়ত আসবেন না। গোপনে খবর পাঠাতে পারি এবং এমন এক জায়গার কথা বলতে পারি, যেখানে আমরা দু'জন তার সাথে মিলিত হতে পারি। কিংবা আপনিই একা গিয়ে আলাপ করে আসুন।'

'আমি তো সেখানেই যেতে চাই যেখানে তার বাস।'

'না ইবনে কাসিম। বীরত্ব ও পরিপক্ব এবং যোগ্য সালার হতে পারেন আপনি কিন্তু স্বজাতীয় বিদ্রোহীদের মনের খবর জানা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাদেরকে এমন এক স্থানে ডাকতে হবে যা না আমাদের অধীনে, না তাদের অধীনে।'

আমীরে মাকরান এক লোককে ডাকলেন। বললেন, ইবনে হায়ছামা। এ কাজ তুমিই পারবে। বনু উসামার সর্দার হারেস আলাফীকে একটি সংবাদ দিতে হবে। পয়গাম পৌঁছানো কোন মুশকিল ব্যাপার নয়, তাকে কোন স্থানে নিয়ে আসাই যত মুশকিল।

'কি উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠানো আমীরে মাকরান?'

'তাকে বলো, মোহাম্মদ ইবনে হারুন তার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'আরবের ফৌজ এসেছে–এ কথা আমি বলতে পারব কি? আর যদি তিনি আরব বাহিনীর আগমনবার্তা জেনে থেকে কোন প্রশ্ন করেন তারই বা উত্তরে কি বলতে হবে?

'বলো, ফৌজ আসেনি। আসলেও কেন আসছে সেটা তার অজানা নয়। আমরা মিলিত হতে চাই। কেন চাই, তা তিনি বিজ্ঞতা দ্বারা আঁচ করবেন।'

মোহাম্মদ ইবনে হারুন একটি জায়গার কথা বলে দিলেন। ইশার পর যেন সেখানে হারেস আলাফী হাজির হন।

॥ পাঁচ ॥

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মাকরানে অবস্থানের আজ অষ্টম দিন। সামুদ্রিক বেশ কিছু জাহাজ থেকে সামান নামানো হয়েছে। দেবল হামলার সময় যে রসদ ও অস্ত্র লাগবে সে সব জাহাজ ওভাবেই রয়ে গেছে। ইসলামী সমররীতি মোতাবেক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম গোটা এলাকায় গুপ্তচর ছড়িয়ে দেন।

রাজা দাহিরের দরবার।

এ সময় ঘোষক এসে বলল, জনৈক উষ্ট্র সওয়ার জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছে। তাকে ফওরান ডেকে পাঠানো হলো। ভয়ে ভয়ে লোকটা ভেতরে এলো। নিয়মনীতি মোতাবেক মেঝেতে দু হাঁটু নামিয়ে প্রণাম করল। পরে রাজার সামনে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

'কি সংবাদ নিয়ে এসেছ?'

'জল। এক ঢোক জল।' লোকটা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললো।

'মহারাজার জয় হোক।' পানি পান করে লোকটা বললো, ওরা ফৌজ নয়। উট, ঘোড়া ও মানুষের এক সমুদ্র। ফৌজ কত তা গুনে শেষ করতে পারিনি। সমুদ্রের দিগন্তে কেবল জাহাজ আর জাহাজ।'

এই লোক সীমান্তের এক কেল্লা থেকে এসেছিল। সিন্ধু ও মাকরানেই তার সীমান্ত। কোন পর্যটক তাকে বলেছে, মাকরানের মাটি আরব ফৌজে ভরে গেছে। এ সংবাদে সে ছদ্মবেশে উষ্ট্র চালক হয়ে উক্ত এলাকা ঘুরে এসেছে এবং স্বচক্ষে দেখে এসেছে। স্রেফ হতবাক নয়, পেরেশান ও ভীতও সে। ওখান থেকে সে জেনে এসেছে, পদাতিক বাহিনীও কম আসেনি। পথিমধ্যে সে দুটো উট বদল করেছে। ঘটনার ভয়াবহতা অনুমান করে সে এতটাই বিচলিত হয়েছে যে, দাহিরের কাছে যে রিপোর্ট সে দিয়েছে তাতে অতিরঞ্জিত হয়েছে অনেকখানিই।

রাজা দাহির উপদেষ্টাদের নিয়ে জরুরী বৈঠকে বসলেন। ফৌজি অফিসার, সকল মন্ত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের ডেকে পাঠালেন। এতে তার বিজ্ঞ উজীর বুদ্ধমানও ছিলেন। দাহির তাদের বললেন, আরবের আরেকটি বাহিনী এসেছে। এ ব্যাপারে তিনি তার মন্তব্য ছুঁড়লেন এ বলে, আমাদের হাতে আরবের দু'সালার ও দু'টি যুদ্ধে হেরে তারা আমাদের শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। এ জন্য এবার তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি ও রসদ নিয়ে সমবেত হচ্ছে। ওদের দিমাগ বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে। মৃত্যুই বারবার ওদেরকে এখানে ডেকে আনছে। এবার এক বিশাল বাহিনী আমাদের কুপোকাত করতে এসেছে। এবারও আমরা পূর্বের ন্যায় ওদের শায়েস্তা করব। তোমরা সকলে কি বল?'

তার ফৌজি পরামর্শদাতারা যা মন্তব্য করলেন তাতে বুদ্ধিমত্তাসুলভ কোন রায় ছিল না। সকলের কথাই ছিল রাজার অনুরূপ। কেননা রাজার বিরুদ্ধে কথা বললে চাকুরী থেকে জীবন দুটোরই যাবার সম্ভাবনা। শুধু উজীরকে দেখা গেল অন্য চিন্তায় ডুবে থাকতে। সকলের বলার পালা শেষ হলে উজীর বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি চালাতে হয়–অহংকার নয়, মহারাজ। যেখানে তীর চালাতে হয়, সেখানে অহংকার চালিয়ে কোন লাভ নেই। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসও মুসলমানদের কমযোর মনে করতেন। ইয়াজদগরদের অবস্থাও কতকটা এমন ছিল। তারা তাদের ঘোড়ার পদতলে আরব জোয়ানদের পিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এই বিশাল দু'পরাশক্তিকে কুপোকাত করা কি চাট্টিখানি কথা? আর এটা কোন কেচ্ছ-কাহিনীও নয়।'

'হ্যাঁ। এতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলমানরা হিন্দুস্থানের হাতিগুলো হাঁকিয়ে দিয়েছিল। কি নাম যেন ওই জায়গাটার?' প্রশ্ন দাহিরের।

'কাদেসিয়া। এরা তাদেরই সন্তান। আমাদের বাহিনীও এরা হাঁকাতে পারে। এক্ষণে তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে এলে তাদের কমান্ডারও নিশ্চয় বিজ্ঞ সমরবিদ হবেন। হাজ্জাজ নিজেও আসতে পারেন। মহারাজ কি শোনেননি হাজ্জাজ কি পরিমাণ নির্দয়? তার ব্যাপারে আমরা শুনেছি, তাদের খলীফাকে পর্যন্ত সে পরোয়া করে না। নিজস্ব খেয়ালখুশী ও কানুন মত দেশ চালায়।' বললেন উজীর বুদ্ধমান।

'সেই সিপাহসালার এলে অসুবিধাটা কিসে? আমার ফৌজের নেতৃত্ব না হয় সেমতাবস্থায় আমিই দিলাম।' বললেন দাহির।

'সাথে সাথে একথাটাও চিন্তা করবেন মহারাজ! লড়াই স্রেফ ময়দানেই হয় না। স্রেফ তীর-তলোয়ার দিয়েই হয় না। প্রতি যুদ্ধে বিজয় কেবল শক্তিশালী দলেরই হয় না। কমযোরের কিসমতেই পরাজয় লেখা থাকে না। কমযোর চাইলে শক্তিশালীকে ভূতলে আছড়ে ফেলতে পারে।'

'সেটা আবার কেমন?'রাজা দাহির একটু পেরেশান হয়ে জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন, 'আমাদের উজীর যদি আমাদের ময়দানে না নামতে পরামর্শ দেন এবং কোন ধোকার আশ্রয় নিয়ে দুশমনকে পরাস্ত করেন, তাহলে আমাদের শিরার তপ্তখুন এর এজাযত দেবে না। ময়দানে আমরা দুশমনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব। তলোয়ারের ঝিলিক দেখাব। দুদু'বার যাদের বারোটা বাজিয়েছি, এবার বাজাব তেরটা।'

'কিন্তু মহারাজ এখন ব্যাপার যে অন্যটা! হাজ্জাজই যদি এই বাহিনীর সালার হয়ে থাকেন, তাহলে লড়াইয়ের ধরন হবে অন্য রকমের। আমি মহারাজকে মহলের চৌহদ্দীতে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি না। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ফৌজের মুখোমুখি হতেই হবে। কিন্তু দুশমনকে কমযোর করে সামনে আনলে অতি দ্রুত তাদের গর্দান কাটা যাবে। মহারাজ জানতে চাইবেন---সেটা আবার কি করে? কোন কোন কমযোর এমনও থাকে যে শক্তিশালীকে কমযোর আর কমযোরকে শক্তিশালী করে দিতে পারে। যেভাবে রাজা রাজ সিংহাসন থেকে জুদা হয়ে থাকতে পারে না। যেভাবে পুরুষ নারী ছাড়া বসবাস করতে পারে না। যেভাবে রাজার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্ত হচ্ছে তার মুকুট। সেভাবে একজন পুরুষের কাছে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু হচ্ছে সুন্দরী নারী। যারা তাদের তৃষিত মরুপথে নবজীবনের গান শোনাতে পারে।' উজীর থামলেন।

'কথাটা পরিষ্কার করে বলুন। কার্যকরী যুৎসই কথাই এক্ষণে কাম্য।' বললেন দাহির।

'নারী এক ধরনের নেশা। দৌলত ওই নেশাকে আরো শাণিত করে। হুকুমত পেলে ওই নেশা খানিকটা পরিপূর্ণ হয়। আর এই নারীনেশা মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও অনুভূতিকে ভোঁতা করে ফেলে। পাঁচশ আরব দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বসবাস করে আসছে। আমি ওদেরকে গভীর নযরে পর্যবেক্ষণ করেছি। চরিত্রের ভেতরটা কাছ থেকেই উপলব্ধি করেছি। ওদের বর্তমান আরব্য শাসকবর্গের খাসলত জেনেছি। তাদের মাঝে এই ব্যাপারে দুর্বলতাটি পেয়েছি। কাজেই তলোয়ারের পূর্বে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে দৌলত মোহে ও সুন্দরী নারীর বাহুবন্ধনে কাবু করে ফেলুন।'

'তুমি কি হাজ্জাজ ও তার বাহিনী সম্পর্কে বলছ?'

'না! আমি ওই আরবদের সম্পর্কে বলছি, যাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন। মহারাজ নিশ্চয় ভোলেননি, বিগত যুদ্ধ দু'টিতে ওরা আপনার পাশে দাঁড়ায়নি। অথচ ওই গোষ্ঠীর সাথে ওদের দুশমনি। এরা বনু উসামার। আর খলীফা বনী উমাইয়ার। এই গোষ্ঠীগত দুশমনির পরও তারা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছে না। এক্ষণের কাজ খলীফার বিরুদ্ধে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে সর্বোপরি বনি উমাইয়ার বিরুদ্ধে এদের ক্ষেপিয়ে তোলা। যে কোন মূল্যে এই কাজটা এখন করতেই হবে।

'এক্ষণে আমাকে ওই উপায় বলো, যা দ্বারা বিদ্রোহী আরবদের খুন গরম করতে পারি।'

'মহারাজের জয় হোক। একাজের যিম্মা আমার। মহারাজ বাহিনী তৈরী করুন! লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ আপনিই ভালো বোঝেন। তবে এতটুকু বলব, কেল্লা থেকে বেরিয়ে যেন কিছুতেই হামলা না করেন। মুসলমানরা দেবলে আসবে। মহারাজের রাজধানী ওদের কাছে এতটা মূল্যবান নয়। যতটা দেবল। কেননা দেবল সমুদ বন্দর। মাকরান থেকে দেবলের পথে দুটি কেল্লা আছে। মুসলমানরা ও দু'টিতে হামলা করবে। কিন্তু এতে লাভ হবে মহারাজের। ওখানে ওদের বেশ শক্তিক্ষয় হবে। ওখানে বেশ কিছুকাল ওরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। এতে ওদের রসদ ফুরিয়ে যাবে। দেবল পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে অর্ধেক রসদের কমতি পড়বে। ওরা দেবল ঘেরাও করলে মহারাজ রাজধানীতে থাকবেন। এতেই এই লাভ হবে, মুসলমানরা এখানে পৌঁছুতে চাইলে তখন বিলকুল দুর্বল থাকবে। তখন আমরা ওই আরবদের মাধ্যমে হামলা চালাব যারা মাকরানে বসবাস করছে।'

রাজা দাহির বিজ্ঞ উজীরের এই পরামর্শের মর্যাদা দিলেন। তার সালাররাও এতে সায় দিলেন। উজীরের কথা মত তারা বিকল্পপথে দুশমনকে ঘায়েল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। রাজা দাহির জনৈক সালারকে বলেন, দ্রুত মাকরানে অভিজ্ঞ কোন লোককে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর পরিসংখ্যান জানতে। সে এটাও যেন জানে, আরবের সিপাহসালার কে!

॥ ছয় ॥

আমীরে মাকরান ও মুহাম্মদ বিন কাসিম ধারণাও করতে পারেননি যে, হারেস আলাফী তাদের সাথে সাক্ষাত করতে রাযী হবেন। এটা অলৌকিকতা ছাড়া কিছু নয় যে, আলাফী শুধু নির্ধারিত সময়ে বর্ণিত স্থানেই হাজির হলেন না বরং দূতকে যথাযথ সম্মান ও মেহমানদারীও করলেন।

আমীর ও ইবনে কাসিম দেহরক্ষীসহ উপস্থিত হন। আমীরের পরামর্শেই মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজী হন দেহরক্ষী বাহিনী নিতে। আলাফীদের সাথে দুশমনি আছে সুতরাং তাদের ওপর কোন ভরসা নেই। হারেস একাকীই উপস্থিত হলেন। স্থানটা খর্জুর বাগান। জায়গাটা ইবনে হারুনের আগে থেকেই জানা। ওখানে যাবার আগে দেহরক্ষীদের বলেছিলেন, নিকট-দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে। প্রয়োজনে তারা যেন সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে।

চাঁদনী রাত।

মরুতে চাঁদের আলোতে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।

আলাফী ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও আমীরে মাকরান ঘোড়া থেকে নামলেন। আলাফী উভয়ের সাথে করমর্দন করলেন।

'আমরা উভয়ে উভয়কে চিনি।' আমীরে মাকরানের দিকে তাকিয়ে বলেন আলাফী।

'আর আমরা উভয়ে উভয়কে জানি।' ইবনে কাসিমের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন। 'আমি নও জোয়ানকে এই প্রথম দেখলাম। কাসিমের বেটা কি তুমিই? হাজ্জাজের ভাতিজা?'

'জী হাঁ! এবং আগত ফৌজের সিপাহসালার!' ইবনে কাসিম বললেন।

'দু' সালারকে খতম করার পরও যুদ্ধকে ছেলের হাতের মোয়া সাব্যস্ত করলেন হাজ্জাজ? এই বয়সেই কি তুমি এতটা অভিজ্ঞ হয়েছো যে, যেখানে বীর দু'সেনাপতি খাবি খেয়েছে, সেখানে তুমি বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করবে? হাজ্জাজের ভাতিজা ছাড়া তোমার মধ্যে আর কি গুণ আছে বেটা?'

'জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। আমার গুণাগুণ বর্ণনা করতে এখানে আসিনি। হাজ্জাজের ভাতিজা বলেও তিনি আমাকে সালার বানাননি। যে কথা বলার উদ্দেশে এখানে আসা, সেদিকে আমরা যেতে পারি কি?'

'বেশ তাই হোক। কথা শুরুর আগে একটা কথা। তোমরা আমার প্রতি আস্থাশীল নও। নইলে এই দেহরক্ষী কেন! আস্থা তোমাদের প্রতি আমারই না করার কথা। কেননা, তোমাদের খেলাফতের বিদ্রোহী আমি। গ্রেফতারের ভয় থাকার কথা আমার। আমি এসেছি একা আর তোমরা?'

'কসম খোদার! যে অগাধ আস্থা আপনি আমার ওপর রেখেছেন আমি তার মূল্য শোধ করতে পারব না। আমীরে মাকরান নয় আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি আমি। ডেকেছি আপনাকে আরব ও ইসলামের একজন মোহাফেয হিসাবে। আপনাকে হুকুম দেয়ার সাধ্য নেই আমার–গোজারেশ করব যে, মোলাকাতের সুযোগ দিবেন। যে কানুনের আপনারা বিদ্রোহী, সেই কানুনের দোহাই পাড়ব না।'

'জানি, তুমি আমাকে কি উদ্দেশ্যে ডেকেছ। যে কয়েদীদের তোমরা উদ্ধার করতে এসেছ, তাদেরকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিন জোয়ান মারা গেছে ইতোমধ্যে। এদের দু'জন কয়েদখানায় প্রবেশ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিল না। আমার বেশকিছু লোক নিয়ে কয়েদখানার অনতিদূরে অপেক্ষায় ছিলাম। উদ্দেশ্য, ওদের উদ্ধারকার্য সমাধা হলে গোপনে আরবে পাঠিয়ে দেয়া। কয়েদীদের পর্যন্ত যে মহাবীর পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিল, নাম তার বেলাল ইবনে ওসমান।'

হারেস আলাফী বেলালের কাহিনী বলে যান।

'আমি ওই কয়েদীদের উদ্ধার করতে এসেছি। ফিরে যাওয়ার পাত্র নই আমি। এজন্য আপনার মদদ দরকার।'

'উমাইয়া খলীফা কি আলাফীদেরকে তোমার সাথে মিলাতে বলেছেন? কিংবা হাজ্জাজের পরামর্শের ওপর ভর করেই তুমি একাজ করছ? এই চিন্তা আমীরে মাকরানেরও হতে পারে।' বললেন আলাফী।

'না দোস্ত! এটা ইবনে কাসিমের-ই চিন্তার ফসল।' বললেন আমীরে মাকরান।

'আমি সরাসরি সিরাজ থেকে এসেছি। দিমাশ্‌ক যাইনি। যাইনি বসরাও। আমার অধীনস্থ সালারদের আশংকা, উমাইয়া খেলাফতের বিদ্রোহী আরব্য কবিলাগুলো শত্রুতার বশবর্তী হয়ে হিন্দুরাজার পক্ষ নিতে পারে। এ শংকা আমারও। তাই আপনাকে অনুরোধ করব, আমাদের মদদ না করলেও কমপক্ষে দুশমনের সঙ্গ দিবেন না। দিলে সেটা ইসলামী ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। জানি, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে ক্ষোভের পাহাড় জমে আছে।" বললেন ইবনে কাসিম।

'প্রিয় ইবনে কাসিম! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন। বয়সের তুলনায় তোমাকে অধিক বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। আমার ও এখানকার প্রতিটি আরবের অন্তরে অশেষ ক্ষোভ আছে কিন্তু সেটা নিছক উমাইয়াদের বিরুদ্ধে। তুমি উমাইয়া নও–ছাকাফী ইবনে কাসিম! তোমার চাচা আমাদের বহু সর্দারকে কতল করেছেন।

'এটা আমাদের গোষ্ঠীগত বিবাদ-বিসম্বাদের কথা। যা আপনাকে দুশমন বানিয়ে রেখেছে। আমি তাকেই দোস্তিতে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছি।'

'ওকথা বলো না বেটা! খান্দানী দুশমনির কারণে আমি দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব–ভুলেও একথা মনে এনো না। ধর্মের দুশমন ও অস্তিত্বের দুশমনকে আমরা বন্ধু বানাব না কোনদিনও। আমাদের দুশমনি প্রশাসনের সাথে–দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। অসৎ ও অক্ষম প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে তুমি গাদ্দারী বলতে পার না। এবং অযোগ্য, অক্ষম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই হচ্ছে প্রকৃত দেশপ্রেম। আমরা দেশ ও জাতির বিদ্রোহী নই। খেলাফতে বনী উমাইয়ার বিদ্রোহী।' থামলেন হারেস আলাফী।

ঐতিহাসিকবৃন্দ বলেন, হারেস আলাফী ইবনে কাসিমের কথায় খুবই প্রভাবিত হন। আলাফী ওয়াদা করেন যুদ্ধে তিনি দাহিরের সঙ্গ দিবেন না। বরং কৌশলে দাহির বাহিনীকে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল করার চেষ্টা করবেন। তবে এর পন্থা কি তা তিনি বলেননি এবং ইবনে কাসিমও কোথায় কবে প্রথম কিভাবে হামলা করবেন, তাও বলেননি।

'এখানকার ফৌজ লড়াই-এ কতটা পটু? ওরা কি এতটা বীর যে আমাদের দু'দুটো বাহিনী পরাস্ত হলো এবং দু'সেনাপতিকে শহীদ হতে হল?

'ওদের ওপর তোমার ভীতি সঞ্চারিত করতে পারলে দেখবে তাদের বাহাদুরি খতম। এখানকার ফৌজ বাহাদুরও না, তেমন দক্ষও না। তোমাদের সংখ্যা অল্প ছিল তাই প্রথম দুটি যুদ্ধে তাদের বীর বানিয়েছে।

সঠিক সময় ও পন্থা ঠিক না করে দ্রুত হামলাও এর মূলে কতকটা দায়ী। হাজ্জাজ দাহিরের সমরশক্তির সঠিক অবস্থা নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই দূরপাল্লার অভিযানে যুদ্ধকৌশল কিছুটা ভিন্নতর হওয়া দরকার। তোমরা সাথে কি কি এনেছ–শুনেছি। এই বিশাল ঘোড়া, উট, জাহাজ ও রসদের পাশাপাশি অজেয় চেতনা নিয়ে এসে থাকলে পৃথিবীর কোন বাহিনীই তোমাদের সামনে বীর প্রমাণিত হতে পারবে না। যদি তুমি খলীফা ও হাজ্জাজের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধে এসে

থাক, তাহলে দেখবে দাহির বাহিনী অজেয় বীর। আর পরাজয়ও তোমাদের পিছু ছাড়বে না ওই মানসিকতার কারণে।'

হারেস ও ইবনে কাসিমের এই মোলাকাত এক ঐতিহাসিক মহাকল্যাণে রূপ নিয়েছিল। বিদ্রোহী এই আরবগণ যদি দাহিরের সঙ্গ দিতেন, তাহলে হয়ত ইবনে কাসিমের সিন্ধু অভিযান অন্যভাবে লেখা হত। এটা তরুণ সেনাপতির দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার দলিল। আলাফী দাহিরের সাথে যুদ্ধে অংশ নিবেন না বললেও আমীরে মাকরান এতে স্বস্তি লাভ করতে পারলেন না। আলাফীর কৃতওয়াদা পুরা হবে কি-না, তিনি এর ওপর আদৌ দৃঢ় থাকবেন কি না, তাতেই তার সন্দেহ।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তার বাহিনী মার্চ করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এর পরেও প্রস্তুতি এবং নানা অসুবিধায় মাকরানে তার কমবেশী এক মাস কাটাতে হল। সামুদ্রিক জাহাজ দেরীতে নোঙর করাও এর একটি কারণ। এছাড়া জাহাজ থেকে কামান খালাস করতে সময় লাগল, আমীরে মাকরান মোহাম্মদ ইবনে হারুন অসুস্থ ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কামানও প্রস্তুত করা হল। ওগুলোকেও ফৌজের সাথে রওয়ানা করিয়ে দেয়া হলো। সেটা ছিল ৭১২ খ্রীস্টাব্দের কথা। আমীরে মাকরান এই বাহিনীতে শরীক হলে আমীরকে দেখে ইবনে কাসিম বলেনঃ

'আপনি আরাম করুন। আমার জন্য দোয়া করুন এবং আমার বাহিনীর জন্য।

কেন তুমি আমাকে কি যুদ্ধ সাজে প্রস্তুত দেখছ না? আমার মাথার শিরোস্ত্রাণ তোমার নজরে পড়ছে না? দেখছ না আমার কোমরে কি ঝুলছে? তুমি আমার ছেলের বয়সী। তাই একাকী তোমায় ছাড়তে মন চায় না। আমি তোমাদের সাথে যাবার জন্যই এসেছি।'

ইবনে হারূনকে ইবনে কাসিম রুখতে পারলেন না। তিনি তার বাপের বয়সী। বাধ্য হলেন আমীরে মাকরানকে সাথে নিতে।

ইবনে কাসিমের প্রথম টার্গেট দেবল। পথিমধ্যে কুঞ্জপুর শহর। এ শহর আজো আছে। এখন এর নাম পঞ্চগড়। এটি কেল্লা প্রধান একটি শহর। একে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। এ বিশাল কেল্লার পরিধি দেখেই বোঝা যায়, এখানে বেশ ফৌজ আছে। সুতরাং একে কাবু করতেই হবে। ইতিহাস বলছে, গুপ্তচরদেরও এই অভিমত ছিল। এ কেল্লাকে পাশ কাটিয়ে গেলে পরে পেছন থেকে এর ফৌজ ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। তাই এই কেল্লা অবরোধ করা হোল। কেল্লার সামনে গিয়ে প্রধান ফটক খুলে দেয়ার আহ্বান জানানো হলো এবং কেল্লার কর্তৃত্ব সমর্পণ করতে বলা হলো। এ শর্ত মানলে শহুরে লোকজনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হলো। জানমাল হেফাযতের অভয় বাণী শোনানো হলো। পক্ষান্তরে পেশীবলে কিল্লা জয় করা হলে এগুলোর কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। গোটা শহরবাসীকে জিযিয়া দিতে হবে।

এই আহ্বানের জবাবে কেল্লার ওপর থেকে নেমে এলো পশ্‌লা পশ্‌লা তীর। প্রকারান্তরে এটি একটি ঘোষণা যে, পারলে লড়ে কেল্লা জয় করে নাও।'

কেল্লার দরোজা ভাঙার জন্য মুহাম্মদ ইবনে কাসিম লোক পাঠালেন। ওপর থেকে তীর বর্শা বহর ছুটে এলো। অসংখ্য মুসলিম সেনা যখমী ও শহীদ হলো। দেয়ালে ফাটল ধরানের চেষ্টা করা হোল। কিন্তু সামনে যে গেল সে-ই রক্তাক্ত হলো। এখানে কামানের প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু ওটি ব্যবহার এত সহজ নয়। এর বদলে মুহাম্মদ ছোট কামান ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

এই কামানগুলোকে ধ্বংস করার জন্য কেল্লাবাহিনী বীরত্ব ও জীবন বাজি প্রদর্শন করতে গিয়ে কিল্লার তিন/চারটি দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ায় চেপে ওরা কামান চালকদের ওপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। মুসলমানরা এই সুযোগে কেল্লাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। কিন্তু তারা টিকতে না পেরে বের হয়ে এলো তীর খেয়ে। কেল্লার তীরন্দাযরাও কেল্লায়ই ফিরে গেল। দরোজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছে কিন্তু অবরোধের কোন ফল হল না। কেল্লা বাহিনীর শৌর্যবীর্যে এতটুকু ভাঙন লক্ষ্য করা গেল না। মুহাম্মদ ইবনে হারুন অসুস্থতা সত্ত্বেও কেল্লার আশেপাশে ঘোড়া নিয়ে চক্কর দিতেন এবং সেপাইদের নির্দেশনা দিতেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তাকে বারংবার খীমায় চলে যেতে বলতেন, কিন্তু বারবার তার একই জবাব ছিল তুমি আমার পুত্রস্বরূপ। তোমাকে আমি একাকী ছাড়তে পারি না।

একমাস এভাবে অতিবাহিত হলো। কেল্লার রসদে কোন কমতি দেখা গেল না। ওখানে পানি-ই ছিল সবচে' মূল্যবান জিনিস। তারা একযোগে হামলা করে পানি সংগ্রহ করত।

'কাসিম পুত্র! এই কেল্লা এত সহজে কব্জা করা যাবে না। সুড়ঙ্গ করার ইন্তেযাম করো। হৈ হুল্লোড় করে ঢুকে যাও কেল্লার মাঝে।' বললেন মোহাম্মদ ইবনে হারুন।

'আমীরে মাকরান! আমি ইচ্ছে করলে কেল্লা দখল করতে পারি। কিন্তু এতে আমার অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে। হৈহুল্লোড় করলে কিছুই হবে না। তারচে আমরা আরামে বসে থাকি, শহরবাসী এ অবস্থায় শীঘ্রই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কত খোরাকি মজুদ আছে ওদের কাছে। পানি তো শেষ হলো বলে। আমাদের শক্তি এখানেই খরচ করা চলবে না। শহরবাসীরাই দেখবেন এক সময় বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।'

॥ সাত ॥

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এখানে অবরোধ রেখে আরেক মাস অতিবাহিত করলেন। শহরের মধ্যে খাদ্য ও পানির পরিমাণ জানা গেল না। তবে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল যে, পানির মজুদ কমে আসায় তীরবৃষ্টিও কমে এলো।

একদিন ফজরের নামাযের পর মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের পরামর্শের সুফল হতে দেখা গেল। কামান সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হল। তীরন্দাযদের রাখা হোল কামানের সামনে। কেল্লা ফটকে অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করা হোল। যাতে ফটক খুলে একযোগে কেউ বাইরে হামলা করতে না পারে।

সূর্য তখনও উঠেনি। কেল্লার মধ্যে পাথরবৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। কামান থেকে শহরের মধ্যেও বড় বড় পাথর বর্ষণ হতে লাগল, সেই সাথে তীর। কামানের পাথরের জবাবে শহর থেকে সাঁ সাঁ করে হাজারো তীর ছুটে এলো। কামান ব্যর্থ করতে কেল্লার মধ্যে ব্যস্ততা লক্ষ্য করা গেল। কেল্লার তীরন্দাযরা বাইরে এলো। রাতের পরামর্শ মত ফটকের পাহারায় মোতায়েন মুসলিম বাহিনীর অশ্বের পদসঞ্চালন হলো। ভেতরের সওয়ার কেউ বাইরে আসতে পারল না। অবস্থা দর্শনে আবার দরোজা বন্ধ করে দেয়া হলো। মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারল না। তবে এই সফলতা তাদের অর্জন হলো যে, তারা শহরের তীরন্দাযদের বাইরে বেরুতে দিল না। এতে কামানগুলো নির্বিঘ্নে পাথর বর্ষণ করতে পারল।

ঐতিহাসিকগণ লিখছেন, শহরে এমনিতেই পানির চালান কমে আসছিল। এর ওপর পাথর আরও বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল। এক্ষণে সুযোগ বুঝে শিলাবৃষ্টির মত পাথর বর্ষণ চলল। ফৌজরা বাধ্য হয়ে কেল্লার বুরুজে সাদা নিশান ওড়াল এবং শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দিল।

ইবনে কাসিম বাহিনীসহ কেল্লায় প্রবেশ করেন। কেল্লা প্রধানকে বলা হলো যে, পূর্বশর্ত মোতাবেক অধিবাসীদের উপর যে জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে, তা শহরবাসী থেকে উসুল করে বিজয়ী ফৌজকে দিতে হবে। কেল্লার কমান্ডার থেকে সাধারণ ফৌজকেও যুদ্ধবন্দী করা হলো। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এখানে অধিক কাল অবস্থান করতে পারছিলেন না। কেল্লা দেখাশুনার জন্য কিছু সৈন্য ওখানে রেখে তিনি অগ্রসর হলেন।

পরবর্তী শহর আরমান বেলা। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম অগ্রবর্তী একটি সেনাদল সামনে রাখলেন। তিনি কুঞ্জপুর কেল্লার বন্দী কিছু ফৌজকে অনেক আগে-ভাগেই সামনে যেতে বললেন এবং সেখানকার লোকদের বলতে বললেন, 'কিছুতেই তোমরা কেল্লা বাঁচাতে পারবে না। বাঁচানোর কোশেশ করলে তোমাদের জানমালের বিপুল ক্ষতি হবে।'

এসব লোক আরমান বেলা চলে গেল। এর সুফল হল। তারা ওই এলাকায় ভীতির সৃষ্টি করল প্রথমত এই বলে যে, মুসলমান শক্তিধর এক জাতি। দ্বিতীয়ত তারা বললো, এরা কি জিন, না অসুর সাক্ষাতেই টের পাবে। গোটা শহর পাথর নিক্ষেপ করে শেষ করে দিতে পারে। একদিকে তারা যেমন দুর্ধর্ষ, বীর ও দিগ্বিজয়ী, অপরদিকে তেমনি সংবেদনশীল ও নম্র মেজাজের। এ কথাটা তারা নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলল। তারা লুটতরাজ করে না। যৎসামান্য কর আদায় করে মাত্র।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আরমান বেলা কেল্লা ও শহর অবরোধ করলে ওখানেও বাধার সম্মুখীন হলেন। তবে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই জানা গেল, এটা চুপসে যাওয়া বেলুনের ফুলে-ফেঁপে ওঠার নামান্তর। মোট কথা, বিনা রক্তপাতেই এ শহর ও কেল্লা মুসলিম বাহিনীর করতলগত হলো।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তার একজন সৈন্যও খরচ করতে চাচ্ছিলেন না এই ছোটখাটো বাধার সম্মুখে। সামনের প্রচন্ড বাধার সম্মুখেই যে ওদের দরকার বেশী।

এসব এলাকা অতিক্রম করতে অনেক সময় বেশী লেগে যাওয়ার কারণ হলো আমীরে মাকরানের আশংকাজনক অসুখ। ফৌজি ডাক্তার তার সেবা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পুরোদমে, কিন্তু অসুখ থামল না। শেষ পর্যন্ত খোদার সৈনিক খোদার পথেই প্রাণত্যাগ করলেন। আরমান বেলায়ই তাঁকে সমাহিত করা হোল।

॥ আট ॥

আজকের হায়দারাবাদকে ওই যুগে নিরূন বলা হত। নবুওয়াত ও হিজরতের মাঝামাঝিতে এর গোড়াপত্তন। তখন এর নাম রাখা হয় নিরূন। মোগলরা এই প্রদেশ দখল করে হায়দারাবাদ নাম দেন। মোগলরা এই শহরটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলে।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কুঞ্জপুর দখল করলে জনৈক সাধু এই শহরে আগমন করেন। তার চুল ছিল পিঠ পর্যন্ত লম্বা। ধূলি ধূসরিত চেহারা। লম্বা গেরুয়া পোশাকে দেহ আবৃত তার। হাতে প্রকান্ড গেঁটে লাঠি। পেছনে ওই আকৃতির কিছু চেলা। তারা শহরে হেঁকে হেঁকে বলছিল, হে শহরবাসী! কৃত অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নাও। মুসিবত ধেয়ে আসছে।'

মানুষেরা তাকে একথা বলতে বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু সে কারো বাধা মানছিল না। সে দুহাত উঁচিয়ে কিছুনা কিছু বলত। 'শহর খালী করে দাও। পালাও পালাও! আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হবে।'

তার বলার ভঙ্গি এমন ছিল যে কেউই তা বিশ্বাস না করে পারতনা। শিষ্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, সাধু মহারাজ কোত্থেকে এসেছেন? এসব কি বলছেন তিনি? শিষ্যরা বলতে লাগলেন, সাধু মহারাজ তিন/চার মাস খামোশ ছিলেন। আঁধার রাতে বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেন। তারপর বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার দিতেন, আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হতে যাচ্ছে।'

নিরূন দাহিরের-ই প্রদেশ। দাহির ছিলেন কট্টর ব্রাহ্মণ। নিরূনের প্রশাসক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, নাম সুন্দর। রাজা দাহির অধিকাংশ বৌদ্ধ বিহারগুলোয় তালা ঝুলিয়ে দিলেও বৌদ্ধরা যেখানে বসবাস করতেন, সেখানে তারা ধর্মীয় আচার-অর্চনা চালিয়েই যেতেন।

এই সাধুর আওয়াজ একদিনেই গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি নিরূনের গভর্নরের কাছেও এ খবর পৌঁছে যায়। তিনি সাধুকে অবিলম্বে দরবারে উপস্থিত করতে বলেন। সুন্দরকে বলা হল, গোটা শহর ভয়ের নগরীতে পরিণত হয়েছে। হিন্দুধর্ম যেহেতু কাল্পনিক কিছু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনাসর্বস্ব, এজন্য তারা সাধু-সজ্জনদের কথাকে সত্য জ্ঞান করত। আজো হিন্দুদের এই ধর্ম বিশ্বাস অব্যাহত আছে।

গভর্ণরের নির্দেশে সাধুকে দরবারে উপস্থিত করা হল। তিনি সাধু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন কি গুজব ছড়াচ্ছেন আপনি?

'এই প্রতিধ্বনি আমার নয়। আসমানের প্রতিধ্বনি। আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হবে। সমুদ্রের তীর থেকে এক রাজা আসছেন। কেউ তার সামনে টিকতে পারবেন না। যে বসতির লোক তার বিরোধিতা করবে, তাদের ওপর আসমান থেকে আসবে অবিরাম ধারার পাথর।'

'আপনি কি আরব বাহিনীর কথা বলছেন? যে ফৌজ কুঞ্জপুর জয় করেছে।'

'আমরা কুঞ্জপুর যাইনি। আমরা দুনিয়াত্যাগী। জংগলে থাকি। ওখানে বসে আসমানী আওয়াজ পেয়েছি।'

'সাধু মহারাজ! দয়া করে বলুন! আমার শহরের প্রতি আপনার এত দরদ কেন? আপনি কি অন্য কোন শহরে গেছেন ইতোপূর্বে? মানুষের মনে এই বিভীষিকা সৃষ্টি করেছেন কি?

'সকলেই পাগল। ওদের রাজা ওদের পাগল বানিয়েছে। এ শহরে এজন্য এসেছি, এখানকার গভর্ণর হিন্দু নয়–বৌদ্ধ। আমরা জানি বৌদ্ধরা শান্তিকামী। তুমি শান্তি চাইলে পাথর বর্ষণকারীর কাছে ক্ষমা চাও। আমাদের কথায় বিশ্বাস না করলে নিজে ধ্বংস হবে এবং জাতির ধ্বংস ডেকে আনবে। তোমার বধূ-মাতা অন্যের কব্জায় চলে যাবে। এ শহরে কোন যুবতী মেয়ে থাকবে না। লুট তরাজ হবে। খুন বইবে। আগুন জ্বলবে। ভালো হয় এদেরকে বাঁচালে। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি হল, 'অহিংসাই পরম ধর্ম'। তাদের ধর্মে সব ধরনের রক্তপাত নিষিদ্ধ।

রাজা দাহির যেমন কট্টর হিন্দু, নিরূনের গভর্ণরও তেমন কট্টর বৌদ্ধ। রাজা দাহিরের প্রতি তার ক্ষোভ ছিল যে, তিনি বৌদ্ধধর্মকে ক্রমাগত নির্মূল করে চলেছেন এবং বৌদ্ধ জাতির ওপর অকথ্য নির্যাতন করছেন। এই ক্ষোভের পাশাপাশি সাধুর প্রতিধ্বনি তাকে ভাবিয়ে তুলল। এই সময় জনা চারেক জীর্ণশীর্ণ ঘোড় সওয়ার শহরে প্রবেশ করল। এরা কুঞ্জপুর থেকে পলায়ন করে এসেছে। তারা মুসলিম বাহিনীর কাহিনী এমন ভয়ানকভাবে বর্ণনা করলো যে, সকলের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তারা বলল, মুসলমান টর্নেডোর বেগে এগিয়ে আসছে। তারা বসতি ও লোকালয়ে প্রকান্ড পাথর বর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়।

তাদের একথা দ্রুতগতিতে লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। নিরূনের গভর্ণরও শুনলেন। নিরূনে ইতোমধ্যে রাজা দাহিরের ফরমান পৌঁছে গেল। তিনি বলেন, মুসলিম বাহিনী মাকরানে উপনীত হয়েছে। এবারকার ফৌজ আর আগের ফৌজের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এ ফৌজ প্রচন্ড শক্তিধর। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কুঞ্জপুর জয় করলে দাহির এ খবর সকল কেল্লায় ছড়িয়ে দেন। এও বলেন, ওরা কেল্লার মধ্যে বড় বড় পাথর নিক্ষেপণী কামান নিয়ে এসেছে। তবে তিনি জানান, এসবে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কিন্তু নিরূনের গভর্ণরের জন্য এ পাথর এক ভয়াল সংবাদ। তা ছাড়া তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, ওই শহরবাসীর প্রতি তাকালে তার মনে হত, শহরের অগণিত নিরীহ জনগণকে হত্যা করা কতবড় পাপ।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আরমান বেলার ফৌজকে দেবলে হামলার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তার পরবর্তী টার্গেট দেবল। তিনি জানতেন, হার-জিতের

চূড়ান্ত ফায়সালা হবে দেবল-এ। তাই সৈন্যদের কয়েক দিন বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকে তিনি কেল্লাভাঙ্গার প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন পুরোপুরি। তিনি ট্রেনিং-এর ফাঁকে আরো বলতেন, এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য দেবল দখল নয়।

একদিন সৈন্যদের সাথে আলাপকালে খবর এল, দু'হিন্দু আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি উভয়কেই ডেকে পাঠালেন। দু'জন আগন্তুকই সিন্ধি পোশাক পরিহিত। মাথায় টিকি। দেখতে ব্রাহ্মণের মত। কিন্তু ইবনে কাসিমের কাছে এসে তারা আসসালামু আলাইকুম বললেন।

'তোমরা দু'জনে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বুঝি ইসলামী অভিবাদন করেছ? তোমরা তোমাদের মনের অভিব্যক্তি যদি এভাবে প্রকাশ করতে, তাহলে তোমাদের হৃদয় শান্তি পেত। তোমরা এর অর্থ জানো কি?' প্রশ্ন সেনাপতির।

'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থ বোধহয় এটাই।' তাদের একজন বললেন।

'কে বলেছে এই অর্থ ?'

'এটা আমাদের ধর্মীয় অভিবাদন। আমরা উভয়েই মুসলমান। হারেস আলাফী আমাদের প্রেরণ করেছেন।'

'তিনি কোন সংবাদ পাঠিয়েছেন কি?'

'হ্যাঁ, সালারে আলা। দেবলের সামনে একটি শহর আছে। নাম নিরূন। ওখানকার গভর্ণর বৌদ্ধ ধর্মের লোক। রাজা দাহিরের নির্ধারিত গভর্ণর তিনি। কিন্তু রাজার সাথে পরামর্শ না করে তিনি বীরোচিত এক ফায়সালা করে ফেলেছেন। অতি গোপনে তিনি দু'লোককে বসরা প্রেরণ করেছেন। ওই প্রতিনিধিদ্বয় আপনার চাচার সাথে পরামর্শ করে ফিরেছেন। নিরূন গভর্ণরের পক্ষ থেকে তার কাছে পয়গাম ছিল এমন, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বে না। এর বিনিময়ে তিনি শান্তি নিরাপত্তার ওয়াদা করবেন এবং তাদের ওপর যে জিযিয়া কর ধার্য করা হয় সানন্দে তা গ্রহণ করবেন। হাজ্জাজ এই পয়গাম কবুল করেছেন। কিন্তু কি পরিমাণ জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে, তা বলতে পারব না। হাজ্জাজ তার পয়গামে গভর্ণর, তার পরিবার, দেশ ও জাতির ইজ্জত আব্রু হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। বলেছেন, মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে তারা বন্ধুসুলভ আচরণই পাবেন।'

'এটা মোজেযা বৈ তো নয়। আমাদের বিশ্বাস হয় না, রাজার গভর্ণর বিনা বাধায় এমনিতেই শহর হাওয়ালা করে দিবেন। কথাটা আমার কাছে কেমন যেন খটকা লাগছে। হারেস আলাফীর অন্তরে আর কিছু নেই তো?'

'না সালারে আলা! একে আপনি মোজেযা ঠাওরাবেন না। এটা আমাদের দু'জনেরই কর্মকাণ্ডের ফসল। সাধু সেজে আমি নিরূন গিয়েছিলাম। বেশ কিছু লোক শিষ্যবেশে আমার সাথে ছিল। আমরা সমূহ বিপদের হুশিয়ারী দেই তাদের। ওরা এতে প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবে গভর্ণর আমাকে ডেকে পর্যন্ত পাঠান। তাকেও আমি ভয় দেখাই। যদিও এর দরকার ছিল না। কেননা তিনি বুদ্ধিস্ট। ওরা লড়াই চায় না। হাতিয়ারে হাত লাগানোকে পর্যন্ত ওরা পাপজ্ঞান করে।'

'এই কাজ তোমরা অন্যান্য শহরেও করতে পার কি?' ইবনে কাসিম প্রশ্ন করেন।

'না, সালারে আলা! অন্যসব শহরের গভর্ণর হিন্দু। কোন না কোন শহরে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। তবে আমাদের সর্দার বলেছেন, শুধু এর ওপরই ভরসা স্থাপন করা ঠিক হবে না। এমন যেন না হয়, আপনারা লড়াই করার হিম্মত খুইয়ে বসেন।'

'দেবল আমার পরবর্তী মঞ্জিল। ওখানকার খবর কি? ফৌজ কত? প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন হবে। কে দেবে আমাকে এসব প্রশ্নের জবাব? তোমরা লড়াকু। তোমরাই বলতে পারবে, কি পন্থা অবলম্বন করলে আমরা জয়লাভ করতে পারব।'

'এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমরা দিতে চেষ্টা করব। জানিনা দাহির দেবলে আসবেন কি-না। দু'টি কেল্লা হাতছাড়া হওয়ায় তিনি অপরিচিত কাউকে শহরে প্রবেশানুমতি দিচ্ছেন না। অপরিচিত কাউকে দেখলেই দাহির কারারুদ্ধ করছেন।'

'দাহির কোথায়?'

'রাজধানী আরোড়-এ। দেবল তিনি আসবেন কি-না বলতে পারব না। তবে তার বাহিনীকে কেল্লা থেকে না বেরিয়ে কেল্লার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন'–বললেন অপর আলাফী।

বয়োঃবৃদ্ধ আলাফী বললেন, 'আমরা আপনাকে জানাব সালারে আলা। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে এ যুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আমার যদ্দুর বিশ্বাস রাজা দাহির আরোড়ে-ই থাকবেন। আপনার ফৌজে সৈন্যের কমতি দেখলেই তবে তিনি আসবেন। এই পরিস্থিতির শিকার যাতে না হন সেদিকে খেয়াল রাখবেন।'

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। দোয়া করে তাদের বিদায় জানালেন। তিনি নিশ্চিত হলেন আরব্য বিদ্রোহীরা তার পক্ষেই আছে। তাদের থেকে কোন ভয় লেশ নেই।

॥ নয় ॥

সিন্ধু থেকে বসরা পর্যন্ত সামান্য ব্যবধান রেখে হাজ্জাজ সংবাদ নেটওয়াক স্থাপন করেছিলেন। ওই নেটওয়ার্কে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে সিন্ধুর খবর বসরায় পৌঁছে যেত।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তার সফলতার কথা বিস্তারিতভাবে হাজ্জাজকে জানাতে থাকেন। একদিন বসরা থেকে হাজ্জাজের পয়গাম এলো। তাতে প্রথমেই নির্দেশ ছিল, দেবল থেকে সামনে নিরূন নামে একটি শহর আছে। ওখানকার লোকেরা আমাদের কাছে নিরাপত্তা কামনা করেছে। হাজ্জাজ যে ফরমান লিখেন, ঐতিহাসিকগণ সেটাকে উদ্ধৃতি করেছেন এভাবে ঃ

'সিন্ধু সীমান্তে প্রবেশ করেই তুমি তোমার ছাউনির নিরাপত্তা মজবুত করো।

দেবলের যত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই নিরাপত্তার দিকটা কড়াকড়ি করেই যাবে। যেখানে বাহিনীর অবস্থান থাকবে সেখানেই পরিখা খনন করবে। রাতে সজাগ ও হুশিয়ার থেকো। অধিক সময় বিনিন্দ্র কাটিও। ঘুমাবে কম। ফৌজে যারা কুরআন তেলওয়াত করতে জানে তারা কুরআন তেলাওয়াত করতেই থাকবে। যারা তেলাওয়াত জানে না তারা দোয়া-দরূদে লিপ্ত থাকবে। তোমার মুজাহিদবৃন্দের যবান যেন যিকরুল্লাহ-এ তরতাজা থাকে। আল্লাহর কাছে সফলতা কামনা করবে। নম্রতা ও আত্মদানে আল্লাহর ভরসা করো। কখনও বা লা হাওলা পড়। মদদ চাইলে আল্লাহর কাছেই চেও।'

'দেবলের নিকটে গিয়ে থেমে যাও। ছাউনীর আশেপাশে ১২ গজ দীর্ঘ, ছ'গজ প্রস্থ পরিখা খনন কর। দুশমন তোমাদের উসকে দিতেই হামলা করো না। দুশমন গাল দিবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে, গা-জ্বালা ধরা কথা বলবে। এগুলো হজম করো। আমার হুকুম ব্যতীত হামলা করো না। আমার প্রতিটি হরফ সর্বান্তকরণে পালন কর। বিজয় ইনশাল্লাহ তোমাদের পদচুম্বন করবেই।'

॥ দশ ॥

দেবলের আশপাশে সিন্ধি লেবাছে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তার গুপ্তচর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। এদের সকলেই এসে খবর দিত, শহরের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ এবং শহরের বাইরে কোন ফৌজকেই মহড়া করতে দেখা যায়নি। এর দ্বারা বোঝা গেল দাহির মুখোমুখি লড়াই করতে রাজী নয়।

ওই সময় বিদ্রোহী আরব বস্তিতে এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে যায়। মাকরান ও সিন্ধু সীমান্তে এদের বাস। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বিজিত এলাকায় যে চৌকি কায়েম করেছিলেন, তন্মধ্যে একটা বস্তি ওখান থেকে কাছে। প্রতিটি চৌকিতেই চার ঘোড় কিংবা উষ্ট্র সওয়ার টহল দিয়ে বেড়াত।

আরবগণ শস্য শ্যামল এলাকায় বাস করতেন। এখানে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত। সামনে ধু-ধু প্রান্তর। আরব্য ঘরানার নারীরা ওখানে ঘুরতে যেতেন। কিন্তু এ স্থান বসতির এত কাছে নয় বলে নির্জন ছিল।

একবার ওই বসতির তিনজন বিবাহিতা যুবতী নারী ওই স্থানে বেড়াতে গেলো। খানিকপর দু'নারী চিৎকার দিতে দিতে দৌড়ে এলো। তৃতীয়জন ওদের সাথে ছিল না। বসতির সকল লোক একযোগে বেরিয়ে এলো। ওই দু'নারী জানালো, তারা ঝর্ণার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। আরব্য চৌকির টহলদার ফৌজ তাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা দু'জন কোনক্রমে পালাতে সক্ষম হলো। কিন্তু তারা তৃতীয় জনকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল।'

একথা শোনামাত্রই ওই তিন যুবতীর স্বামী তলোয়ার নিয়ে ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেল। তৃতীয় যুবতী এ সময় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এগিয়ে এল। তার কাপড় ছেঁড়া ফাঁড়া। চুল উষ্কখুষ্ক। সে বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ছিল, তার স্বামী এসে দৌড়ে

তাকে জাপটে ধরলো। সে স্বামীর বুকে এলিয়ে পড়ল। তাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকল না, কি ব্যবহার করা হয়েছে তার সাথে। সে বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

এ ঘটনায় ওখানকার সমস্ত আরব্য লোক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তার বাহিনীকে হত্যার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করল। তাদের কেউ বললো, 'এ সেই বাহিনী-যাদেরকে হারেস আলাফী মদদ করতে চাচ্ছেন।'

'কমস খোদার! আরব জাতি তো এমন নয়!' অন্য একজন বললেন।

'কেন হবে না, ওরা যে বনি উমাইয়া।'–তৃতীয়জন বললেন।

'এখনি ওই চৌকিতে চল। কাউকে জিন্দা ছাড়ব না।' চতুর্থজনের উক্তি।

'চল! চল এখনি। ওরা সংখ্যায় কতজন আর হবে। দশ কি বারজন। সবগুলোকে শেষ করে দিয়ে আসি।'

এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি সকলের বুকে, এরা সবাই আরব। এ মহা অপরাধ তারা কি করে হজম করবে। তারা সবাই হত্যাকাণ্ডের পরামর্শ করছিল। কেউ কেউ এসময় এমনও মন্তব্য করল, চলো সকলকে প্রস্তরাঘাতে শেষ করি। কেউ বললো, ঘোড়া পেছনে বেঁধে পাহাড়ী অঞ্চলে ঘোরাই।

তারা যখন চৌকির দিকে রওয়ানা দিতে যাবে সেই মুহূর্তে আলাফী ঘোড়ায় চেপে উপস্থিত হন। তার সাথে বয়োঃবৃদ্ধ তিন/চারজন চৌকির আরবসেনা। আলাফীকে দেখে সকলে ওই কথা তুলে ধরল। সর্দার তাদেরকে খামোশ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন।

স্বামীদের মধ্যেই কেউ বললো, 'আপনি আমাদের সর্দার। আপনার হুকুম শিরোধার্য। আজ এক্ষণে এই হুকুম চাই যে, চৌকির সকলকে কতল করে দেয়া হোক।'

'আপনি বলেছিলেন, আরব বাহিনী সে তো আমাদের বাহিনী। আমরা ওদের সেনাপতিকেও ছাড়ব না।' অপর স্বামী বললো।

'খামোশ কেন হে সর্দার আলাফী! লজ্জিত হয়েছ বুঝি! কিছু একটা বলো!'

'ওই চার লোকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে ওদের সালারের সাথে আমাকে কথা বলার ফুরসৎটুকু দাও।' বললেন সর্দার।

'কোন সালারের কথা বলছ? জানো না, সে হাজ্জাজের ভাতিজা! বুঝ না, কোন অপরাধে হাজ্জাজ আমাদের দেশান্তরিত করেছে? বনি উমাইয়ার নেমকখোর হাজ্জাজ আমাদের অস্তিত্বের দুশমন, তারই পালিত ভাতিজার কাছে তুমি কিইবা আশা করতে পার। সে অবশ্যই বলবে, এটা মিথ্যা অপবাদ মাত্র।' আধবুড়ো এক লোক বলেন।

'একথা ভুলে যেও না, আমরা আরব। আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথা আছে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সাথে আমি কিছু ওয়াদাও করেছি। কিছু ওয়াদা সে আমার সাথেও করেছিল।' আচমকা আলাফীর আওয়াজ উচ্চ হলো। তিনি তলোয়ার বের করে বললেন, 'হাজ্জাজের ভাতিজা যদি এ কথা বলে যে, তুমি মিথ্যা বলছ এবং তোমাদের বধূদের সাথে আমার ফৌজ কিছুই করেনি তাহলে এ তলোয়ারে তাঁর দেহের রক্ত দেখবে। জানি, তার দেহরক্ষীরা বর্শা মেরে আমার দেহ ঝাঝরা

করে ফেলবে। আমায় তার কাছে যেতে দাও। সে যদি তার বাহিনীর পক্ষ সমর্থন করে তাহলে জীবনের মায়া ত্যাগ করে তার মাথা কেটে নেব। তোমাদের সামনে ওয়াদা করছি, যা বললাম তার একহরফও মিথ্যা হতে দেব না।'

লোকেরা চটে ছিল। নিজকে সংবরণ করতে পারছিল না এদের কেউই। এতদসত্ত্বেও এই আরবদের মধ্যে এতটুকু শৃঙ্খলা ছিল যে, তারা সর্দারের কথা মেনে নিল। ওই যুবতীকে ঘোড়ায় চাপাল। রাত তখন গভীর।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান বেলা ছিলেন। যা ওখান থেকে অনেক দূরে।

হারেস আলাফী গভীর রাতে দু'লোক সহকারে বেরোলেন।

আলাফী ও তার সাথীরা মসজিদ থেকে ফজরের আযান শুনতে পেলেন। তারা দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে মসজিদে নামায আদায়ের সংকল্প করলেন। এটা আরমান বেলার আযান। তারা কেল্লার দরোজায় গিয়ে দেখলেন দরোজা বন্ধ। তাদের জন্য দরোজা এত তাড়াতাড়ি খুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, যখনই হারেস আলাফী আসবেন তখনই দরোজা খুলে দিবে। তারা সময়মত ঢুকলেন এবং নামাযে শরীক হলেন। আলাফী নামাযের কাতার চিরে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পর্যন্ত পৌঁছুলেন। তরুণ সেনাপতি তাকে এই প্রত্যুষে দেখে হতবাক হয়ে যান।

'আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হোন। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর খবর নিয়ে এসেছেন।' সেনাপতি বললেন।

'হ্যাঁ, ইবনে কাসিম! মারাত্মক খবর! বেদনাদায়ক অপ্রত্যাশিত সংবাদ।' আলাফী বললেন। তার বর্ণনা ভঙ্গিতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ঘাবড়ে যান। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। আলাফী ও তার সঙ্গীদের কামরায় নিয়ে গেলেন। কেল্লাটি বড় এবং ছিমছাম।

'ইবনে কাসিম! আলাফীদের সাথে সাচ্চা দিলে দোস্তি করার ইচ্ছে করলে আজ তার প্রাপ্য মেটাও।' সর্দার আলাফী বললেন।

'অবশ্যই। যদি কোন প্রতিদান চান তো বলে ফেলুন। যা বলবেন তাই পাবেন।'

এ প্রস্তাবে হারেস নারীঘটিত পুরো কাহিনী শুনিয়ে যান। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ঘটনা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

প্রিয় বেটা! আমার ওয়াদার ওপর আমি ও আমার লোক এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সেমতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এক্ষণে তুমি বা তোমার কোন লোক বস্তিতে গেলে দেখবে তোমাদের দেহগুলো বর্শায় ঝাঝরা হয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে কোনক্রমে ঠাণ্ডা করে এসেছি। ওদের প্রত্যাশার চেয়ে দেরী করলে হয়ত সকলকে পথিমধ্যে তোমাদের দিকে আগুয়ান দেখতে পাব। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকেই কতল করে বসবে।

'হ্যাঁ হারেস। ওদের এমনই হওয়ার কথা। ঘটনা এমন যে তাদের ঠাণ্ডা না হবারই কথা।

'বলো কাসেম পুত্র! তুমি কি করতে পার। কিছু করতে না পারলেও বলো।'

'আমি দেবলে হামলা করব। কিন্তু সেই হামলার পূর্বেই এ ব্যাপারটি সমাধা করতে চাই।' ইবনে কাসিম তখনই ঘোড়া তলব করলেন এবং আলাফী ও তার সাথীদের সাথে বেরিয়ে গেলেন। দস্তুর মত একদল দেহরক্ষী তার সাথে গেল। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ গুপ্তচরের ব্যাপারে একটি সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। ওই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি সফল হতেন। এ সময় থেকেই গোয়েন্দা একটি আলাদা বিভাগ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব সেই লোককেই নির্ধারণ করা হতো–যিনি ভূগর্ভের ব্যাপারকেও দেখতে পারেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সাথে খুবই চৌকস এক গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন। নাম তার শাবান ছাকাফী। ইনি ইবনে কাসিমের গোত্রভুক্ত। তাঁর সম্পর্কে শ্রুতি ছিল যে তিনি এক প্রকার শক্তিবলে আসমান-যমীনের রহস্য জানতেন। ইবনে কাসিম যখন রওয়ানা করেন তখন শাবান ছাকাফীও তাঁর সাথে রওয়ানা হল। ইবনে কাসিমও তাঁকে সর্বদা সঙ্গে রাখতেন।

॥ এগার ॥

হারেস আলাফী ও তার সঙ্গীরা ঘোড়ার পিঠে। তাদের আশা দুপুরের মধ্যে বসতিতে পৌঁছানো সম্ভব। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম টর্নেডো গতিতে ঘোড়া চালান। তিনি সর্বাগ্রে, পাশে শাবান। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন।

দুপুরের কাছাকাছি তারা ওই চৌকিতে পৌঁছে যান। সালারকে দেখে চৌকির সকলে বেরিয়ে এলেন। ইবনে কাসিম পিছু হটলেন। শাবান এদের কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেন, কাল সন্ধ্যায় কারা কারা টহল দিয়েছে?

চার সেপাই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়।

'তোমরা কি ওই তিন যুবতীর ওপর হামলা করেছিলে? কিংবা তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছ, যে এই মহাপরাধ ঘটাতে রাজি? প্রশ্ন শাবান ছাকাফীর।

চারজনই হয়রান হয়ে একে অপরের দিকে তাকায়।

'তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সালারে আলা এসেছেন। সুতরাং ব্যাপারটা সাধারণ নয় বুঝতেই পারছ এবং তোমাদের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' বললেন শাবান ছাকাফী।

'দুশমনের জমিনে দাঁড়িয়ে যবান নাপাক করো না। দেশ থেকে দূরে এনে আমাদের এমন অপদস্থ করো না সালার।' চার সেপাইয়ের একজন রাগতস্বরে বললেন। এই সেপাইয়ের কথা তখনও শেষ হয়নি এ সময় আরেক সেপাই বুলন্দ আওয়াজে বলে ওঠেন, হে সালারে আরব! কসম সেই খোদার, যার নামে লড়াই করতে তুমি আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছ। কোন অপরাধে এদেরকে এই বিব্রতকর প্রশ্ন করা হচ্ছে? আমরা তো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।'

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম নিশ্চুপ। তিনি এই জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শাবান ছাকাফীর কাছে সোপর্দ করেছিলেন। আলাফী ও তার সঙ্গীরা এ দৃশ্য অবলোকন করছেন পাশে দাঁড়িয়ে।

'হারেস! ওই তিন যুবতীকে এখনই বস্তির বাইরে নিয়ে আসুন। যারাই তার সাথে আসতে চায় তাদেরকেও নিয়ে আসুন।'

আলাফী বলে যাবার পর শাবান ছাকাফী চৌকি কমাণ্ডারকে বললেন, এই চার সেপাইকে এখুনি নিয়ে আসুন। কমাণ্ডার যাবার পর শাবান ও ইবনে কাসিম আলাদা গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পরস্পরে কথা বলতে লাগলেন। সেপাইরা পরস্পরে কানাঘুষা শুরু করেছে। আলাফী চলে যাবার পর তারা এমন কিছু বলল, যা ইবনে কাসিমের ধৈর্যের বাইরে। শেষ পর্যন্ত শাবান ছাকাফী তাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, ভয় নেই তোমাদের সাথে কোন বে-ইনসাফী হবে না।

'সালারে আলা! মনে হচ্ছে এরা সেই বিদ্রোহী আরব। সিন্ধুর রাজা ওদেরকে দুধ-কলা দিয়ে পুষছে।' বললেন জনৈক আধবুড়ো সেপাই।

'হ্যাঁ ওরা তারাই। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের অনিষ্টকামী। হিন্দু রাজার নেমক হালাল। হিন্দুদের পূর্বেই এদের কিচ্ছা খতম করতে হবে। ওরা আমাদের নিকৃষ্ট দুশমন। আরেক সেপাই বললো।

'তোমরা কি এতটুকু সময়ের জন্য যবান বন্দ রাখতে পার না। বললাম তো কারো ওপর বে-ইনসাফী করা হবে না। সঠিক বিচারই করা হবে।' শাবান বললেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল চৌকির সেপাইরা বিদ্রোহী আরবদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষ্যাপা।

আলাফীকে তিন যুবতীসহ দূর থেকে আসতে দেখা গেল। পেছনে বসতির কিছু লোক। শাবান তাদের দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন। দূরেই তাদের গতিরোধ করলেন। তার জিজ্ঞাসার পরে যে মেয়েটিকে নিয়ে ঘটনা তাকে সামনে আনা হলো। ঝর্ণাটি নিকটেই। প্রান্তর সেই ঘটিত স্থানেই। শাবান ওই যুবতীকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। যুবতীকে বললেন, কোন সে স্থান-যেখানে তুমি ও তোমার বান্ধবীদের ওপর চৌকির সেপাইরা হামলা করেছিল।

শাবান যুবতীর দিকে তাকালেন গভীর দৃষ্টিতে। শাবান খানিক পর ওই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে যুবতী ডানে বামে দেখাল।

'আমরা ইনসাফ করতে এসেছি। যে তোমার ইজ্জতের ওপর আঘাত করেছে তোমার সামনেই তাকে কতল করা হবে। সুতরাং এত ঘাবড়ে গেলে কেন? বললেন ছাকাফী।

যুবতী নিশ্চুপ। যুবতীকে ওখানে রেখে শাবান খোলা প্রান্তরে গেলেন।

'যুবতীটি কি বোবা? তিনি বুলন্দ আওয়াজে বললেন।

'শাবান! আমরা ওর সাথে আরবীতে কথা বলেছি। যুবতীটি আরব্য নয়, হিন্দী। বছরখানেক পূর্বে আমাদের এক লোকের সাথে ওর বিয়ে হয়। ইসলাম গ্রহণ করেছে সে।'

বললেন হারেস আলাফী।

'আর অন্য দু'টি মেয়ে? তারাও কি তোমাদের কবিলার?'

'না। ওরা দু'জনও এখানকার অধিবাসী। পূর্বে হিন্দু ছিল। বেশ ক'বছর পূর্বে ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর আমাদের লোকের সাথে বিয়ে হয়েছে।' আলাফী বললেন।

শাবান ছাকাফী একজন দোভাষী সাথে নিলেন। তাকে যুবতীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে। শাবান দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, তাকে এই জায়গা দেখানো হোক, যেখানে তার ইজ্জত হরণ করা হয়েছে।

যুবতী কদ্দুর গিয়ে বলল, এখানে। শাবান এবার পুরো ঘটনা শোনাতে বললেন। যুবতী বলতে লাগল আর দোভাষী তা আরবীতে শাবানকে শোনাতে লাগল। যুবতীকে এবার তিনি বললেন, তোমাকে যেখানে শোয়ানো হয়–সে জায়গা দেখাও। যুবতী একটি স্থানের দিকে ইশারা করল।

শাবান যুবতীকে এক পাশে পাঠিয়ে দিলেন। অন্য দু'যুবতীকে স্বামীসহ ডেকে পাঠালেন অতঃপর।

আরবদের দূরদর্শিতা মশহুর ছিল আগে ভাগেই। তাদের কিচ্ছা-কাহিনীতেও এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ যতই আরব ও ইসলামের শত্রু হোক না কেন তারা এ দিকটা লিখতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। আরবরা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল সে কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। শাবান ছাকাফী তো সেই রহস্যভেদী আরব।

॥ বার ॥

দ্বিতীয় যুবতীকে নিয়ে শাবান ছাকাফী ঝর্ণার অপর কিনারে গেলেন এবং কোন জায়গায় তাদের ওপর হামলা হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। যুবতী ইশারা করে দেখাল এবং জিজ্ঞাসার জবাবে সে কাহিনী শোনাল।

এই যুবতীকে দূরে রাখা হলো। শাবান এবার তৃতীয় যুবতীকে স্বামীসহ ডাকলেন। একেও অপর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকেও বলা হলো, তার ওপর আক্রমণের জায়গা দেখিয়ে দিতে।

এ যুবতীও অপর এক জায়গা দেখাল।

শাবানের বলার পর সেও পুরো কাহিনী শুনিয়ে গেল।

এই যুবতীকে অপর এক স্থানে দাঁড় করিয়ে প্রথম যুবতীকে ডাকা হলো। ডাকা হলো তার স্বামীকেও। স্বামীর চেহারা গোস্বায় লাল। শাবানকে গিলে খেতে চায় ওই দু'টি চোখ। কিন্তু শাবান বড্ড ধৈর্যের পরিচয় দেন এ সময়।

শাবানের কিছু প্রশ্নের জবাবে যুবতী জানাল, সে ওই চার সেপাইকে দেখলে চিনতে পারবে। চৌকির বারজন সেপাই আলাদা দাঁড়িয়ে ছিল। শাবান উক্ত যুবতীকে স্বামীসহ ওদের কাছে গেলেন। তাকে বললেন চার সেপাইকে সনাক্ত করতে। যুবতী খুবই দ্রুত চার সেপাইয়ের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করল। ওই চার সেপাইকে আলাদা করা হলো এবং এদের স্বামীদের আলাদা করা হলো।

দ্বিতীয় যুবতী ও তার স্বামীর ইশারায় শাবান তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। সে বললো এর এক সেপাইকে তো পয়লা নজরেই চিনে ফেলেছি। আরেক যুবতী বললো, আমিও এদের একজনকে ভালো করে চিনি। দু' সেপাইকে আলাদা করা হলো। এভাবে তৃতীয়জনও এক সেপাইকে আলাদা করলে তাকে দূরে রাখা হলো।

শাবান এবার তিন স্বামীকে বললেন, এ তিন সেপাই গতকাল টহল দিতেছিল। আর তোমাদের স্ত্রীরা যাদের শনাক্ত করেছে তারা গতকাল ছাউনিতে অবস্থান

করছিল। আর তোমাদের প্রাণাধিক স্ত্রীরা ভিন্ন যে তিনটি ঘটনাস্থল শনাক্ত করেছেন, তোমরা আরব তোমরা জান, সে জায়গার বালুও এর সাক্ষ্য দিবে। সেপাইরা ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ওরা যে স্থানের কথা বলেছে তোমরা সেখানে কোন ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখাতে পারবে কি? এতো গত সন্ধ্যার ঘটনা। এরপর কোন ঝড় আসেনি। বৃষ্টি বর্ষেনি। একটা পায়ের ছাপ অন্ততঃ আমাকে দেখাও। তোমার স্ত্রী তার ইজ্জত হরণের যে স্থান শনাক্ত করেছে। এসো দেখবে সে জায়গা।

শাবান তাদেরকে ওই স্থানে নিয়ে গেলেন। ওখানে মানুষ কিংবা ঘোড়ার কোন পদচিহ্ন নেই।

'আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান শনাক্ত করেছে যেখানে তাদের ওপর হামলা করা হয় বলে তারা জানিয়েছে। সেপাইরা ছিল ঘোড়ায়। তারা পলায়নপর দু' যুবতীকেও ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে নেয়ার কথা। এরা কি ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী? একথাও মনে রেখো, ওরা তিন ভিন্ন সেপাইকে সনাক্ত করেছে। যারা ওই সময় টহল দিয়েছিল তারা এক্ষণে তোমাদের সামনে।' বললেন শাবান।

শাবান স্বামীদের উপস্থিতিতে যুবতীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা এমন জবানবন্দী দিয়েছে কি-না?

'হারেস ভাই!' শাবান বললেন, 'বনুছাকীফের খুনে এখনও ঘুন ধরেনি। বন উসামা যদি যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে স্বস্তির হাত বুলোয় তা হলে ছাকাফী সেনাপতি রক্ত দিয়ে এর ঋণ শোধ করবে। তোমরা কি কল্পনা করোনি এরা ক'দিন পূর্বেও হিন্দু ছিল। হিন্দুদের ঘরে ওদের জন্ম। মূর্তিপূজা করেই যুবতী হয়েছে। পরে এ তিন আরব যুবকের রূপে পাগল হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ধর্ম ও চিন্তাধারা ওদের বদলায়নি এতটুকু। ওরা আমার মেয়ে হলে অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করতাম। বলো আমি কি অযৌক্তিক কিংবা মিথ্যা বলছি? এটি একটি নির্জলা অপবাদ। তোমাদেরকে আরব সেনাদের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলতে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তোমরা খেলাফতের বিদ্রোহী। কসম খোদার। তোমাদের বিদ্রোহ জায়েজ ছিল। কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞতা ও হিম্মত কোথায় গেল? এরা এখন তোমাদের ঘরের বউ। তুমি এযাযত দিলে এদের স্বামীদের পৃথকাকারে সত্যাসত্য দেখাব। আলাফীকে লক্ষ্য করে বলেন শাবান ছাকাফী।

॥ তের ॥

আচমকা তিন স্বামী এক সাথে তাদের স্ত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। চুল ধরে বালু মাটিতে টানা হেঁচড়া করলেন। স্বামীরা তলোয়ার বের করলেন এবং শাহরগে তা চেপে ধরলেন।

'সত্যি করে বল হিন্দুর বাচ্চি?' বললো এক স্বামী।

এ সময় আলাফী তলোয়ার বের করলেন। অপর যুবতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।' সত্য কথা বললে জিন্দা থাকবে। তিনজনের চুলে রশি বেঁধে ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে পাহাড়ী জমিনে ঘোরাও।' শাবান বললেন।

'না না।' এক যুবতী ভীত বিহবল চিত্তে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'আমি ওই করুণ মৃত্যু মরতে চাই না। সত্য শুনতে হয় তো আমার কাছে শোন।

এ দিকে যে মেয়েটির শাহরগে তলোয়ার উত্থিত করা হয়েছিল সেও সত্য বলতে রাজী হলো। তিন যুবতী যে সত্যোন্মোচন করেছিল তা ছিল এই, তাদেরকে রাজা দাহিরের স্ত্রী মায়ারাণী যে কি না তার আপন বোনও, সেই তাদেরকে একাজে প্রলুব্ধ করেছে। তিন আরবের সাথে বিবাহ বসতে বলেছে। এ সেই সময়ের নির্দেশ যখন হাজ্জাজের দ্বিতীয় সালার বুদায়েল ইবনে তোহফা শাহাদতবরণ করেছেন। রাজা দাহির চিন্তায় ছিলেন। এরপর আরবের বিশাল বাহিনী আসবে। আলাফীকে ডেকে তার হয়ে লড়াই করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি সরাসরি তা নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরান পৌঁছার পর রাজা দাহির তার উজীর-নাজির নিয়ে মিটিং-এ বসেন। ওই পরামর্শে দুষ্টমতি উজির অস্ত্রের পূর্বে নারী দ্বারা মুসলিম আরবদের ঘায়েল করার মত দেন। উজীর জানতেন মায়ারাণী ইতোপূর্বে এ হাতিয়ার এস্তেমাল করেছেন।

এ তিন যুবতী আরো জানাল, তারা যখন বসতি ছেড়ে ঘুরতে যেত তখন মায়ারাণীর চরদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। ওই চরদের কাছে মায়ারাণীর শেষ পয়গাম ছিল, আলাফী আরব্য নতুন বাহিনীর সাথে দোস্তি করে ফেলেছেন। সুতরাং তাদের ও আরব বাহিনীর মাঝে দুশমনি পয়দা করে দিতে হবে যথাশীঘ্র। মায়ারাণীই আমাদেরকে এই পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন চরদের মাধ্যমে।

'এদের ফয়সালা এখন সর্দার আলাফীর হাতে।' বললেন এক স্বামী।

'তিনজনকেই হত্যা করে ফেল।' আলাফীর নির্দেশ।

তিন যুবতীই আর্তনাদ করে ওঠল। তারা দয়া ভিক্ষা চাইতে লাগল। বললো এ কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করিনি, করানো হয়েছে। কিন্তু আলাফী তার সিদ্ধান্তে ইস্পাত কঠিন।

'থামো আলাফী থামো!' মহামতি ইবনে কাসিমের কণ্ঠ গর্জন করে ওঠে। ওদেরকে বে-গোনাহ মনে কর। আমি দাহিরের কাছে একটা পয়গাম পাঠাতে চাই। তিনি ওই তিন যুবতীকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমার সেপাইরা তোমাদের তিনজনকে ঘোড়ার পিঠে করে কোন বসতিতে রেখে আসবে। রাজা দাহিরকে বলবে, লড়াই করতে হয় রণাঙ্গনে। তাও পুরুষরা করে। নারীদের দিয়ে করিও না। তাকে আরো বলো, আপন বোন বিবাহের সাজা সে অচিরেই পেতে যাচ্ছে। সুতরাং ভয়ঙ্কর পরিণতির অপেক্ষায় থাকতে বলো তাকে।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম চৌকি কমাণ্ডারকে বললেন, ওদেরকে আলাদা তিনটি ঘোড়ার পিঠে চাপাও। সাথে দাও দু' সওয়ারকে। এখান থেকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বসতিতে এদেরকে রেখে আস।

এ রকম ভয়ানক পরিস্থিতি ওই সময় একের পর এক ঘটতে লাগল। হিন্দুরা ওই যুগে কোন ষড়যন্ত্রই করতে বাকী রাখেনি। হিন্দুস্থান তখন রহস্যে ভরা এক দেশ। এখানকার মন্দিরের মধ্যে ছিল আরেক রহস্য। এর বাহিরটা সুন্দর থাকলেও ভেতরটা ছিল অন্ধকার শুধু অন্ধকার। আরবদের ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম ছিল পুরোপুরি উল্টো। এ দু' বিপরীত ধর্মের টক্কর লাগলে নানান কাহিনী জন্মে।

মুহাম্মদ তখনও জানতেন না দুশমন তাকে ঘায়েল করার জন্য অস্ত্র ছাড়া এমন কত হাজার ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

এই ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে তরুণ সেনাপতি আরমান বেলা ফিরে এলেন। পরদিনের সূর্য দেখল দেবলের উদ্দেশে ছুটে যাওয়া এক জ্বলন্ত বারূদ।

দেবল যাত্রা

॥ এক ॥

রাজা দাহিরের দরবার।

তিনি সিংহাসনের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন।

এক সময় তিনি বলে ওঠেন, 'ওই বুদ্ধিস্ট বেটা এখনো এলো না যে?'

'আসছে মহারাজ।' জবাব পেলেন তিনি।

'নিরূন তো এত দূর নয় যে, বেটার পৌঁছুতে তিন দিন লাগবে। আরবদের কাছে সারেণ্ডার করার পূর্বে বেটা কি ভেবে দেখল না যে, আমিই তাকে গভর্ণর বানিয়েছিলাম এবং আমরা ওকে গভর্ণর থেকে রাস্তার ভিখারীও বানাতে সক্ষম।' দাঁতে দাঁত পিষে বলেন ক্ষুব্ধ দাহির।

দাহির বিস্তারিত সংবাদ পেয়েছেন যে, আরব বাহিনীর সংখ্যা, উট, ঘোড়া, অস্ত্র, কামান ও জাহাজের সংখ্যা কত। আরমানবেলা ও কুঞ্জপুর কেল্লায় মুসলিম পতাকা ওড়ার কথাও তার অজানা নয়। গতরাতে মায়ারাণী তাকে জানিয়েছেন, যে তিন যুবতীকে তিনি বিদ্রোহী আরবদের কাছে চর হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন, তারা ধরা পড়ে গেছে এবং কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ইবনে কাসিম তাদের জিন্দা ছেড়েছেন। একটি বসতিতে রেখে গেছেন তার সেপাইরা। ওই যুবতীরা বসতির মানুষদের বলেছে, তারা শাহী খান্দানের মেয়ে। ফওরান তাদের আরোড় পৌঁছুতে হবে। তাদেরকে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চাপিয়ে দেয় বসতির লোকজন। চারজন লোক তাদের সাথে দেয়া হয়। গতকাল সন্ধ্যার আগক্ষণে তারা পৌঁছেছে। তারা মায়ারাণীকে ধরা পড়ার ঘটনা খুলে বলেছে। রাতেই মায়ারাণী তাদেরকে রাজা দাহিরের কাছে নিয়ে যায়। দাহির তাদের মুখে পুরো কাহিনী শোনেন।

এক যুবতী বললো, 'মহারাজ! আমরা বেকসুর। নির্দেশিত টার্গেটে তীর ছুঁড়েছিলাম ঠিকই; কিন্তু আরবরা যে মাটির নীচেও ওপরের মত সমান দেখতে পায় জানতাম না। বিদ্রোহী আরবদের শিরায় যেভাবে সজাতির খুন বহানোর ক্রোধ দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল তারা অতি অবশ্যই চৌকিতে হামলা করে বসবে। এর প্রতিশোধে হামলাবাজ আরবরাও প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসবে। এতে আলাফীরা মহারাজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস জন্মেছিল আমাদের। আরবী ফৌজের সালারও এসেছিলেন। এসেছিল তার সাথে আরো অনেকে।'

'এরপর যা কিছু হয়েছে শুনেছি। তুমি সচক্ষে আরব সেনাপতিকে দেখেছ কি?' প্রশ্ন দাহিরের।

'আমরা তিনজনেই ইতোপূর্বেই জেনেছিলাম, আরব বাহিনী এসেছে। আমাদের স্বামীরা বলেছেন, নাম তার মুহাম্মদ ইবনে কাসিম।'

'মুহাম্মদ ইবনে কাসিম! নামটা শুনতে তোমাদের ভুল হয়নি তো? হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নয় তো সে?'

'না মহারাজ!' বললো এক যুবতী।

'এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মহারাজ! তার নাম মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নয়।' দ্বিতীয় যুবতী বললো।

'মহারাজ!' প্রথম যুবতী বললো, 'তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভাতিজা। বয়স আমাদের তিনজনের থেকেও কম।'

'সে তো এক কিশোর মহারাজ! খুবই দৃষ্টিনন্দন তার চেহারা।' দ্বিতীয় যুবতী বললো, 'দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি সালারে আলা। কিন্তু তার সাথে দেহরক্ষী ছিল। যে-ই তার সাথে কথা বলত, সে-ই সালারে মুহতারাম বলে তাকে সম্বোধন করত। তিনিই আমাদেরকে হারেস আলাফী ও স্বামীদের উদ্ধত তলোয়ার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বলেছেন, আমাদেরকে নিকটবর্তী বসতিতে নামিয়ে দিতে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তিনি সালার-ই হবেন।

রাজা দাহির অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'শুনেছিলাম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ খুবই বিচক্ষণ। কিন্তু এখন দেখছি মস্ত আহাম্মক। অভিজ্ঞ সালাররা শোচনীয়ভাবে পরাভূত হল যেখানে, সেখানে সে এক দুধের বাচ্চাকে পাঠিয়েছে আমার বিরুদ্ধে। এই বাচ্চাকে বোধ হয় সে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। কিংবা পচা শামুকে পা কাটার প্রবাদে কাজ করতে চাচ্ছে।' তিনি যুবতীদের বললেন, 'রাণী বলেছেন, সে নাকি আমার কাছে কি পয়গাম দিয়েছে?'

তিন যুবতীই ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ী করে। তারা ইবনে কাসিমের কথা রাজার সামনে পেশ করতে ভয় পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা বড় চোখ করে মায়ারাণীর দিকে তাকায়। মায়ারাণীর ইশারা পেয়ে এক যুবতী বলে ওঠে, 'তিনি বলেছেন, রাজা দাহিরকে বলো-লড়াই হয় রণাঙ্গনে। তাও করে পুরুষেরা, নারীরা নয়। আরো বলো, আপন বোনের কুলাঙ্গার স্বামী সাজা পেতে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অপেক্ষা করতে বলো তাকে।'

যুবতীদের দরবার থেকে যেতে বলে মায়ারাণীকে দাহির বললেন, এদের কি করার সিদ্ধান্ত নিলে মায়া?'

'ওরা এক্ষণে হিন্দু সমাজভুক্ত হতে পারছে না। মুসলমানদের শয্যাসঙ্গী হয়েছে ওরা। হিন্দুদের দাসীও বানানো সম্ভব নয়। ওদের থালা–বাসন পৃথক করে দিতে হবে। আমার কাছেই থাকবে তারা। আমিই ওদের পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং এক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না।'

'দেখ, ওরা না আবার শেষ পর্যন্ত আমাদের গদির দিকশূল না হয়। বেশীদিন রাখতে যেও না।'

এটা গত রাতের কথা। পরদিন সকালে দাহির আবার জিজ্ঞাসা করেন, ওই বুদ্ধিস্ট এখনো এলো না?' এর দ্বারা তিনি নিরূন গভর্ণর সুন্দরকে বোঝাচ্ছেন–যিনি

অতি সংগোপনে হাজ্জাজের কাছে শান্তি চেয়ে বসরায় দূত পাঠিয়েছিলেন। হাজ্জাজও যাকে জিযিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলেন।

শেষপর্যন্ত রাজা দাহির জানতে পারলেন, তিনি মুসলমানদের গোলামী কবুল করেছেন। অবশ্য তিনি জবাবদিহিতা করেননি তাকে। এর কারণ হচ্ছে, এই সময় যে কোন গভর্ণর যে কোন সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে, এমন আশংকা। কোন গভর্ণরকে শাস্তি বা ধমক দিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত করাতে তিনি আদৌ রাজী ছিলেন না। কেননা সেমতাবস্থায় রাজধানী থেকে দূর-সুদূরের প্রদেশগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবার আশংকা ছিল।

'বিজ্ঞ উজীর হে! সে কেন এল না এখনও? তাহলে কি মনে করব, সে আমার দুশমনের সাথে হাত মিলিয়েছে?' উজীর বুদ্ধমানকে বললেন দাহির।

'আরবদের সাথে হাত মেলাক চাই না মেলাক-সে অবশ্যই মহারাজকে উপেক্ষা করছে বলে মনে হয়, তবে সে আসবে। আসতেই হবে তাকে।' বললেন উজীর।

'তোমার জ্ঞান ও মেধা কি বলে? তার সাথে কি ব্যবহার করা যায়? আমি তো প্রশাসনের এ অনিয়ম বরদাশত করতে পারি না।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে মহারাজকে বরদাশ্ত যে করতেই হবে। সে এলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করবেন না যেন, সে তড়া করে কেন এল না? তার সাথে এমন ব্যবহার করবেন যেন সে মনে করে আপনি তার হিতাকাংখী। মহারাজ মুসলমানদের আনুগত্য না করার কথা-ই বোধহয় তাকে বলতে চান?'

'হ্যাঁ! তাকে আমি এই কথাটাই বলতে চাই।'

'তাকে এও বলবেন যেন সে মুসলমানদের সাথে আনুগত্যের অভিনয় করে যায়। মুসলমানদের জন্য শহরের দরোজা খুলে দেয় এবং সম্বর্ধনা জানায়। মুসলিম বাহিনীর সকলে প্রবেশ করলে দরাম করে যেন দরোজা দেয় বন্ধ করে এবং তার ফৌজ যেন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেল্লা মিলে যাওয়ায় মুসলমানরা লড়তে চাইবে না। হামলায় দিশেহারা হয়ে ওরা গলিতে আশ্রয় নিতে চাইলে গুপ্তবাহিনী যেন পাথর নিক্ষেপ করে।'

'সে এটা মানতে না চাইলে তখন কি করা?'

'মহারাজ! সে এতে অস্বীকার করলে ফেরার সময় পথিমধ্যেই তাকে ওপারে পাঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথা ঘোষণা করতে হবে, আরবরা তাকে হত্যা করেছে। নিরূনে ঘোষণা করতে হবে, রাজধানীতে যাবার পথে গভর্ণর দু'যুবতীকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরব ফৌজরা তাদের ধরে নিয়েছে।'

'তার সাথে তো দেহরক্ষী থাকবে।'

'ফৌজ তো আর থাকছে না। দেহরক্ষী তাও দশ/বার জনের বেশী নয়তো। হামলা করতে হবে যে কোন ছাউনিতে তারা আরাম গ্রহণকালে। এর ব্যবস্থাদি আমার হাতে ছেড়ে দিন মহারাজ। দেখবেন কোথাকার জল কোথায় নিয়ে গড়াই।' থামলেন উজীর।

॥ দুই ॥

ওইদিন সন্ধ্যায় গভর্ণর সুন্দর সোমনি আরোড়-এ উপনীত হন। রাজা দাহির তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তার মালপত্র ছিল আটটি উটে বোঝাই। রাজা দাহির অবাক নয়নে দেখলেন, তার দেহরক্ষীর মধ্যে পাগড়ীধারীরা বিদ্যমান। তাদের ক'জনের চেহারা নেকাবে ঢাকা। কেবল চকচকে দু'টি চোখ দেখা যাচ্ছে।

'ওদের চেহারা ঢাকা কেন?' রাজা দাহির প্রশ্ন করেন।

'ওদেরকে এভাবে দেখতে আমার ভাল লাগে। দেহরক্ষী এমন ভয়ানক হওয়ার দরকার, যাদেরকে দেখলে মনটা ছ্যাৎ করে ওঠে।' বললেন সুন্দর সোমনি।

রাজা দাহির তার এ কথাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন। এরচেয়ে জরুরী কথা ছিল তার সাথে। তাই তিনি তাকে খাস্ কামরায় নিয়ে গেলেন।

'একথা কি সত্য, তুমি মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করেছ? প্রশ্ন দাহিরের।

হ্যাঁ মহারাজ! বিলকুল সত্য।' সুন্দর সোমনি উত্তর দেন।

'জিযিয়াও কবুল করেছ?'

'হ্যাঁ মহারাজ! নিরূনবাসীর নিরাপত্তার জন্য এটা করতে হয়েছে।'

'না সুন্দর সোমনি! বরং তুমি আমার ও নিরূনবাসীর ইজ্জত ও আত্মসম্ভ্রমকে দুশমনের কাছে বিক্রী করে দিয়েছ। জানো না, ওরা দূরদেশী ও বিধর্মী। আমাদেরকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাদের অভিলাস?'

'মহারাজ! আমিও একথা জানি যে, ওই বিজাতি তাদের বাহিনী আমাদের দেশে কেন পাঠিয়েছে। আপনিই তাদের ডেকে এনেছেন।

'সুন্দর! তুমি আরবদের দূত নও। আমার গভর্ণর। তুমি তোমার দেশীয় রীতিতে কথা বলো। দেশ ও জাতির জন্য তোমাকে লড়তে হবে।'

'আমার ধর্ম আমাকে লড়াই করার অনুমতি দেয় না। অহিংসা পরম ধর্ম। বিশেষ করে খোদ আপনিই যখন জালেম, তখন তো লড়াই করার কোন সুযোগই নেই আমার। কি অপরাধে আরব কাফেলার নারী-পুরুষদের আপনি বন্দী করে রেখেছেন? তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে আপনি কেন লুণ্ঠন করেছেন?'

'আমি জানি না ওরা কোথায়? পেশাদার দস্যুরাই ওদের মালামাল লুণ্ঠন করেছে। ওরা আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

'ওরা দেবলের কয়েদখানায় মহারাজ! এখনও সময় আছে ওদের মুক্ত করে দিন।'

'আমি তোমার কথা মানব না, তুমিই মানবে আমার কথা।'

'আমি মহাত্মা বুদ্ধের কথা-ই মানব মহারাজ!'

'তাহলে তুমি নিরূন ছেড়ে এখানে চলে এসো।'

'নিরূনবাসীকে বলুন, তারা আমাকে ছাড়তে রাজী কি-না! নিরূনের একটি অবুঝ শিশুকেও জিজ্ঞাসা করুন। আমাকে ছাড়লে সিন্দুর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় ঝাঁপ দিয়ে তারা আত্মহত্যা করবে। আপনি ক্ষমতা প্রয়োগ করলে ওখানকার জনগণ তা মানবে না।'

'কোন লোকদের কথা বলছ!' রাজা দাহির গর্জে ওঠেন। 'আমাদের প্রজাবৃন্দের কথা বলছি। আমরা চাইলে তাদের ক্ষুধার্ত মারতে পারি, চাইলে খাদ্য দিয়েও ভরে দিতে পারি।'

'দাম্ভিকতা ছাড়ুন মহারাজ! প্রজারা সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসেন। ওরা তারই দরবারের মুখাপেক্ষী। ওদেরকে মানব ঢাল বানাবেন না। এমন যেন না হয়, প্রজাবৃন্দের বিদ্রোহে আপনি পরাভূত হয়ে পড়েন। প্রভু তার মজলুম বান্দার কথাই শোনেন। শান্তি-নিরাপত্তাই প্রভুর বিধান। বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির প্রতীক। ইসলাম সাধারণ মানুষের ধর্ম। প্রেম-মুহাব্বত ও সংবেদনশীলতা যার বৈশিষ্ট্য।'

তুমি কি ওই ইসলামের কথা বলছ, যারা আমাদের দেশে রক্ত গঙ্গা বহাতে এসেছে?'

'ওরা আমার শহরের নিরাপত্তা দিয়েছে। নিরাপত্তাকামীদের জবাবে ওরা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

আপনার ওপর ওরা ভরসা করতে যাবে কেন? আপনার ঠাকুরদাদা পারসিকদের হাতি দিয়েছিলেন মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য। অথচ পারসিকরা সর্বদা সিন্ধু ও মাকারানে হামলা করত। তারা এখানকার হাজারো জাঠদের ধরে নিয়ে যেত। স্রেফ মুসলিম বৈরিতার বশীভূত হয়ে তিনি ইরানীদেরকে হাতি দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। অতঃপর আপনার বাবা-দাদা তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার তোলেন। আরব্য বিদ্রোহীদের তারা আশ্রয় দেন। তাদেরকে তোলেন স্বজাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে। এক্ষণে মহারাজ তাদের জাহাজ লুট করেছেন। বধূ-কন্যাদের বন্দী করেছেন। এরপর আমি কি করে বলি, আরবরা আমাদের দেশ উজাড় করতে এসেছে।'

'তোমার ওপর মুসলিম ভূত চেপেছে।'

'মহারাজ! আমি এখন আর নিরূনের গভর্ণর নই। এ ফায়সালা নিরূনবাসী করবে। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিলে নিরূনবাসী ক্ষেপে যাবে। মানুষ শান্তি চায়। এমনও হতে পারে, জনগণ মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দিবে।'

রাজা দাহির মুসলমানদের জিযিয়া না দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন এবং বললেন, তাদের আনুগত্য করো না। কিন্তু সুন্দর রাজী হলেন না। দাহির তার উজিরকে ডাকলেন।

'সুন্দর সোমনি আজ রাতেই ফিরে যাচ্ছে। তাকে আত্তি-আদর করেই ফেরৎ যেতে দাও।'

বুদ্ধমান ওই সময়ই বেরিয়ে গেলেন। রাজা দাহির তাকে নৈশ ভোজে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সুন্দরের সাথে কথা বললেন। রাজা দাহির তাকে বললেন, মুসলমানদের আনুগত্য ছাড়লে তোমাকে নিরূনের স্বাধীন রাজা বানিয়ে দেব। এক হাসিতে এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন তিনি। বুদ্ধমান কামরায় প্রবেশ করলেন। দাহিরের এই গায়েপড়ে কথা বলার উদ্দেশ্য— সুন্দর সোমনি আজই রওয়ানা হয়ে যাক। কারণ সে রাজার ইজ্জত করার মত তেমন কোন প্রস্তাবই মানেনি।

'নিরূন গভর্ণর কি প্রস্তত?' বুদ্ধমান বলেন।

'হ্যাঁ বুদ্ধমান! আমি প্রস্তত।' গভর্ণর বলেন।

খানিকবাদে ছ'মুখোশধারী দেহরক্ষীসহ নিরূন গভর্ণর সুন্দর সোমনি বেরিয়ে পড়লেন। সামনে চল্ছিল রাজা দাহিরের দেহরক্ষী বাহিনী। বুদ্ধমান ছিল গভর্ণরের সাথে। চাঁদনী রাত মরুতে এটা সুন্দর পরিবেশের স্বাক্ষর বহন করে চলছিল। সুন্দরকে সুন্দরভাবে বিদায় জানাতে দাহির তার দেহরক্ষীবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন–যাতে তারা শহরতলী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

ঐ বিদায় যাত্রায় সবাই ছিল চুপচাপ। ঘোড়ার খুরধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। কেল্লা থেকে এক মাইল দূরে গেলে উজীর সুন্দরকে থামতে বলেন। তার সাথে বিদায়ী করমর্দন করেন এবং দেহরক্ষীদের ডানে বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান। সবাই তলোয়ার বের করে তার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। সুন্দর ও তার মুখোশধারী দেহরক্ষীরা কাতারের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হন। দাহির বাহিনী তলোয়ার খাপে ঢোকায়। বুদ্ধমান তাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। দেহরক্ষীরা ঘোড়ায় পদাঘাত করে দ্রুত কেল্লায় ফিরে আসে। উজীর আসেন সরাসরি দাহিরের কাছে। দাহির তাকে দেখামাত্রই প্রশ্ন করেন, 'তোমার বন্দোবস্ত ব্যর্থ হবে না তো?

'সকাল নাগাদ আপনি গভর্ণর ও ছ'দেহরক্ষীর লাশ দেখতে পাবেন। জনা বিশেক লোক পাঠিয়েছি আমি। ওরা ফৌজের অফিসার। উটের পিঠে পর্যটকের ছদ্মবেশে ওরা গেছে। সাথে পাঁচজন মহিলাও দিয়েছি। যাতে ওরা পর্যটক নয়–এমন সন্দেহ না হয়। সুন্দর সোমনিকে রাতে কোথাও ছাউনি ফেলতেই হবে। ওরা ঘুমালে তখনই হামলা হবে।' বললেন উজীর।

'ওই বৌদ্ধ বেটা কিছুতেই যেন নিরূন পৌঁছুতে না পারে।'

'পৌঁছুবে না মহারাজ! আপনি নিরূনের পরবর্তী গভর্ণর নির্ধারিত করুন!'

'নিরূনের পরবর্তী গভর্ণর আমার পুত্র জয়সা।'

'মহারাজ! সুন্দরের দেহরক্ষী আপনার লোক নয়। ওরা আরব্য মুসলমান। ওদের কেবল ললাট, চোখ ও নাক দেখা যাচ্ছিল। তিনি যখন আপনার সাথে মতবিনিময় করছিলেন তখন তারা কেল্লার আশপাশে টহল দিয়ে বেরিয়েছে। পরস্পরে কানাঘুষা করেছে। ওদের চাল আমার কাছে কেমন সন্দেহজনক লেগেছে। অতঃপর আমি ওদের ঘোড়ার জ্বিন দেখেছি। ওই জ্বিন এদেশের বানানো নয়।'

'ওহ্হো! এজন্য বুঝি ওদের চেহারা ঢাকা ছিল! এর মতলব, বেটা আরবদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কও গড়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে। এতবড় সাহস! আমার সাথে দেখা করতেও আরব দেহরক্ষী।'

'আজকের রাতই সুন্দর ও তার দেহরক্ষীদের শেষ রাত।'

দাহির যখন উজীরের সাথে কথা বলছিলেন তখন সুন্দর নিরূনের পথে এগিয়ে চলছেন। ফৌজ ও পর্যটকদের যাতায়াতের রাস্তা একমাত্র এটাই। পথটা বালুকাময়। এ পথে সবুজ বন-বনানী ছিল এবং পানিও পাওয়া যেত।

এ ছ'দেহরক্ষী আসলেই আরব। তন্মধ্যে জনাপাঁচেক ইবনে কাসিমের অভিজ্ঞ অফিসার। ষষ্ঠ জন হারেস আলাফীর প্রেরিত ব্যক্তি। যিনি দীর্ঘদিন এখানে থাকার কারণে সিন্ধিভাষা রপ্ত করেছেন। দাহিরের দূত আসার পরপরই সুন্দর ইবনে

কাসিমের কাছে বার্তা পাঠান যে, রাজধানী থেকে আমার ডাক এসেছে। দাহিরের ধূর্তামির শেষ নেই। এদিকে হাজ্জাজ বলেছিলেন, নিরূন আমাদের আনুগত্য কবুল করেছে। সুতরাং দেশ ও প্রজার পাশাপাশি গভর্ণরের হেফাজত আমাদের দায়িত্ব।

এই মুহূর্তে নিরূন গভর্ণরের এই আহবানে চিন্তা কিংবা সাড়া দেয়ার ফুরসত ছিল না ইবনে কাসিমের। কারণ তিনি তখন দেবল যাত্রা করতে প্রস্তুত। এতদসত্ত্বেও হারেস আলাফীর সাথে সেনাপতি রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসলেন। হারেস বললেন, 'নিরূনে আপনার গুপ্তচরের উপস্থিতি দরকার। আমার এক লোককে আপনার গোয়েন্দাদের সাথে দিয়ে দেব। এরা নিরূন গভর্ণরের সাথে দেখা করবে। যেহেতু সুন্দরের সাথে চুক্তি হয়েছে সেহেতু সে আপনার কথামত চলবে। সকলকে তার দেহরক্ষী বানাতে বলবেন। এ গোয়েন্দারা সুন্দরের ওপরও নজর রাখবে, যাতে সে কখনও প্রতারণার আশ্রয় নিতে না পারে।'

এভাবে ছ'গোয়েন্দা সুন্দরের কাছে গেল। ইবনে কাসিমের জাদরেল গোয়েন্দা প্রধান শাবান ছাকাফী তাদেরকে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন বিদায় বেলায়।

রাজধানী থেকে ডাক এলে সুন্দর বুঝতে পারেন, কি উদ্দেশ্যে তাকে তলব করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন শংকানুভব করলেন না। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী ও হিম্মৎওয়ালা পুরুষ। তিনি তার সাবেক দেহরক্ষীদের সাথে নিয়েই আরোড় যেতে চাচ্ছিলেন। এদের অধিকাংশই হিন্দু। এরা আশংকা প্রকাশ করে বলল, আমাদের না নিয়ে আরবদের নিয়ে যান। অবশ্য তারা যাবার সময় যেন চেহারায় নেকাব লাগিয়ে যায়' যাতে আরোড়ে কারো সন্দেহ না হয়। নিরূনে বলতে হবে, এরা বিদ্রোহী আরবী গোত্রের। নিরূনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এদের বাস।

॥ তিন ॥

এগিয়ে চলেছে নিরূন গভর্ণরের কাফেলা। রাত পোহাল। মরুদিগন্তে হেসে ওঠল নবারুণ। চোখ খুললেন রাজা দাহিরও। উজীর এসেছে কিনা জানতে চান।

'আসেন নি মহারাজ!' কেউ বললো।

'আসা মাত্রই অন্দরে পাঠিয়ে দিও।'

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হবার পরও উজীর না আসায় তিনি আবারো খোঁজ নিলেন। তিনি না আসায় রাজা দাহির তাকে ডেকে পাঠালেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি তার মহলে নেই। কেল্লার দরোজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বুদ্ধমান উদ্বিগ্ন হয়ে দরোজায় দাঁড়িয়ে নিরূনের পথে তাকিয়ে রয়েছেন। মরু বালু ক্রমশঃ তপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি এর মাঝে তার লোকদের খুঁজে পেতে চাচ্ছেন। কিন্তু কেবল মরীচিকা আর ধু-ধু প্রান্তর। কোন উষ্ট্রারোহীর টিকিটিও নেই।

তাকে বলা হলো, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। হতাশ হয়ে তিনি কেল্লার ফটক ছেড়ে রাজদরবারের পথ ধরলেন।

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে একা প্রহর গুনছি?' রাজা দাহিরের কণ্ঠে আশার সুর।

'সেই অপেক্ষার সারিতে আমিও যে মহারাজ! ওদের পথ চেয়ে আছি। সুন্দর হয়ত রাতে কোথাও আত্মগোপন করে ছিল। দিনের বেলায়ও যদি সে কোথাও বিশ্রাম নেয় এবং তার দেহরক্ষীরা ঘুমায় তাহলেও তাকে খতম করে দেয়ার কথা বলেছি। রাতে তারা কোথাও থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। নিরূন সে পৌঁছুতে পারবে না। আমাদের লোক আজ না এলে কাল আসবেই।'

ওদিনটাও অতিবাহিত হলো। পরদিন ভোরের আকাশে সূর্য ওঠল। উষ্ট্রারোহী গুপ্তঘাতকদের দেখা নেই। বুদ্ধমান কেল্লা ফটকে তাকিয়ে। রাজা দাহির তার চেয়েও বেশী অধীর হয়ে আছেন। চতুর্থ দিনে উষ্ট্রারোহিরা ফিরে এলো। গুপ্তঘাতকদলের কমান্ডার উজীরের কাছে এসে দাঁড়াল।

'কাজ করে এসেছ তো?' উজীর প্রশ্ন করেন।

এ প্রশ্নের জবাবে সে মাথা নীচু করল।

'কেন?' বুদ্ধমান গর্জে ওঠেন, 'কি কারণে? তোমরা সবাই নারীসঙ্গে মেতে উঠেছিলে বুঝি?'

'না মহারাজ! আমরা তো দম ফেলারও সুযোগ পাইনি। নিরূনের শহরতলী পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে তাকে পাইনি। খুব সম্ভব তারা রাস্তা বদলে ফেলেছিল।' কমাণ্ডার বললেন।

'বুদ্ধমানের মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি রাজা দাহিরকে বললেন, শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'শিকার নয়, নিরূন-ই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এক্ষণে বিকল্প ভাবনা কর।' দাহিরের কণ্ঠে ক্ষোভ ও হতাশা।

'ভাবছি, বেটা গেল কোন পথে? সেকি কোন সন্দেহে পড়েছিল?' উজীর জানতে চাইল।

সে সব নিয়ে এখন আর ভেবে কাজ নেই–

এক্ষণের চিন্তা-ভাবনা, নিরূনবাসীকে কি করে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। মানুষ শান্তিকামী। সেকি জনগণকে বোকা বানিয়েছে? তা না হলে মানুষে তার কথায় কেন কান দিতে যাবে?'

'হ্যাঁ মহারাজ! বিহিত ব্যবস্থা একটা নিতেই হবে।'

'কি ব্যবস্থা নিবে? মনে হচ্ছে তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে? এমন একটা শংকা আমাকে পেয়ে বসেছে যে, নিরূন গভর্ণরকে অব্যাহতি দিলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। তাকে তার বাসভবনেই কতল করব। না পারলে আবার তলব করব তাকে। নিরূন না ছাড়লে তাকে ফৌজ দ্বারা ঘায়েল করব।'

'এক্ষণে কিছু না করলেই ভাল মহারাজ! পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূল। টর্নেডো গতিতে দুশমন ধেঁয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত না আপনার বিরুদ্ধেই প্রজারা বিদ্রোহ করে বসে। এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে ভেবে চিন্তে অগ্রসর হতে হবে আমাদের। মহারাজ কৃতকর্মের সাজা ভোগ করছেন। একদিকে বৌদ্ধ বিহারগুলো ধ্বংস করে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন, অপরদিকে সেই বুদ্ধিস্টদের একজনকেই বানিয়েছেন তাদের গভর্ণর। দেখছেন না, কয়টি প্রদেশের গভর্ণর বুদ্ধিস্ট। সকলেই সুন্দর সোম্‌নির অনুসরণ করলে পরিস্থিতি সামাল দেয়াই কঠিন হয়ে পড়বে।'

'এখন শুধু নিরূন নিয়ে কথা বলো। আরব বাহিনী দেবল জয় করে সামনে অগ্রসর হলে নিরূনকে তাদের ঘাঁটি বানাবে।

বুদ্ধির সম্রাট বুদ্ধমান ডুবে গেলেন চিন্তার অথৈ সাগরে। রাজা দাহির বিড়বিড় করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা যেন শুনেও শুনছেন না বেচারা উজির।

রাজা দাহির যখন উজীরের সাথে মতবিনিময় করছিলেন তখন সুন্দর সোম্‌নি বহাল তবিয়তে সুস্থচিত্তে নিরূন পৌঁছলেন। তাকে পৌঁছে দিতে উজীর বুদ্ধমান ও তার দেহরক্ষী বাহিনী শহরতলীতে বিদায় দিয়ে আসলে আরব মুজাহিদরা তাকে বিস্ময়কর একটি প্রস্তাব শোনান। এই লোকের নাম ইবনে ইয়াসির। শাবান ছাকাফীর বিশেষ অফিসার তিনি। তিনি গভর্ণরকে আচমকা প্রশ্ন করেন–

'গভর্নর মশাই! মহারাজ-ই কি এখানে আপনাকে তলব করেছিলেন?' ইনি সিন্ধি ভাষা জানতেন।

'হ্যাঁ! তিনি মাঝে মধ্যে এভাবে তলব করেন।

'প্রতিবার কি আপনার সন্ধ্যার দিকে আসা হয় এবং ওই রাতেই বিদায় করে দেয়া হয়?' ইবনে ইয়াসিরের প্রশ্ন।

'না। আমার সাথে এই প্রথম এ ধরনের ব্যবহার। যে কোন গভর্ণর রাজধানীতে এলে তাদের অন্ততঃ দু'তিনদিন রাখা হয় এবং খুব আপ্যায়ন আদর চলে।'

'আপনি কি নিজেই রাতে চলে যাবার কথা বলেছিলেন?'

'না। রাজা দাহির নিজেই উজীরের কাছে বলেছিলেন, গভর্নর চলে যেতে চাচ্ছেন।

'আজ যেভাবে আপনাকে বিদায় জানানো হলো, প্রতিবারই এমন জানানো হয়েছে?'

'না!' গভর্ণর কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, 'আমি তো অবাক, কেন এত জামাই আদর? আমার মনে হয় রাজা আমাকে আপনাদের আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ অব্যাহতি দিতে চাচ্ছে, এজন্য এত কিছু।'

'কি জবাব দিলেন তাকে?'

'আমি সাফ জবাব দিয়েছি, যে ফয়সালা নিয়েছি তিলমাত্র তার থেকে পিছু হটব না। এও বলেছি, শহরের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ইজ্জত–আব্রুর গ্যারান্টি দিতে চাই।'

'তাহলে পথ পরিবর্তন করুন!'

'কেন? রাস্তা কেন বদলাতে যাব?

'পথিমধ্যে আপনার ওপর হামলা হবে। নিরূন পর্যন্ত আপনি জিন্দা পৌঁছুতে পারবেন না।

'আমার যা ধারণা রাজা দাহিরের বুকের পাটা এতদূর কুলাবে না। এটা আপনাদের ভ্রান্তি বিলাস।'

'নিরূনের গভর্নর! আমরা আপনাদের দেশের অজস্র প্রতারণার কথা শুনেছি। কিন্তু আপনি এখনও আরবদের দুরদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা জানতে পারেননি। আপনারা যখন কেল্লাভ্যন্তরে মতবিনিময় করছিলেন তখন আমরা কেল্লার চারপাশে টহল দিয়ে বেড়িয়েছি। একলোককে দেখলাম শাহী পোশাকে। শুনলাম সে রাজা দাহিরের চৌকস উজীর। রাতের বেলা আপনার বিদায়ের বেশ

পূর্বে একদল উষ্ট্র বাহিনীসহ তাকে কেল্লা ফটকে দেখলাম। উটের কাফেলা নিরূনের পথে চলছে। বেশ কিছু নারীও দেখলাম ওই কাফেলায়। এর পর একজনকে কানে কানে কিছু বলতে দেখলাম। উষ্ট্র বাহিনী চলে গেলে উজীর বের হলেন। এতে বুঝলাম নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র চলছে। পরে এই বাহিনীকে যখন আমাদের সাথে চলতে দেখলাম তখন সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হলো। এতগুলো প্রশ্ন সেই সন্দেহেরই ফসল। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, ওই কাফেলা যা-আমাদের আগে ভাগে চলে গেল, নিশ্চয় তাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে।' থামলেন ইবনে ইয়াসীর।

'আমি আপনার কথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করলাম। ব্যাপারটা আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যই করা হয়েছে। রাস্তা পরিবর্তন করুন।' বললেন গভর্ণর।

'রাস্তা তো আমাদের আপনিই চিনাবেন। আমরা সবাই এদেশে আগন্তুক।'

'রাস্তা অবশ্য আছে একটি। ওপথে গেলে আমরা জলদি নিরূন পৌঁছুতে পারব। তবে পথটা দুর্গম। পা পিছলানোর সম্ভাবনা আছে। কেননা বালু মাটির টিলা, ঘন ঝোঁপঝাড়ে পথটা ঠাসা। এরপর সামান্য পথই সমতল।

'যেমনই হোক, ওই পথেই যেতে হবে আমাদের।

এভাবে ইবনে ইয়াসীর গভর্নরকে ভিন্নপথে চালিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচালেন।

॥ চার ॥

বেশ কিছুদিন পর।

নিরূনবাসী গভীর রাতে জনৈকা নারীর হৃদয়ফাটা অর্তনাদ শুনতে পেল। বেশকিছু লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তবে কেউই জানতে পারল না, কে এই নারী। লোকেরা ছোটাছুটি করল; কিন্তু ওপর থেকে একটা আওয়াজ এলো, সকলে আসমানের দিকে তাকাও। শহুরে জনতা আকাশে তাকিয়ে দেখতে পেল, আঁধার রাতের বুক চিরে তিন/চারটি জলন্ত মশাল শহরের দিকে ছুটে আসছে।

এতে শহরের মানুষ চমকে গেল। অধিকাংশ লোক দরোজায় খিল এঁটে দিল।

গভর্ণর সোমনি ঘুম থেকে ধড়ফড়িয়ে ওঠলেন। বাইরে তিনি ওই মশাল তথা আগুনের গোলা দেখলেন। তিনি যেহেতু শহরকর্তা, সেহেতু ছোটাছুটি না করে শহরে চলে এলেন। অগ্নি দলাগুলো আকাশ ও শহরের মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পাশাপাশি শহরের হিন্দুমন্দির থেকে অনবতর ঘন্টা ও কাস্ধ্বনি ছুটে আসছিল। পুরোহিতরা শঙ্খ বাজানো শুরু করে দেন। এই ধ্বনির কারণে বিভীষিকা বহুলাংশেই বৃদ্ধি পায়।

এই ভয়ানক অগ্নিখেলা কয়েকঘন্টা জারি থাকল। হিন্দু রমণীরা উলুধ্বনি ও বৌদ্ধরা ঘর্মাক্ত ললাটে ত্রিপিটক পাঠে মগ্ন থাকে। সকলেই নেয়ে ঘেমে একাকার। সুন্দরের সাথে তার মোহাফেযও ছিল। তিনি তার বাসভবনে চলে গেলেন। তিনি দেখলেন তার মহলে আরবী দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে।

'হাকেমে নিরুন!' জনৈক আরবী মোহাফেয বললেন, 'আমাদের খোদা তার বান্দাদের এভাবে ডরান না।'

'দেখছ না, এ আপদ আসমান থেকে নামছে।'

'হাকেমে নিরুন!' অন্দরে চলুন।

সুন্দর ভেতরে প্রবেশ করতেই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি গোলাও গায়েব হয়ে গেল।

বেশকিছু লোক রাতের বেলায়ই মন্দিরের উদ্দেশে ছুটে গেল। বাদবাকীরা সকাল হতেই মন্দির চত্বরে সমবেত হলো। মন্দিরে ঘন্টা, কাস্ ও শঙ্খ বেজে চলছে অবিরাম ধারায়। মন্দিরের পুরোহিত প্রধান প্রশস্ত বেলকনিতে দন্ডায়মান। মন্দিরের ভেতরে ঠাকুর পূজারীরা হাতজোড় করে মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ানো। যারা মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি তারা বাইরেই হাতজোড় করে রাম-রাম জপছে।'

'সমবেত জনতা!' বুড়ো পুরোহিতের ইয়াবড় গোঁফের তল থেকে বেরিয়ে আসে এক পশলা শব্দ, 'এ শহরে বিশাল এক মুসিবত এগিয়ে আসছে। বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেশে এমন এক জাতি আসছে, দেবতাগণ যাদের পছন্দ করেন না। সমুদ্র পথে একটি তুফান আসছে। এরা আরব্য ফৌজ। এদের মোকাবিলায় তোমরা তৈরী হয়ে নাও। এই ম্লেচ্ছদের জন্য তোমরা শহরের দরোজা খুলে দিলে দেবতাগণ গোটা শহরকে জ্বালিয়ে দিবেন।

জনসাধারণ ভয়ে ভয়ে মন্দির চত্বর ত্যাগ করল। দিনরাত মাঠে-ময়দানে ও ঘরোয়া টেবিলে রহস্যময় অগ্নিগোলা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠল।

পরদিন রাতে আবারো সেই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ সকলকে হতচকিত করে দিল। আর্তনাদ ক্রমশঃ তীব্র হচ্ছিল। পর মুহূর্তে আগুনের দলা চক্রাকারে দূর আকাশে ঘুরছিল। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা গতরাতের মত দরোজায় খিল এঁটে দিল। ওদিকে মন্দির প্যাগোডায় ধুম পড়ে গেল ঘন্টা, কাসা ও শঙ্খধ্বনির।

ভয় ও বিভীষিকায় দুঃখের রাত্রী পোহাল। সকালবেলা লোকেরা আবারো মন্দিরে জড়ো হলো। মুহূর্তে মন্দিরের ঠাকুররা জানান, শহরে ম্লেচ্ছ জাতি আসছে। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেবতারা তাদের হুঁশিয়ার করছেন।

দিনের বেলা কাজ করতে গিয়েও মানুষেরা ওই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেল। ভয়ে আতঙ্কে জনবহুল শহরের অনেকটাই খালী হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করছিল কোলাহলমুখর বাড়ীগুলো। এসময় আগুনের পাশাপাশি পানির ফোয়ারাও আকাশে উঠছিল। লোকেরা কাজকর্ম ছেড়ে এবার দিনের বেলায় দরোজায় খিল আঁটলো। সদ্য প্রসূতি ও দুধপানকারিণী মায়েদের হুঁশ নেই। তারা কেবল লক্ষ্য করেন নারীকণ্ঠের আর্তনাদ কোত্থেকে আসে?' রাত এলো। সারাটা নিরুন সুপ্তির কোলে ঢুলুঢুলু। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, চিৎকারকারিণী নারী একজনই। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। রোজকার মত এরাতেও ওই রহস্যময় চিৎকার ও আগুন এক ঘন্টা ধরে বজায় থাকল।

পরদিন বড় পণ্ডিত তার দু'সহকর্মীসহ গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। বড় পন্ডিত সুন্দরকে বললেন, 'মহারাজ! আমরা তিনজন রাতে ঘুমাইনি। মন্দিরে পায়চারী করছিলাম। ডেকেছিলাম দু'অভিজ্ঞ জ্যোতিষি ও গণককে। তারা হিসাব কষে বলেছেন, এটা আমাদের দেবতাগণের ইশারা মাত্র। তাঁরা জীবন দিয়ে আমাদেরকে এই শহর রক্ষার্থে লড়াই করতে বলছেন। আমরা শুনেছি এ শহর আপনি নতুন এক ধর্ম মতাবলম্বীদের হাতে সোপর্দ করতে চাচ্ছেন। একটু চিন্তা করলে আপনিও এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন যে, কি করে ওই লোকদের হাতে ক্ষমতা ছাড়া যায়–যাদের ধর্ম কর্ম আমাদের ধর্মের বিলকুল উল্টা। মহারাজ! জনগণের ওপর রহম করুন। অনেক শহরবাসীই ঘরদোর ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'আমাকে ভাবতে দাও। একটু সময় চাই।' বললেন সুন্দর সোম্‌নি।

পণ্ডিত যাবার পর ইবনে ইয়াসীরকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ব্যক্ত করলেন তার কথা।

'তোমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে বললে কি করবে? আমি এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। বারবার শহরবাসীর কথা মনে পড়ছে। এসব লোকের শান্তি নিরাপত্তার জন্যই তো তোমাদের সালারের আনুগত্য কবুল করে নিলাম। দ্বিতীয় কারণ, আমার ধর্ম লড়াইয়ের অনুমতি দেয় না। এখন লোকদের উপর মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

'আপনি স্রেফ তিনদিন অপেক্ষা করুন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস এ সময়ের মধ্যেই আমি ওই বিপদকে খতম করতে পারব,' বললেন ইবনে ইয়াসীর।

'কি করে খতম করবেন? ওই শক্তিকে কি করে খতম করবেন যা কারো নযরেই পড়ে না?'

'স্রেফ তিনদিন নিরূনের হাকেম! শুধু তিন দিন।'

॥ পাঁচ ॥

সুন্দর সোম্‌নি ও মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার কাজেই নিযুক্ত হয়েছিলেন ইবনে ইয়াসীর। তিনি গভর্ণর হাউজ থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছ খানা-পানিসহ সালারে আলার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। এ সেই সময়ের কথা–যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান বেলায় ছিলেন এবং দেবল যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ইবনে ইয়াসীরের সামনে একশ' মাইলের অধিক দূরপাল্লার সফর। হাতে সময় মাত্র তিনদিন। তিনি গোয়েন্দা প্রধান শাবান ছাকাফীর কাছে যেতে চান ভৌতিক কাণ্ড নিরসনের ব্যাপারে। তিনি কিছুতেই একে দেবতাদের গযব মানতে প্রস্তুত নন। কেননা তিনি মুসলমান। আর মুসলিম জাতি দেবতা বলতে কিছু বিশ্বাস করে না।

দুপুরের কিছু পূর্বে তিনি নিরূন থেকে বের হন। মাঝরাত্রির মধ্যেই তিনি গন্তব্যে পৌঁছান। মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল যাত্রার প্রস্তুতিকল্পে দেবলের দিকে রওয়ানা হয়ে আসায় তার গন্তব্যপথ কিছুটা কম হয়। কেননা তিনি যেদিকে যাচ্ছেন

সেদিকেই এগিয়ে আসছে কাফেলা। ইবনে কাসিম সতর্ক হয়ে মার্চ করতেন। নতুন কোন এলাকা অতিক্রমণের আগেভাগেই গোয়েন্দাদের পাঠাতেন। কেল্লায় ফৌজ আছে বলে তারা এমন করতেন না। তবে দাহিরের গেরিলা বাহিনীর যে কোন সময় আত্মঘাতী হামলার ভয় ছিল, এ আশংকায় বিন কাসিমের কিছু বাহিনী রাতেই দেবল যাত্রা করেছিল। জঙ্গী দৃষ্টিকোণে এ এলাকাটি খুবই নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেহেতু শাবান ছাকাফী এ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এদল আগে রওয়ানা হয়ে আরমানবেলা থেকে বেশ কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করেছিল। আচমকা তারা একটি ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি শুনতে পান। শাবান তার কাফেলাকে থামতে বললেন। রাস্তার পাশে তারা ওঁৎ পেতে ঘোড়ার অপেক্ষায় থাকলেন।

ঘোড়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। নিকটবর্তী হতেই শাবান মাঝপথে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে তার লোকজন ঘোড় সওয়ারকে ঘিরে ধরল।

'কে?' প্রশ্ন শাবানের, 'কোথায় যাও?'

শাবান আরবীতে প্রশ্ন করেন। তার সাথে মাকরানের এক লোক ছিল। তিনি সিন্ধি ভাষায় এর অনুবাদ করেন। আমি ইবনে ইয়াসীর। ওস্তাদকে আমি ঠিকই চিনে ফেলেছি। আপনি এপথে কেন?' ইবনে ইয়াসীরের জিজ্ঞাসা।

'ফজরের নামাযের পরপরই মূল বাহিনী দেবল যাত্রা করবে। সুতরাং আমরা এ পথে কেন, সে প্রশ্নের উত্তর তোমার না জানার কথা নয়। আমরা অগ্রগামী বাহিনী। কিন্তু তুমি এখানে কেন? জরুরী কোন খবর?'

শাবানের এ প্রশ্নের জবাবে নিরূনের রহস্যময় নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ও আগুন-পানির লুকোচুরি খেলার পুরো কাহিনী বলে যান ইবনে ইয়াসীর।

'জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, এই ভেল্কিবাজির অর্থ কি? এক্ষণে কি করা আমাদের। দু'এক দিনের মধ্যে কিছু একটা করা না গেলে নিরূন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'এসো ইবনে ইয়াসীর।' শাবান তাকে বসালেন, 'বলছি, আগুনের ওই ভেল্কি কিভাবে দূর হবে?' শাবান পুরো ঘটনার তথ্য উদঘাটন ও সমাধান তাকে বলে দেন।

'আমাকে এখনি যেতে হবে।' ঝিমানো চোখে বলেন তিনি, 'ঘোড়াটা বদল করে দিন। পথিমধ্যে এটা বিশ্রাম পায়নি। এখন যেটা দেবেন সেটার অবস্থাও তথৈবচ হবে।'

'কিন্তু তোমারই যে বিশ্রাম দরকার। তুমি ঘোড়ার পিঠে শুয়ে গেলে আমাদের ইতিহাস ও জাতির ভাগ্যও সে সাথে শুয়ে যাবে। ইসলামের জন্য আমাদের সর্বাত্মক কোরবানী পেশ করতে হবে। যাও বন্ধু! আল্লাহ হাফেজ।'

ইবনে ইয়াসীর তাজাদম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যান। নির্জন রাত্রির নিশুতি প্রহর মরণজয়ী এক মুজাহিদের অশ্বখুরে প্রকম্পিত হলো। এক সময় দিগন্তে মিলিয়ে গেল তা।

পরদিন ইবনে ইয়াসীর নিরূনের বিশ্রামকক্ষে সঙ্গীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। তিনি পরামর্শের মাঝেই খাটে নেতিয়ে পড়লেন। দু'চোখে তার রাজ্যের ঘুম। ওর ঘোড়ার ঘাম ঝর ঝর করে পড়ছে।

মাঝরাত্রিতে আবার সেই নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। নারীটিকে বালিকাই মনে হলো। ইবনে ইয়াসীরের বিশ্রাম শেষ। তিনি সাথীদের নিয়ে উঠে পড়লেন। আর্তনাদের পাশাপাশি কান্নার করুণ রোল শোনা যাচ্ছে। বাতাসের পরতে পরতে তা গুমরে লীন হচ্ছে।

'এসো দোস্ত!' ইবনে ইয়াসীর সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ এই ভেল্কিবাজির রহস্যজাল আজ থেকে ছিন্ন হতে যাচ্ছে।

তার পাঁচজন সঙ্গী নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বেরোলেন। ওদিকে মন্দিরের ঘন্টা ও পুরোহিতদের কাস্ ও শঙ্খ বেজেই চলেছে। অগ্নিগোলা দূর অন্তরীক্ষে ঘুরে ফিরছে। শহরের কাউকেই বাইরে দেখা যাচ্ছে না। চাঁদ হাসছে তার কক্ষপথে।

অগ্নিগোলা ও চিৎকারের আওয়াজ অনুসরণ করে ইবনে ইয়াসীরের দল এগিয়ে চলছে। দিনের বেলা আগুনের পাশাপাশি পানির ফোঁয়ারাও উপচে উঠেছে।

ইবনে ইয়াসীর বৃহৎ মন্দিরের দিকে চলছেন। তিনি শাবান ছাকাফীর নির্দেশ সকলকে বলে চলেছেন। তারা যতই মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততই চিৎকার নিকটবর্তী মনে হচ্ছে।

এ আওয়াজ মন্দিরের ভেতর কিংবা বেলকনি থেকে ভেসে আসছে বলে তাদের ধারণা। ইবনে ইয়াসীর সাথীদের সাহস দিতে গিয়ে বলেন, এ আওয়াজ আর যাই হোক জিন কিংবা হিন্দু দেবীর নয়। মানুষের চিৎকার এটা। চিৎকারকারিণীকে আমাদের অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে।'

'ইবনে ইয়াসীর! তুমি অদৃশ্য শক্তির পিছু ধাওয়া করছ না তো? আমার কিন্তু ভয় লাগছে। আসমানের আগুনকে তুমি ফিরাতে পারবে কি?' বলল, সাথীদের একজন।

'তোমাদের কারো হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভয় থাকলে সূরা ফতেহা পড়ে নাও। কোরানের সামনে কোন অদৃশ্য শক্তি কিংবা আসমানী আগুন টিকতে পারে না। থাকতে পারে না হৃদয়ে কোন শংকা। তিনবার 'ইয়া কানাবুদু অইয়্যা কানাস তাঈন' পড়ে দম করে নাও,' বললেন ইবনে ইয়াসীর। সাথীরা এই দোয়া পড়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন।

॥ ছয় ॥

একটি প্রশস্ত গলিপথের মাথায় এসে দাঁড়ালেন ইবনে ইয়াসীররা। এর থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে মন্দির। চাঁদ কিছু উপরে উঠল। এর রূপালী কিরণমালা মন্দির চূড়ে এসে আছড়ে পড়েছে। এরা গলির মোড় থেকে দেখতে পেলেন জনৈকা কিশোরী বেলকনির সিঁড়ি দিয়ে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে। বেলকনি থেকে সে দ্রুত প্রধান ফটকের দিকে দৌড়ে এলো। ভেতর থেকে দু'লোক বেরোল। তারা কিশোরীকে চাংদোলা করে উঠিয়ে নিয়ে গেল। কিশোরী পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিচ্ছে। তার চিৎকার ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে গোটা শহরে আতংক ছড়াচ্ছে।

কিশোরী আবার চড়ছে সিঁড়িতে। মন্দির থেকে দু'লোক বেরোলে ইবনে ইয়াসীররা প্রকান্ড একটি বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। কিশোরী সিঁড়ি টপকাতে গিয়ে দু'তিন ধাপ যেতেই পা পিছলে পড়ল এবং নীচে গড়িয়ে গেল। ঠিক ওই সময় দূর আকাশে বিশাল অগ্নিকুন্ডলী ভেসে ওঠল। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে কোন সাহসী মানুষেরও নিজেকে রক্ষা করা অসম্ভব। অন্ধকারময় গভীর রজনী। নির্জন মন্দিরের পাদদেশ এসময় মর্ত্যের মানুষের পিলা চমকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্ত আল্লাহর পথের সৈনিক ছয় মুজাহিদ পাহাড়ের দৃঢ়তা, সমুদ্রের বিশালতা ও আকাশের উচ্চতা নিয়ে ইস্পাত কঠিন হৃদয়ে পরবর্তী কর্মকান্ডের প্রস্তুতি নিলেন।

কিশোরীর দেহবল্লরী সাক্ষ্য দিচ্ছে সে যুবতী নয়। ১২/১৪ বছরের উঠতি বয়সের। চিৎকার দিতে দিতে সে আবার উঠে সিঁড়ি টপকাতে থাকে। মন্দিরের ভেতরে গেলে তার চিৎকারে ভাটা পড়ে। পরে সে কাতরাতে থাকে। ঠিক এসময় আবারো অগ্নিকুণ্ডলি অদৃশ্য হয়ে যায়। নিরূনের রাত তখন বিলকুল নিস্তব্ধ। এসময় একে শহর নয়, মনে হতে থাকে সাক্ষাৎ কবরস্থান।

ওই দুই লোক আবার মন্দির থেকে বেরোল। তারা কিশোরীকে তুলে নিয়ে গেল ভেতরে। ইবনে ইয়াসীর মন্দিরের সামনে থেকে উপরে না উঠে ডান-বাম পার্শ্ব দিয়ে বাঁদুড়ের মত ঝুলে প্রাচীরের উপরে উঠলেন। প্রাচীর টপকে প্রধান ফটকের ভেতরে সকলে জড়ো হলেন। এটি সুরঙ্গের মত পথ। ভেতরে যাবার নির্দেশ দেয়া আছে দেয়ালের গায়ে। পাষাণ স্তম্ভগুলোয় টিম টিম করে কুপি জ্বলছে। অন্দরে শোনা যাচ্ছে দু'লোকের আলাপ। ইবনে ইয়াসীর কণ্ঠস্বর শুনে অগ্রসর হতে থাকেন।

তিনি সর্বাগ্রে। সামনে একটি প্রশস্ত কামরা। মেঝেতে দামী গালিচা বিছানো। মাঝে করিডোর। কামরার মাঝে উলঙ্গ নারীমূর্তি, দেয়ালে খোদাই করা আলিংগনরত নরনারীর উলংগ তৈলচিত্র। খুব সম্ভব এটা পুরোহিতগণের খাস কামরা, পূজা অর্চনার কক্ষ বোধহয় অন্য কোথাও। ওই কামরায় দপ দপ করে জ্বলছে মশাল। ওখানে চারজন মানুষ ও উত্থিত যৌবনা দু'যুবতী। তাদের চোখে মুখে কামনা বহ্নি। অর্ধবসনা এরা ওই চারজন পুরুষের কাছে ঘেঁষে বসা। জ্বলন্ত মশাল থেকে কেরোসিনের উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে। আর আছে বারো/তেরো বছরের এক কিশোরী। ওর চেহারা বিষণ্ন, রোগাটে। অসহায় দু'টি চোখ চারদিকে ঘুরে ফিরছে। বোঝা যাচ্ছে, একে কোথাও থেকে জবরদস্তিমূলক ধরে আনা হয়েছে। জনৈক পণ্ডিত ওই কিশোরীর মাথায় হাত রাখেন এবং মাথায় চুম্বন করেন-যেন তার মেয়ে।

'উত্থিত যৌবনা দু'যুবতীর একজন ওর চোখে পেয়ালা ছোঁয়ায়। পেয়ালায় কি তা বোঝার সাধ্যি নেই। কিশোরী ঢোক ঢোক করে তা গিলতে থাকে। পেয়ালা সাবাড় করার পর সে কাঁদতে থাকে। বলে, আমাকে ছেড়ে দাও! বাড়ী যেতে দাও।' বক্ষে হাত দিয়ে সে বলে, 'আমার ভেতরে আগুন লেগেছে।'

আলো যেহেতু খুব একটা বেশী ছিল না, সেহেতু ইবনে ইয়াসীররা এদের ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। বিশেষ করে কিশোরীটিকে তারা ঘিরে ছিলো সেহেতু তাকে না দেখাই স্বাভাবিক। ইবনে ইয়াসীর ইশারা করতেই তার সাথী

দরোজায় দাঁড়িয়ে নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিলেন। এর জবাবে ছ'আরব মুজাহিদ এমন জোরে আল্লাহ আকবর দিলেন যাতে মন্দিরের পাষাণ গাত্র কেঁপে উঠল। মন্দিরের কামরা বন্ধ ছিল। এর ভেতরের আগুনের কুন্ডলী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মুজাহিদগণ বিদ্যুৎ গতিতে ভেতরে ঢুকলেন। মন্দিরবাসী ভূত দেখার মত চমকে ওঠল। তাদের কারো মুখ থেকে কথা সরে না।

'সকলেই দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।' ইবনে ইয়াসীরের কড়া নির্দেশ।

তারা সকলে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এদের তিনজনকে পুরোহিত অনুমিত হল। চতুর্থজন অদ্ভুত আকৃতির দেখতে। দু'যুবতী এবং সেই কিশোরী। এক মুজাহিদকে ইবনে ইয়াসীর বললেন, তাদের গিয়ে বলো, আমি কিছু কথা বলতে চাই।' মুজাহিদ তরজমা শুরু করলেন।

কিশোরীটি দৌড়ে ইবনে ইয়াসীরের পায়ে এসে আছড়ে পড়ল। কান্নাজড়িত সুরে বললো, ওরা আমাকে বাসা থেকে জবরদস্তিমূলক ধরে এনেছে।'

'ওরা তোমাকে কি করতে বলে?' প্রশ্ন ইবনে ইয়াসীরের।

কিশোরী অদ্ভুত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা দু'হাত উঁচু করে বিশেষ ভঙ্গিমায় ঘোড়াল। কিশোরী মুর্ছা যাবার মত হেলতে দুলতে লাগল। সে ভয়ে চুপসে গেছে। লোকটাকে দেখতে ভয়াবহ। যেন জিনের বাদশাহ। চোখে বাঘের দ্বীপ্তি, দাঁতে দৈত্যের ছাপ, চুলে সিংহের ঢং। বিশাল দু'জোড়া গোঁফ তার ভৌতিক বিভীষিকাকে আরো ভয়াল করে তুলেছিল। দু'টি চোখ ছিল কোটরাগত, মাথায় জটসমেত টিকি। কানে দু'জোড়া কাষ্ঠের বালা। লম্বা কালো আলখেল্লা তার পরনে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একে কিছুতেই সাধু পুরুষ ভাবার জো নেই। ইবনে ইয়াসীর ঝুঁকে কিশোরীকে ওঠালেন। বললেন, কাউকে ভয় পাবার কিছ নেই। কিশোরীর মনে কিছুটা সাহস এলো। বললো, 'এই লোক আমাকে বসাত। একহাতে চুলের গোছা ধরে আরেক হাত মাথার ওপর ঘোরাত। বলতো, তাকাও আমার চোখের দিকে। মুহূর্তেই আমার দেহে জ্বলন ওঠত। আর সেটা এতই প্রচন্ড হত যাতে আমি এমনিতেই প্রচন্ড চিৎকার করতে বাধ্য হতাম। এসময় এই পুরোহিতরা আমাকে জোরপূর্বক হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোন নির্জন গলিতে রেখে আসত। তখন আমার এতটুকু মনে থাকত যে, মন্দিরের দিকেই ছুটছি। এতে জ্বলন কমে আসত। পরে ওরা আমাকে শরবত পান করাত। আমাকে আদর করত। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। ওই অদ্ভুত লোকটা আমাকে শেষ পর্যন্ত গিলেই খেয়ে ফেলবে।' থামল কিশোরী। ওর চোখ দিয়ে অশ্রু নামছে শ্রাবণ মেঘের মত।

ইবনে ইয়াসীর সাথীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'বন্ধুরা! শাবান আমাকে একথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভয় পাবে না। এটা এদেশের ভেল্কিবাজি, সম্মোহনীর কারসাজী, দিল-মন শক্ত রেখে ওই আগুনে পড়লে আগুন কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। শাবান বলেছিলেন, মুজাহিদে ইসলাম! তোমাদের কাছে জবরদস্ত তাবীজ আছে, যার সামনে কোন যাদু, মেসমেরিজম কিংবা ভেল্কিবাজি কাজে আসবে না। এই অদ্ভুত দর্শন ভৌতিক মানুষটা যাদুকর।

ইবনে ইয়াসীর একথা আরবীতে বলছিলেন। পন্ডিত ও যাদুকর এর কিছুই বুঝছিল না। এতে তার সাথীদের হিম্মৎ বেড়ে গেল। তিনি পণ্ডিত, যাদুকর ও যুবতীদের সামনে এসে মাথা ঝুঁকাতে বলল। তলোয়ার-ই তাদের এই কর্মকান্ডের পুরস্কার।

যাদুকর দু'হাত উঁচু করে বিড় বিড় করল। এতে বোঝা গেল, সে যাদু করতে চাইছে। ইবনে ইয়াসীর তলোয়ারের পিঠ দ্বারা লোকটার উত্থিত হাতে আঘাত করে তার মুখে প্রচন্ড ঘুষি দিলেন। সে পাশের দেয়ালে গিয়ে টক্কর খেল। তার সাথীরা লোকটাকে মেরে কাবু করে মুখ থুবড়ে ফেললেন। ইবনে ইয়াসীর তার শাহরগে তলোয়ার ঠেকালেন। 'তুমি কি যাদুকর? না সম্মোহনকারী? জলদি বলো, নইলে তলোয়ার আমার চুপ থাকবে না'। গর্জে ওঠেন তিনি।

সে মাথা হেলাল, যাতে বোঝা গেল সে প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়েছে। পণ্ডিতরা পৈতাধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। তাদের দৃষ্টি কৃপা ভিক্ষা চাইছিল। সিন্ধি ভাষী মুসলিম মুজাহিদকে বলা হলো, তাদের বলো, কাউকেই জিন্দা ছাড়া হবে না। তাদের লাশ শহরতলীতে বদ্ধ জলাশয়ে নিক্ষেপ করা হবে। শেষ পর্যন্ত বন্য শূকর–শৃগালে লাশ খেয়ে যাবে।'

দোভাষীর মাধ্যমে ইবনে ইয়াসীরের কথা বুঝে পন্ডিতদের মুর্ছা যাবার মত অবস্থা। তারা হাতজোড় করে দাঁড়াল। ইবনে ইয়াসীর সাথীদের আলাদা করে কানে কানে কিছু বললেন। সিন্ধিভাষী সাথী বললেন, পন্ডিতবর্গ বলছেন, তোমরা এ দু'যুবতীকে নিয়ে যাও। তোমাদের চাহিদা মত স্বর্ণ-রৌপ্য দেয়া হবে। বিনিময়ে আমাদের জীবন ভিক্ষা দাও।

ইবনে ইয়াসীর ভেল্কীবাজকে ভূতলে ফেলে দিলেন। সে ওয়াদা করেছিল কেন এ কর্ম করছে, কি করে করছে সবই জানাবে। তিনি বললেন, 'এখানে নয়। সকলেই নিরূন গভর্ণরের বাড়ীতে চলো। ওখানেই বলো, তুমি যাদুকর। কেন ও কি করে এ যাদু দেখাচ্ছ ওখানেই তা দেখাবে।

সকলকে সুন্দর সোমনির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রহস্যময় আগুনের রহস্যজাল উদঘাটনের কথা জানানো হলো।

॥ সাত ॥

সুদর সোমনির বাসভবন।

ইবনে ইয়াসীর কোথায় গেলেন, কি করলেন সবই বিস্তারিত জানালেন সুন্দরকে। কিশোরীর মুখেই সুন্দরকে অগ্নিকুন্ডলীর ভৌতিক কাহিনী শোনানো হলো।

এবার যাদুকর তার পরিচয় দিল। সে বলল, গোটা ভারতবর্ষে এ কাজ করার মত সর্বসাকুল্যে তিনজন আছে। আমি তাদের একজন। আরো বললো,

'আপনারা যে আগুন শহরের উপরে দেখেছেন তা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এটি কোন ক্ষতিকারক বস্তু নয়। এ কাজ শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্য। এটা

একপ্রকার ইন্দ্রজাল। এটা শিখতে মন ও দেহকে এমন কষ্টে ফেলতে হয়, অনেকের পক্ষেই যা সহ্য করা সম্ভব হয় না। এই আগুন কোন ব্যক্তি কিংবা কারো ঘর জ্বালাতে সক্ষম নয়। যমীন থেকে পানির ফোয়ারার মত যে অগ্নি গোলা আকাশে ওড়ে ওটা আসলে আগুন-ই নয়, বরং যাদুবিদ্যার কারিশ্‌মা মাত্র। এমনিভাবে যে পানি আপনারা দেখতে পেয়েছেন, তা ছুঁলেও দেখবেন হাত শুষ্ক থাকছে। ওই পানি আসলে কোন পানি-ই না।

'এই যাদু তুমি এখানে দেখাতে গেলে কেন?' প্রশ্ন গভর্ণরের।

'সম্পদের লোভে। মহারাজ দাহির তার অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর দ্বারা আমাকে একাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, নিরূনের জনতা ও গভর্ণরকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে। তিনি এক লোককে আমার সাথে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এই পন্ডিত মহোদয়গণকে বলেছিলেন, এই যাদুর পূর্ণ বিকাশ ঘটলে শহরে তারা যেন ভীতিজনক কথা বলে জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে উৎসাহ যোগায়। মহারাজ আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেয়ার ওয়াদা করেছেন সাত পুরুষেও যা খেয়ে শেষ করতে পারবেনা।' বললো যাদুকর।

'এই মাসুম কিশোরীকে তুমি জ্বালাতে থাকলে কেন?'

'এই কাজে ওই ধরনের বালিকারই প্রয়োজন, যেমন আয়না চালান দিতে তুলা রাশির লোকের দরকার। কিশোরীটি ওর মায়ের সাথে মন্দিরে এসেছিল। ওকে দেখামাত্রই পন্ডিতজীকে বলেছিলাম আমার কাজে এই মেয়েই লাগবে। মেয়েটি চলে গেল। জানি না সন্ধ্যার দিকে পন্ডিতজী একে কি করে ধরে আনল। মহারাজ! এটা আমাদের বিদ্যা। আপনাকে বোঝাতে পারব না, কি করে এর মাধ্যমে ওই কাজের বিকাশ সম্ভব। মানুষের মাধ্যম ছাড়া একাজের সফলতা সম্ভবই নয়। কোন খান্দানকে বিপর্যস্ত করতে এই কাজ করাই যথেষ্ট। যাদুকর যাদু বলে ওই খান্দানের মাথায় পাথরও বর্ষণ করতে পারে। সব কথা বুঝানো সম্ভব নয়। মহারাজ চাইলে করিয়ে দেখাতে পারি। আপনি ওই আগুন দেখতে চাইলে এই মুহূর্তে দেখাতে পারি। দেখাতে পারি পানির ফোয়ারা ছুটিয়েও।'

'যা দেখার আমরা দেখে নিয়েছি।' সুন্দর বললেন, 'তুমি এ শহর থেকে বেরিয়ে যাও। সোজা বাড়ী যাবে–আরোড় নয়।'

'গভর্ণর মশাই! তাকে এখনই যেতে বলবেন না। শহরবাসীকে চাক্ষুষ দেখাতে হবে যে, এ কোন আসমানী মুসিবত নয়। রাতে ঘোষণা করে দিন, কাল সকলে যেন খোলামাঠে জমায়েত হয় এবং তাদের সামনেই তথাকথিত দেবতা ভীতির ভোজবাজি তুলে ধরা হবে।' পরদিন গভর্ণরের নির্দেশ মত শহরবাসী খোলা ময়দানে জড়ো হলো।

সূর্যোদয়ের পরপরই শহরের ছোট ছোট বাচ্চারাও ওই ময়দানে এলো। এলেন গভর্ণর। তার সাথে এলো যাদুকর এবং ওই তিন পন্ডিতও। সুন্দরের নির্দেশে উঁচু আওয়াজধারী জনৈক লোক সামনে অগ্রসর হলো। তাকে কি বলতে হবে, সে কথা আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি সমবেত লোকদের বললেন, এই লোকটা যাদুকর। সাদাসিদা লোকদের ভয় দেখানোর জন্য এবং তাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করাবার জন্য ওই দুষ্কর্ম করেছে।' তিনি লোকদের

বললেন, ভয়ের কিছু নেই। যাদুকরকে বললেন তার যাদু দেখাতে। ওই কিশোরীকে ডাকা হলো। সমবেত জনতাকে ময়দানের মাঝখান খালী করতে বলা হলো, তারা বৃত্তের মত একটা জায়গা খালী করে দিল।

যাদুকর কিশোরীর মাথায় একটা হাত রাখল। অপর হাতটা তার মাথার ওপর ঘোরাল। কিশোরী তড়পাতে লাগল। সাথে সাথে প্রচণ্ড চিৎকার দিল। ওই মুহূর্তে মাঝ আকাশে প্রচণ্ড অগ্নিকুন্ডলী ভেসে ওঠল। সমবেত জনতা পেছনে সরে গেল। তাদেরকে বলা হলো, ভয়ের কিছু নেই।

যাদুকর এরপর দু'হাতই চক্রাকারে শূন্যে ঘোরাল এবং বিড়বিড় করল। অগ্নিকুন্ডলী অদৃশ্য হলো। এরপর আগুনের ফোয়ারা সকলের মাথার ওপর ঘুরতে লাগল। মনে হচ্ছে যমীন থেকে আগুন উথলে উঠছে। এই আগুনের উচ্চতা কমবেশী ২০ গজ।

ইবনে ইয়াসীর উঠে সমবেত জনতার কাতারে শামিল হলেন। প্রথমে তিনি ওই অগ্নি ফোয়ারার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন। আগুন তার একটি চুলেরও ক্ষতি করতে পারল না। তিনি বললেন, আগুন তার কাছে গরম নয়, ঠান্ডা মনে হয়েছে। কিশোরী চিৎকার দিয়ে চলেছে। তার বাবা মা এ সময় দৌড়ে আসে। যাদুকর তাদের বারণ করে রাখতে পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটির চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। সে ভূতলে লুটিয়ে পড়ল। এসময় আগুন পুরোপুরি নিভে গেল।

সমবেত জনতাকে আরেক বার বলা হলো, তাদেরকে কেন ও কিভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে? ওই যাদুকরকে নিরূন থেকে বহিষ্কার করা হলো। পুরোহিতদের বলা হলো, পন্ডিতজী মহারাজ! যে ধর্মমতাবলম্বীরা যাদুর আশ্রয় নেয় তাদের ধর্ম মনে কেবল ঘৃণা-ই জন্মায়। যাও তোমাদেরকে এবারের মত ক্ষমা করে দেয়া হলো। এ কথা সুন্দর সোম্‌নির।

॥ আট ॥

৭১২ খ্রীস্টাব্দ (৯২ হিজরী)-এর জুমুআর দিন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের বাহিনী দেব্‌লের সীমান্তে এসে দাঁড়াল।

শাবান ছাকাফী আগে ভাগেই রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। রাস্তা পরিষ্কার। রাজা দাহিরের একজন সৈন্যকেও পথে নযরে পড়েনি। এভাবে মুসলিম বাহিনী দ্রুত-ই দেবলে এসে পৌঁছুল।

আসলেই দাহিরের একটা লোকও বাইরে ছিল না। কেননা তাদের সকলকেই কিল্লায় অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়। দাহির কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে বলে ছিলেন, কেউ যেন বাইরে এসে হামলা না করে। হিন্দু রাজা জানতেন, সম্মুখ সমরে কাইসার ও কিসরার প্রাসাদে ইসলামী পতাকা উড্ডীনকারী অজেয় মুসলিম বাহিনীর সাথে পেরে ওঠা যাবে না।

আরমানবেলা থাকতেই ইবনে কাসিম হাজ্জাজকে পয়গাম পেশ করে বলেছিলেন, অমুক দিন আমরা দেবল সীমান্তে পৌঁছাচ্ছি। হাজ্জাজও তাকে

আগেভাগে বলেছিলেন, আমার নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই শুরু করো না। নিরেট আঁধার কিংবা গেরিলা আক্রমণের সম্মুখে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে না।

জুমুআর কিছু পূর্বে বিন কাসিম দেবলে পা রাখেন। সেনাপতির নির্দেশে বুলন্দ আওয়াজধারী জনৈক মুজাহিদ আযান দেন। দেবলে এই প্রথম ইসলামের আযান। নামাযের সময় মুজাহিদবৃন্দ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। ওইযুগের নিয়ম মোতাবেক সেনাপতিরই ইমামতী করার কথা। ইসলামী ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোন কনিষ্ঠ সালার এই প্রথম খুৎবা দিলেন। খুৎবায় তিনি ওয়াজ করলেন ঃ

'আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করো, এই নামায এদেশে আমাদের শেষ নামায নয়। দোয়া করো তিনি যেন আমাদের রুকু-সেজদা কবুল করেন। তিনিই আমাদের মাধ্যমে কাইসার ও কিসরার গগন চুমো প্রাসাদে ধস নামিয়ে ছিলেন। মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ আমাদের পদতলে পিষ্ট হয়েছিল। আজো তা আমাদের ভয়ে কেঁপে থাকে। রোম ইরানের প্রবল শক্তিধর হাতগুলো কর্তনকারী বক্তিত্বদের স্মরণ করো। রোম-ইরান ছিল মহাশক্তিধর। আজ দেখ ওদের সীমানা সংকুচিত হতে হতে কোথায় পৌঁছেছে! ওই বিচ্ছুদের বিষদাঁত কারা ভেঙ্গেছিল? তোমাদের মত মুজাহিদবৃন্দই তো নাকি---। আর আজ এক নপুংষক রাজা আমাদেরকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। কায়সারে রোমের সামনে ওকি? পারস্যদের তুলনায় সে ভেড়ার মতও নয়। কসম খোদার! আমি অহংকার করছি না। তোমরা তো তাদের পুত্র, তাদের নাতি, যাঁরা ছিলেন আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন ও ঈমান একীনে বলীয়ান।

তোমাদের কাছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পয়গাম পৌঁছাচ্ছি, তিনি হার লমহা জিকির করতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে মদদ ও বিজয়কামী হতে বলেছেন। সময় পেলে লা হাওলা জপতে নির্দেশ দিয়েছেন। এসো সকলে অঙ্গীকার করি। আগামী জুমুআর খোৎবা আমরা দেবলের মাটিতে পড়ব।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম দেবল-কেল্লার কিছুদূরে তাঁবু গাড়লেন। আশে আশে খুঁড়লেন খন্দক। ১২গজ চওড়া ও ছ'গজ গভীরতা। হাজ্জাজ তার ফরমানে লিখেছিলেন, যারা কুরআন তেলাওয়াত করতে জানে, তারা তেলাওয়াত করতেই থাকবে। কেল্লার আশে পাশে একদল যেন টহল দিতেই থাকে।

বিন কাসিম হাজ্জাজের নির্দেশমত এই আমল শুরু করে দিলেন। প্রতিরাতেই তাঁবু থেকে কুরআনুল কারীমের মধুশ্রাবী আওয়াজ ভেসে আসত। সিন্ধুর আকাশে বাতাসে তা গুঞ্জন করে ফিরত। এর পাশাপাশি সালারে আলাসহ অন্যান্যরা নফলে লিপ্ত থাকত। গোটা রাত ছাউনি থাকত মশালে মশালে ঝলমলে। এরা দূর-দূরান্তে জালিমের জিন্দানখানা থেকে মাসুম নারী শিশুদের উদ্ধারে এসেছে। তারা বলতে চায়–হে দুনিয়া! তুমি দেখ, মুসলমান দমবার পাত্র নয়। জালিমের রক্তচক্ষু ও যুদ্ধের প্রাথমিক বিপর্যয়ে তারা খেই খাবার দল নয়।

ওই সময়ে দেবলের ভেতর থেকে দু'একবার হামলা হত। কিন্তু খন্দকের ভেতরে তারা আসত না। হিন্দুদের এরা তীরন্দাজ বাহিনী। সালারের নির্দেশ ছিল, কেউ যেন জবাবী হামলা না করে। কিন্তু তীরন্দাজ বাহিনীকে পিছু হটানোর জন্য

তীর নিক্ষেপ করা ছিল জরুরী। হাজাজ্জের কথা ছিল, বিক্ষিপ্ত হামলার পেছনে পড়ে খামোখা বাহিনী খরচ না করা। দুশমন চাচ্ছিল, মুসলিম বাহিনীকে কেল্লার বাইরেই নাস্তানাবুদ করতে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার পর তাঁবুতেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ পর্যন্ত একদিন বসরা থেকে দেবল অবরোধের নির্দেশ এলো। সাথে সাথে কেল্লা দখলের জন্য যে পরিমাণ কুরবানী দরকার তাও করার নির্দেশ দেয়া হলো।

বিন কাসিম এই নির্দেশের আশায় পথ চেয়ে ছিলেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই দেবল অবরোধ করার হুকুম দিলেন। কেল্লা ফটক থেকে ছাউনি পরিষ্কার দেখা যেত। সুতরাং তাঁবু গুটানো সম্ভব ছিল না। সূর্যাস্তের পরপরই ছাউনিতে স্পন্দন দেখা দিল। খন্দক যেদিক খোঁদা হয়নি বাহিনী সেদিকে মার্চ করল। এই উদ্দেশেই সামান্য স্থান এভাবেই রাখা হয়েছিল।

মুসলিম বাহিনীর যারা-ই ওই স্থান ত্যাগ করত তারা সালাবের নির্দেশ মোতাবেক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ স্থানে ছড়িয়ে থাকত। মধ্য রাত্রীর মধ্যেই অবরোধ সুসম্পন্ন হলো। মিনজানিক (কামান) এমন স্থানে বসানো হলো, যেখান থেকে কেল্লার ফটকে ও ভেতরে আঘাত করা যায়।

পরদিন সকালে ভেতরের হিন্দু সেনাদলের ভ্রাম্যমান বাহিনী ঘোষণা করল, কেল্লা অবরুদ্ধ। এ ঘোষণায় শহরের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। তীরন্দাজরা দেয়ালে চড়ল। তাদের সাথে বর্শাধারীও ওঠল। বাকী যারা রয়ে গেল তারাও লড়াই করতে প্রস্তুত হলো।

বিন কাসিম কেল্লার আশেপাশে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি কেল্লা প্রাচীরের স্পর্শকাতর জায়গা ঘুরে দেখছিলেন। তিনি একটি ফাঁক-ফোকড়ও দেখতে পেলেন না, এমনকি কেল্লার আশেপাশে কোন খন্দকও নেই। এর দ্বারা একটা কথা অনুধাবন করা গেল, কেল্লাটি নেহায়েত মযবুত। ব্যাপারটা বিন কাসিমের কাছেও যে ধরা পড়েনি তা কিন্তু নয়। এর দেয়াল পিলার নয়, ঢালাই দিয়ে গড়া। এ ধরনের দেয়াল দুর্ভেদ্য। আক্রমণকারীরা এর পাদদেশে পৌঁছুলে উপর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় এবং তীর মারা যায়। এ ধরনের দেয়াল থেকে সুড়ঙ্গ বের করাও চাট্টিখানি কথা নয়।

ইবনে কাসিম ছোট কামান দ্বারা শহরের মাঝে পাথর বর্ষণ করতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে শহরে পাথর বর্ষণ শুরু হলো। কেল্লার তীরন্দায বাহিনী শহরে পাথর নিক্ষেপণে শিউরে উঠে কামান লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া আরম্ভ করল। এতে ক'জন কামানবাহী যখম হলো। বাধ্য হলো কামান পেছনে নিতে। এবার পাথর মারলে তা আর শহরে যায় না। কেননা দূরত্ব তখন অনেকখানি।

হিন্দুরা বীরত্বের সাথে দু'একটা ফটক খুলে আচমকা বের হত এবং হামলা করে কেল্লার ভেতরে গায়েব হয়ে যেত। এই হামলা চালিয়ে তারা দেখল, লড়াই-এ খুব একটা যুৎ করা যাচ্ছে না বরং ক্ষতি হচ্ছে তাদের। অবশ্য মুসলিম ফৌজেরও সামান্য ক্ষতি তারা করতে পারছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম অধীনস্থ সালারদের বললেন, এমন কিছু জানবায সিপাহী নির্বাচন কর, যারা কেল্লার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করবে। আর সেটা সম্ভব হবে

যখন ওরা ফটক খুলে বেরোবে। এটা পরীক্ষা করে তেমন কোন কার্যকারিতা চোখে পড়ল না। কেল্লার দরোজা মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেত। হিন্দুরা বেরিয়ে হামলা করলেও তারা দরোজা রক্ষণাবেক্ষণের দিকে পূর্ণ সজাগ থাকত।

এই সংঘর্ষ ক'দিন ধরে চলতে থাকল। রাতের বেলা কিছু জানবায প্রাচীরের পাদদেশে পাঠানো হলো। তাদের কাছে প্রাচীর খোদার যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু তারা যখমী কিংবা শাহাদতবরণ ছাড়া আর কিছু অর্জন করতে পারল না। রাতের হিন্দু বাহিনী ছিল নেহাত চৌকস। তারা প্রাচীরের উপর থেকে যেমন তীর মারত, তেমনি অগ্নিগোলাও নিক্ষেপ করত।

অতঃপর আরেকটি পন্থা পরীক্ষা করা হোল। কামানবহর আগে নেয়া হলো। এর সাথে রাখা হোল অসংখ্য তীরন্দায। এরা প্রাচীরের হিন্দু তীরন্দাযদের উপর বৃষ্টির মত তীর মারত। এভাবে কামান থেকে শহরে পাথর মারা পুনরায় শুরু হলো।

ওদিকে পাথরের ভয়ে শহরবাসী দিশেহারা। কিন্তু নগররক্ষা বাহিনী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জনগণকে অভয়বাণী শোনাতে লাগল। শহরের সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম দেবল। এর নামেই ওই শহরের নাম। ওটা বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এর ছিল কিছু চূড়া। একটির উচ্চতা ১২০ ফুট। এতে লম্বা বাঁশের ওপর গেরুয়া পতাকা ওড়ত।

ওই পতাকা সম্পর্কে বহু মুখরোচক কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে, দূর-দরাজের পর্যটক ওটি দেখলে তাদের পর্যটন সহজ হত। হিন্দু বিশ্বাস মতে, জনৈক দেবতার হাতে এটির গোড়াপত্তন। এই শহরের ওপর যে কেউ হামলা করতে আসবে, সে-ই পরাজিত হতে বাধ্য। তার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে নুবহান ও বুদায়েল ইবনে তোহফা এই দেবল আক্রমণ করতে গিয়েই শহীদ হয়েছেন। তাদের বাহিনীও নাস্তানাবুদ হয়েছে। এজন্যে হিন্দুদের আরো দৃঢ়মূল বিশ্বাস জন্মে যে, দেবল অজেয়। খোদ দেবতা-ই এর হেফাযত করছেন।

ইবনে কাসিম হিন্দুদের এই বিশ্বাস কাহিনী জানতেন না। তিনি একে নিছক পূজা-অর্চনার মন্দিরই ঠাওরাতেন।

হিন্দুরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল প্রাচীর রক্ষা করতে। যমীন থেকে প্রাচীর বেশ ক'গজ উপড়ে। উপরে ক্রমান্বয়ে এটি ছোট। যেন পিরামিড।

বেশ ক'দিন প্রতিরোধ করার পর হিন্দু বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল।

'যেদিক থেকে এসেছ, সেদিকেই চলে যাও বাছাধনরা।' প্রাচীর থেকে এধরনের আওয়াজ শোনা যেত।

'মনে করো ওই সব সালারের কথা যারা ইতিপূর্বে এখানে এসে মরেছে।'

'এটা দেবতাদের শহর। তাদের রাগ-গোসসা এড়িয়ে চল।'

বারংবার এই গুঞ্জন কানে ভাসত,মুসলমানেরা এসব গাঁজাখোরী উড়ো কথায় কান দিত না। কিন্তু তারা ধারণা করে, দুর্ভেদ্য এই কেল্লা জয় করতে অসংখ্য জান কুরবানী দিতে হবে।'

॥ নয় ॥

গভীর রাত।

নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশ।

কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই।

যুদ্ধাহতদের কাতরানোর শব্দ সেই নিস্তব্ধতায় খানিক ভাটা ফেলত। পরে তারা খামোশ হলে আবার সেই নিস্তব্ধ পরিবেশ। ওই যুগের নিয়ম মাফিক পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসাররা বৌ-বাচ্চাদের সঙ্গে আনতেন। নারীরা খিমায় থাকতেন। আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। দিনের বেলা মুজাহিদরা তাদের কোন মতে নারী শিবিরে পৌঁছে দিতেন।

বিন কাসিম সালারদের একত্রিত করে কেল্লা দখলের পরামর্শ করলেন। সালারে আলার জনৈক দেহরক্ষী ওখানে প্রবেশ করে বললেন, একটি টিকটিকি ধরা পড়েছে। কেল্লার পাদদেশে সে ঘোরাফেরা করছিল। তাকে গ্রেফতার করা হলে সে বললো, সালারের সাথে দেখা করবে। বেটাকে গোয়েন্দা গোয়েন্দা লাগছে। সালার তাকে ডেকে পাঠানোর পাশাপাশি দোভাষীকেও ডাকলেন।

খিমায় পণ্ডিতবেশী এক লোক প্রবেশ করলেন।

'বলো,এখানে ঘুরঘুর করছিলে কেন?' দোভাষীর মাধ্যমে ইবনে কাসিম প্রশ্ন করেন।

'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।' পন্ডিতবেশী আরবীতে বললেন। 'আমিতো আরব। সর্দার হারেস আলাফী আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

'কিন্তু এই ছদ্মবেশে কেন?'

'কেননা, আমি দিনের বেলা সফর করছিলাম। এখানে আসতেই হত আমাকে। হিন্দুরা আমাকে চিনে ফেললে দাহিরের কানে খবর যেতে দেরী হতনা খুব একটা। সেমতাবস্থায় আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত।'

'কোন খবর নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ সালারে আলা! মন্দিরের ওপর যে পতাকা ওড়ছে, যে কোন মূল্যে ওটি ভূ-লুণ্ঠিত করার কথা বলেছেন সর্দার আলাফী। শোনা গেছে আপনার কাছে বিশাল কামান রয়েছে এবং ওটির দ্বারা ওই পর্যন্ত পাথর পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু চূড়া এতটা কমযোর নয় যে, দু'একটা পাথরে তা ভেঙ্গে যাবে। অনবরত পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। আমার যিম্মা আমি পালন করলাম। খোদা আপনাকে বিজয় নসীব করুন। আমাকে দ্রুত ফিরতে হবে। ওই ঝান্ডা উড়িয়ে দিতে পারলে দেবল আপনার।' এই বলে পন্ডিতবেশী লোকটা বেরিয়ে গেলেন।

'সিন্ধুর ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে 'চাচনামার' বরাতে লেখা আছে, জনৈক ব্রাহ্মণ বাইরে এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বললেন, মন্দিরের চূড়ায় পাথর মেরে যান, ঝান্ডা ভূপাতিত করুন। ওটাই এই কেল্লাঘেরা শহরের রহস্য।'

কিন্তু এই ইতিহাসের প্রতি সন্দেহ আছে। কেননা, ব্রাহ্মণ হচ্ছে হিন্দুধর্মের গুরু। সে কিছুতেই ধর্মালয়ে আক্রমণের রহস্যজাল উন্মোচন করতে পারে না। বিশেষ করে এটিই যখন জয়-পরাজয়ের ভিত্তি। তাই আমাদের মানতে হবে, হারেস আলাফীর নির্দেশেই ইবনে কাসিম ওই কাজ করেছিলেন। হিন্দুরা হয়ত বলবে, এই দেশ জয়ের পেছনে একজন কুলাঙ্গার ব্রাহ্মণের অবদান রয়েছে। এজন্যই হয়ত ইতিহাস বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে তারা।

॥ দশ ॥

পরদিন।

সকাল বেলা জু'না সালামাকে ইবনে কাসিম ডেকে পাঠালেন। ইনি কামান বিশেষজ্ঞ। তার লক্ষ্যভেদ ছিল অব্যর্থ। সালারের নির্দেশে তিনি তৎক্ষণাৎ হাযির হন। ইবনে কাসিমের তর্জনী পৌত্তলিকতার আশা-ভরসার স্থল সুউচ্চ চূড়ার দিকে।

'জু'না সালামা!' তিনি বললেন, 'মন্দিরের ওপরের ওই যে ঝান্ডা দেখছ না? ভূপাতিত করতে হবে ওটা। ওটি ভূপাতিত করার আগে চূড়া মিসমার করতে হবে। জানি, পাথরাঘাতেই ওটি ভূপাতিত করা যাবে, কিন্তু তুমি ওই পর্যন্ত পাথর নিতে পারবে কি-না সেটাই আমার জানার বিষয়।

আরূস নামী বিশাল কামানটি পাঁচশ' লোকে টেনে আনতে হত। জু'না সালামা একাকীই এটি দিয়ে পাথর মারতেন। তিনি ছিলেন সিরীয়।

'সালারে আলা দীর্ঘজীবী হোন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ আমাদের মদদগার। আমিই পাথরে পাথরে ওটি ভূপাতিত করব। একটা পাথরও অব্যর্থ হবে না।'

'ওটি ভূপাতিত করতে পারলে তোমাকে দশ হাজার দেরহাম এনাম দেব।' বললেন সালারে আলা।

মাত্র তিনটি পাথর দ্বারা ওই মন্দির চূড়া ভাংতে না পারলে সালারে আলা আমার হস্ত কর্তন করে ফেলবেন।

'কসম খোদার! তোমার মত মুজাহিদের-ই দরকার আমার। তিন পাথর শর্ত নয়। চূড়া ভাঙ্গো, ঝান্ডা ফেলো, পুরস্কার নাও।'

বৃহৎ কামান সালারের হুকুমে পূর্বদিকে নিয়ে যাওয়া হলো। কেননা, তখন সবেমাত্র সূর্য উঠছে। ওপাশ দিয়ে মন্দির চূড়া পরিষ্কার দেখা যায়। প্রকান্ড পাথর জমায়েত করা হয়েছে। বীর সালামা বিসমিল্লাহ পড়লেন। কামানের লক্ষ্যভেদ ঠিক করলেন। দূরত্ব আঁচ করলেন। এরপর যমীন কিছু খুঁড়ে ওটি সামান্য পেছনে নিলেন। কামানের পেছন নিচু হলো। সামনের অংশ উঁচু হলো। ওই পদ্ধতিতে পাথর সজোরে বর্ষণ করা যায়।

গত সন্ধ্যার ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী হিন্দু তীরন্দাযরা হয়ত ভাবতেও পারেনি যে, এই কামান ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

পয়লা পাথর কামানের ভিতরে চাপানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশ' মুজাহিদ সজোরে দড়ি টান দিলেন। নিক্ষিপ্ত পাথর মূল নিশানায় আঘাত হানল। প্রচন্ড সংঘর্ষের আওয়াজ গোটা শহরকে চমকে দিল। মুজাহিদরা দিলেন নারায়ে তাকবীর।

বীর সালামা দ্বিতীয় পাথর রাখলেন কামানে। এই পাথর কামানের মুখ থেকে বেরোলে তিনি বললেন, চূড়া স্থির থাকতে পারবে না এবার।' পাথর নিশানায় আঘাত হানল। পাথর চূড়া ফুটো করে সামনে গিয়ে পড়ল। এতে ঝান্ডা হেলে পড়ল।

তৃতীয় পাথর নিক্ষেপণের পূর্বে বীর জু'না সালামা কামানের পজিশন সামান্য বদলান। এবার তিনি বললেন, ঝান্ডা এবার মাটিতে পড়বেই। বিগত দু'পাথরের আঘাতে বিধ্বস্ত চূড়ার একাংশ অবশিষ্ট ছিল যাতে কোন রকমে ঝান্ডা লাগানো ছিল। এবার চূড়ার ওই অংশও উড়ে গেল। পাথরটি মন্দিরের ভেতরেই পতিত হল ঝান্ডাসহ। বাঁশ ভগ্ন চূড়ার সাথে মুখ থুবড়ে পড়ল। চূড়া ও বাঁশ দেবতাদের অসহায়ত্ব প্রকাশপূর্বক ভূতলে আছড়ে পড়ল।

বজ্রনিনাদে বীর আরববাহিনী নারা দিলেন।

॥ এগার ॥

মন্দির চূড়ায় পয়লা পাথরের শব্দে শহরের লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সকলেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় পাথর বর্ষণ হলে ভেতরে যে পুরোহিত পন্ডিতেরা পূজা-অর্চনায় লেগেছিলেন, তারা চমকে ওঠলেন। তৃতীয় পাথরে ঝান্ডা ভূপাতিত হলে তাদের হতাশা চরমে রূপ নিল। এটা সাক্ষাৎ মহাপ্রলয়। মহিলারা আতঙ্কে ক্রন্দন ও চিৎকার করতে লাগল। শহরবাসী প্রবেশদ্বার খুলে দিল। ফৌজসহ তারা পঙ্গপালের মত বাইরে বেরিয়ে এলো। তারা এক্ষণে চূড়ান্ত লড়াই-এ নামল। মুজাহিদবৃন্দ এ পরিস্থিতিরি জন্য প্রস্তুতি নিয়েই ছিলেন। ওরা পাগলের মত ছুটে আসছে। কোন শৃঙ্খলা নেই। মুজাহিদবৃন্দ সামান্য পিছু হটে লড়াই শুরু করলেন। ভয়ে হিন্দুরা আবার কেল্লায় আশ্রয় নিল। সাথে সাথে কেল্লাফটক বন্ধ হয়ে গেল।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সমস্ত কামান দ্বারা শহরে পাথর বর্ষণ করতে বললেন। প্রাচীরের ওপরে একজন তীরন্দাযও নেই। ঝান্ডা ভূপাতিত হওয়ায় সকলের মনোবল কমে গেছে। মুসলিম বাহিনী এবার কেল্লার প্রাচীরে উঠতে লাগল। সাদী ইবনে খুযায়মা সর্বপ্রথম, আজল ইবনে আব্দুল মালিক এরপর কেল্লায় চড়লেন। তারা প্রধান ফটক খুলে দিলেন।

'তোমরা সর্বাগ্রে আরব বন্দীদের দিকে খেয়াল করো। ওরা কেল্লায় থাকলে হিন্দুরা সকলকে হত্যা করে ফেলবে।' বললেন ইবনে কাসিম।

অল্প আয়াসেই দেবল করতলগত হল। দেবলের অলিতেগলিতে মুসলিম ফৌজ ছড়িয়ে পড়ল।

শহরের হিন্দুরা গতকালও মুসলিম সৈন্যদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে।

আর আজ! মুসলিম সৈন্য বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করলেও তারা ছিল শান্ত, সংযত। কোন উচ্ছৃংখলতা বা প্রতিহিংসা ছিল না তাদের আচরণে।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম দেহরক্ষী বাহিনীসহ কয়েদখানার দিকে ঘোড়া ছুটালেন।

ধন্য তুমি আরব জননী

॥ এক ॥

দেহরক্ষী দলসহ কয়েদখানার দিকে এগিয়ে চলেছেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। কেল্লার এক লোক রয়েছে তাদের সাথে পথ-প্রদর্শক হিসাবে। তাঁর ঘোড়া সকলের সামনে।

ওই সময় বিশ্ব ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ সেনাপতি খুব দ্রুততার সাথে চলছিলেন। কয়েদী উদ্ধারেই তার এই অভিযান। এজন্যে সর্বাগ্রে তিনি কয়েদখানায় যেতে চাচ্ছিলেন।

এদিকে কয়েদখানায়ও গোটা শহরের মত হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েদখানার চারপাশে কারারক্ষীদের মাঁচা বানানো ছিল। কয়েদীরা পাগলের মত দৌড়া-দৌড়ি করছিল।

লাল দালানের প্রধান ফটক খুলে দেয়া হলো। কারাপ্রধান তখনও জানতে পারেননি মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করেছে কি-না। কয়েদীরাও সকলে ভয়ে ছিল, মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই তাদের হত্যা করে ফেলা হয় কি-না। যে কোন সকালকে তারা জীবনের শেষ সকাল মনে করত। প্রতিদিন তারা মরত, আবার জিন্দা হত। তারা অবশ্য এতটুকু জানতে পারল যে, আরব বাহিনী শহর অবরোধ করেছে। এবাদত তারা আগেও করত। একাজেই তারা সর্বদা লিপ্ত থাকত। কিন্তু অবরোধের কথা শুনে সকলে আরো এবাদতে মশগুল হলো।

ইসলামী দস্তুর মোতাবেক তারা একজনকে আমীর বানাল। নাম তার আমর ইবনে আওয়ানা। সিরীয় বংশোদ্ভূত। যে দিন সকালে গোটা শহরে হুলস্থূল পড়ে গেল, সেদিন তিনি সঙ্গীদের উদ্দেশে আখেরী বয়ান রাখলেন।

'আজ চূড়ান্ত ফয়সালা হবে, আমরা ছাড়া পাচ্ছি, না মারা যাচ্ছি। দোয়া করো, কারারক্ষীদের দিমাগ খারাপ হবার পূর্বে যেন আরব সৈন্যরা এসে পৌঁছুয়। কারারক্ষীরা তোমাদের বাইরে নিতে চাইলে তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে নেবে। মরতে যখন হবে, তখন লড়েই মরবে। সকলকে একসাথে বের করতে চাইলে একযোগে হামলা চালাব আমরা। প্রতি মুহূর্তে যবানে আল্লাহর নাম রেখো।'

কয়েদী নেতা কনডেম সেল-এ কান লাগিয়ে থাকতেন। তিনি কোন ইশারা করলে সকলের কান সচকিত হয়ে ওঠত। সকলে লাব্বায়েক বলে ওঠত। নারীরাও লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়েছিল।

কয়েদখানার সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। সিঁড়ির পার্শ্বের কামরা থেকে আওয়াজ এলো, 'হুঁশিয়ার! দরোজা খুলতেই ভেতরে ঢুকে যাবে।' কণ্ঠটি আরবের কোন লোকের।

কয়েদীরা উৎকণ্ঠ হলো। কয়েদখানায় পিন পতন নিস্তব্ধতা। ভারী বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

তারা দেখল জেল সুপার কুবলা এগিয়ে আসছে। সে ছিল বুদ্ধিস্ট। হাতে চাবির গোছা। পেছনে কয়েদখানার কোন সান্ত্রী নেই। তার বদলে রয়েছে আরবের ফৌজ।

'কসম খোদার! তোমরা আরব।' জনৈক কয়েদী বলে ওঠে, 'তোমাদের বদন থেকে আরবের খোশবু পাচ্ছি।'

মুহূর্তে কয়েদখানার পরিবেশ পাল্টে গেল। কয়েদীরা মুজাহিদদের গলে গলা মেলাচ্ছিল। এঁরা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের দেহরক্ষী বাহিনী। সকলেই বিজয় ও মুক্তির খোশখবর শোনাল। 'জলদী উপরে এসো। সালারে আলা তোমাদের অপেক্ষায়।' দেহরক্ষী কমান্ডার বললেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম উপরে অপেক্ষমাণ। তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। তাঁর দৃষ্টি ওই দরোজার দিকে, যেখানে তার দেহরক্ষীরা একটু আগে নেমেছে।

সেনাপতি দেখলেন নারী-কয়েদীরা বেরিয়ে আসছে। এদের জন্যই তাঁর এই অভিযান। নারীরা তাদের মুক্তিদাতাকে দেখার জন্য ছিল উদগ্রীব। দীর্ঘকাল পরে তারা ভূ-গর্ভ থেকে মুক্তি পেল। আকাশের এই সূর্য কতবার তার দৈনিক সফর শেষ করেছে, কিন্তু তা এদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাতানো রোদে তাই চোখ তাদের ঝলসে গেল। চোখে হাত রাখলো সকলে।

'চোখ খোল।' উত্তেজনা ও আবেগতাড়িত কণ্ঠে বললেন কমান্ডার আবু উয়ানাহ, 'দেখ, তোমাদের সালারে আলাকে, যিনি রহমতের ফেরেশতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন।

ইবনে কাসিম ঘোড়ায় পদাঘাত করে সামনে অগ্রসর হলেন। সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে ছিল মহিলারা। তাদের চোখেমুখে আলোর দীপ্তি। মুক্তিদাতাকে দেখার জন্য তারা চোখ পরিষ্কারে রত। তারা দেখছে। দাড়ি-গোঁফবিহীন এক তরুণ এগিয়ে আসছে। সালারের সম্মানার্থে তারা যমীনে বসে গেল। সালার বললেন, আমি আমার ওয়াদা পূরণ করেছি কি? তোমরা আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি কুফরের জমকালো বন্দিদশা থেকে তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছি!'

জনৈক বৃদ্ধা মহিলা বিন কাসিমকে জড়িয়ে ধরলেন। চুমোয় চুমোয় তাকে ভরিয়ে দিলেন। 'কসম খোদার!' বৃদ্ধা বললেন, 'ধন্য তুমি আরব জননী! বিন কাসিমের মত সন্তান যে জন্ম দেয়!'

বিন কাসিম কয়েদীসহ দফতরে এলেন। অন্যান্য কয়েদীরা তখন পায়ের ডাণ্ডাবেড়ী ভাংছে।

॥ দুই ॥

'জেল দারোগাকে পাকড়াও করো। ধরতে পারলে হত্যা করে ফেল।' বিন কাসিমের নির্দেশ। দেহরক্ষী বাহিনী বেরিয়ে পড়ল। কয়েদখানায় তন্নতন্ন করে তালাশ করা হলো, তাদের সামনে কেবল কয়েদী। দারোগাকে কোথাও পাওয়া গেল না। বিন কাসিম এখানে আসার পর তাকে এক নযর দেখেছিলেন। দারোগা আরব কয়েদীদের পুনঃ মিলনের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে।

ডান্ডাবেড়ীসহ দু'কয়েদী প্রধান ফটক থেকে পালানোর কোশেশ করছিল। তারা বলল, দারোগা পালিয়েছে। দু'মুজাহিদ ঘোড়ায় চেপে ছুটলেন। দারোগাকে ইতোপূর্বে দেখেছেন। তাকে ধরে এনে বিন কাসিমের কাছে নীত করা হলো।

‘দেবল থেকে যিন্দা পালানোর চেষ্টা করছিলে বুঝি?’ দোভাষীর মাধ্যমে বিন কাসিম প্রশ্ন করেন।
‘হে বিজয়ী সালার!’ দারোগা বললো, ‘আমি যিন্দা পালানোর চেষ্টা করলে আপনার লোকজন আমাকে এত সহজে ধরতে পারত না।’
‘তুমি কি জিন্দা পালানোর চেষ্টা করছিলে না? তুমি কি মরতে চাও?’
‘না! বিজয়ী হিসাবে আপনি আমাকে কতল করতে পারেন। এছাড়া আপনার কাছে আমার কোন অপরাধ নাই।’
‘কেন, এই বে-গোনাহদের এতদিন আটকে রাখার অপরাধে তুমি অভিযুক্ত নও কি? তোমার ওই অপরাধ কি করে ক্ষমা করা যায়?’
‘এই কয়েদীদের এতদিন জীবিত রাখা কি জুলুম? আমাদের রাজা এদের আটকে রেখেছেন। আমি তাদের ইজ্জত-সম্মান করেছি। এদের কয়েদ করার সাজা রাজা দাহিরের প্রাপ্য। কয়েদখানায় এদের কোন তাকলীফ হলে এর সাজা আমার প্রাপ্য। তবে এর আগে কয়েদীদের কাছে আপনি জেনে নিন সালারে মুহতারাম!’
চাচনামায় লেখা আছে, মুহাম্মদ বিন কাসিম এরপর কয়েদীদের কাছে তাদের সাথে কৃত ব্যবহারের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। সকলে জেল দারোগার ভূয়সী প্রশংসা করেন।
‘সালারে মুহতারাম!’ দারোগা বললেন, ‘আপনি জানেন না, মুসলিম কয়েদীদের দু’যুবতীকে আমি কত কষ্ট করে দেবলের গভর্ণরের লালসা থেকে বাঁচিয়েছি। মাঝে-মধ্যে তিনি কয়েদখানায় আসতেন। তার আগমন সংবাদ শুনতেই আমি ওই দু’যুবতীকে গোপন করে রাখতাম। আপনারা দেবলে ধেয়ে আসছেন শুনে রাজা দাহির ফরমান পাঠিয়ে বলেছিলেন, মুসলিম বাহিনী দেবল দখল করলে কয়েদীদের হত্যা করে ফেল। সেই সময় এসে গেছে। কিন্তু কয়েদীদের অক্ষত রেখেছি আমি।’
‘কারারক্ষীরা পলায়ন করেছে। সুতরাং জেলখানার কর্তৃত্ব তোমাদের চলে গেছে সেই সাথে।’ বললেন বিন কাসিম। ‘তোমরা আমাদের কয়েদীদের ছেড়ে দিলে না কেন?’
‘ছেড়ে দিলে কারারক্ষীরা তাদের হত্যা করেই তবে পালাত। ওরা জানত, আরবরা এসেছে এদের উদ্ধার করতে। দেব-মন্দিরে ওরা পাথর মেরে ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত করতে দেখেছে। ওই রক্ষীরা প্রতিশোধ নিতে চাইলে আমি সেলের দরোজায় তালা লাগিয়ে দেই। সকলে চলে গেলেও থেকে যাই কেবল আমি। আপনাদের হাতে ওদেরকে তুলে দিতেই আমার এই থেকে যাওয়া। আমার অঙ্গীকার আমি পূরণ করেছি। পালাইনি।’
‘তুমি আরব কয়েদীদের ওপর এতটা মেহেরবান হতে গেলে কেন?’
‘কেননা ওরা বে-গোনাহ। আপনি আমাকে কতল করতে চাইলে কয়েদীদের কারো হাতে তলোয়ার তুলে দিন। ওরাই আমার মাথা কাটুক।’
কয়েদীরা আগেভাগেই বলছিল, দারোগা তাদের কোন তাকলীফ দেয়নি।
‘তোমার ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। ইসলামই পারে তোমার এই মহানুভবতার মূল্যায়ন করতে। কোন প্রকার জবরদস্তি নয়। আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান রাখছি। ওই আহ্বানের কারণ তুমি ইসলাম গ্রহণ করলেই আঁচ করতে পারবে।’

ইতিহাস বলছে, দারোগা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে একথা জানা যায়নি, তার ইসলামী নাম কুবলা ছিল নাকি ইসলাম-পূর্ব? সে হিন্দুস্তানের কোন অখ্যাত এলাকার বাসিন্দা। খুবই জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও কলামিস্ট ছিল। বিন কাসিম তার মেধার মূল্যায়ন করলেন। তাকে শুধু জেল দারোগা নয়, দেবলেরই হাকেমের রাজনৈতিক উপদেষ্টা বানালেন। দেবলের নতুন হাকেম হামিদ বিন ওদা নজদী।

কয়েদখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে কুবলার পূর্বপদে বহালের কাগজে সই করলেন সেনাপতি।

'এখানে এমন কোন বে-গোনাহ্ কয়েদী আর আছে কি?' প্রশ্ন সেনাপতির।

'যে দেশের রাজা সত্য শোনতে আগ্রহী নয়, সে দেশের সত্যবাদী লোকের ঠাসা ভীড় এখানে। এখানে অসংখ্য বে-গোনাহ্ কয়েদী রয়েছে।

'তোমার দায়িত্ব এক্ষণে বে-গোনাহদের রেহাই করা। যাদের অপরাধ মারাত্মক, তাদের সাজা খানিকটা লাঘব করো। এখন থেকে বিচার ইসলামী পদ্ধতিতে হবে।'

সদ্য কারামুক্ত আরব কয়েদীদের ফওরান সামুদ্রিক জাহাজে চাপানোর নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলেন। বললেন—

'মৃত্যুকূপ থেকে রেহাই পাবার দরুনই কেবল তোমরা খোদার শোকর করবে না বরং খোদার শোকর এজন্যও করবে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উসিলায় কুফরের পুরীতে ইসলামী পতাকা উড়ানোর তৌফিক দিয়েছেন। তোমরা কয়েদ না হলে আমি আসতাম না। আমি এসে কুফরের পুরীতে আলোর মশাল জ্বালালাম। এদেশ নিয়ে যখন ইসলামের কথা লেখা হবে, তখন অধমের নামটি সকলের মুখে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে। কয়েদখানার নিশ্ছিদ্র কুঠরিতে তোমরা যে অসহনীয় সাজা ভোগ করেছ—আল্লাহ্-ই দিবেন এর প্রতিদান। দোয়া করো, যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি এসেছি তা যেন পুরা হয়। তোমাদের মুক্তি দিয়েই আমার কাজ শেষ হয়নি বরং আমার কাজ সবে হলো শুরু।

কয়েদীরা তাঁকে দোয়া দিতে দিতে প্রস্থান করলেন।

॥ তিন ॥

দেবলের হিন্দু গভর্ণর পলায়ন করেছিল। তাকে তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু কোন হদীস পাওয়া গেল না। সে নিরূন পৌঁছেছিল। নিরূনে সে আশ্রয় নিয়েছিল। নিরূন না গিয়ে আরোড়ে গেলে দেবল পতনের দরুন দাহির তাকে হত্যা করে ফেলত। সে জানত, নিরূনের গভর্ণর শান্তিকামী।

দেবল পতনের খবর শুনে দাহির রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কেউই তার সামনে যাবার সাহস করেনি। এ ধরনের দুঃসাহস আছে কেবল তার উযীর বুদ্ধমানের। তিনি অন্দরে গেলেন। দাহির তাকে দেখে গর্জে উঠলেন, 'কি নিতে এসেছো? কোথায় গেল তোমার বুদ্ধিমত্তা?'

'মহারাজ! আমাদের ফৌজ দু'দু'বার আরব বাহিনীকে পরাভূত করেছে। এজন্য আমাদের বাহিনীর মাঝে একটা অহমিকাবোধ জেঁকে বসেছিল। তারা মনে করেছিল, তাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। বিজয়ের নেশা তাদের উন্মাদ করেছিল। এজন্যই মুসলিম হামলা বরদাশ্‌ত করতে পারিনি আমরা।'

'শুনেছি দেবলের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করে ফেলা হয়েছে। আরব বাহিনী মন্দির চূড়ে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। চূড়া ভাংলে ঝান্ডা নিপতিত হয়। আমাদের ভাগ্য ওই ঝান্ডার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাই ওখানে এর চারগুণ ফৌজ থাকলেও আমরা পরাজিত হতাম।'

'মহারাজ! প্রশ্ন এক্ষণে আপনার রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে। মুসলমানরা দেশ জয় করার নেশায় এসে থাকলে আপনার পরিণাম চিন্তা করুন। ওরা যদি রাজধানী অবরোধ করে, তাহলে কোথায় দাঁড়াবেন আপনি? সর্বদা আমার কথায় আস্থাবান হয়েছেন। আমাকে বুদ্ধিমান ঠাওরেছেন। আমার বিশ্বস্ততায় কখনও সন্দেহ পোষণ করেননি। তাই বলছি, আমার কোন কথায় আপনি রাগ করবেন না।'

'না রাগ করব না। জলদি বল কি বলতে চাও। দেবল বিজয় করেছে দুশমন। এর মানে তারা আমাদের শাহরগে হাত দিয়েছে।'

'মহারাজ! আমি বলতে চাই,আমরা নিষ্প্রাণ এক বস্তুর সাথে নিজেদের ভাগ্যকে সম্পৃক্ত করেছি। সেতো সামান্য এক ঝান্ডা, যা নিপতিত হয়েছে। কাপড়ের টুকরা মাত্র। একটি বাঁশের সাথে লটকানো ছিল যা। পন্ডিতরা বলেছেন, এই ঝাণ্ডা দেবতাদের হাতে গোড়াপত্তন যার। ওটি নিপতিত হলে মনে করো, দেবতাদের ক্রোধে পড়েছ তোমরা। কিন্তু ওই ঝান্ডাকে ইজ্জত-আবরুর প্রতীক বললে জনগণ সদলবলে লড়ত।'

'তারা সদলবলে লড়েছে। একযোগে প্রবেশদ্বার খুলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

'জানি মহারাজ! দু'জন লোক আমাকে বলেছে, দেবলবাসীর এই হামলা পারতপক্ষে হামলা নয়, বরং তা ছিল আত্মহত্যা। কেননা তাদেরকে পন্ডিতরা এই জ্ঞানও দিয়েছিল যে, দুশমন ঝান্ডা নিপতিত করলে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই।'

'ওরা মারা গেছে। আমি দেবলের সেনাপতি ও গভর্ণরকে যিন্দা পুঁতে ফেলব। জানি না ওরা কোথায়।'

'মহারাজ! এ ধরনের ভুল করবেন না। ওদের জীবিত রাখতে হবে লজ্জিত করতে হবে। আগামী লড়াইতে জানবাযী রেখে লড়ে এই পাপ প্রতিবিধানের কালোদাগ মুছে ফেলতে উৎসাহ যোগাতে হবে। এবং জনগণের মনে নিষ্প্রাণ বস্তুর প্রতি অতি উৎসাহী বিশ্বাস দূর করতে হবে। এমনটি না করতে পারলে প্রতিটি ময়দানে তারা পরাজিত হতে থাকবে।'

'তাহলে কি আমাকে এই কথা বলতে বলো যে, ওরা ধর্মান্তরিত হোক। একথা বলতে বলো, মুসলমানদের ধর্ম সাচ্চা? যারা আমাদের ঝান্ডা ফেলে দেবতাদের বেইজ্জতি করেছে। বুদ্ধমান! তুমি আমার চাইতে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ–বিশ্বাস করি তা। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা শুনে নাও! সিন্ধুতে কোনদিন ইসলাম আসবে না।'

'এসে তো গেছে মহারাজ! আপনি আগেভাগেই তো ইসলামের ছায়াতলে নিজকে সোপর্দ করেছেন। যে আশ্রয়ী আরবদের জায়গা দিয়েছেন, তারা আমাদের নয়, স্বদেশীদের মদদ করেছে। মহারাজ ভেবে দেখেছেন কি, কে মুসলিম সেনাপতিকে বলেছে, দেবল মন্দিরের ঝান্ডা ভুলণ্ঠিত করলে দেবল জয় সহজ হবে? শহরের দরোজা বন্ধ ছিল। বাইরের থেকে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারেনি। এই রহস্য আরব্য সেনাপতির জানার কথা নয়। ওই মাকরানী বিদ্রোহী আরবদের কারসাজি এটা।'

'ওদের বিরুদ্ধে এখন করণীয় কি?'

'মহারাজ! ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানোর কোশেশ করুন। ওদের থেকে জানুন, কামান বানানোর কৌশল। হতে পারে ওদেরই কেউ কামান বানাতে পারে। আমরা দশ/বারোটা কামান বানাতে পারলে রাতের বেলা দুশমন শিবিরে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে পারব। ওরা কোনদিন আমাদের সাথে কুলিয়ে ওঠতে পারবে না।'

'ওই রহস্যোদ্ধারের দায়িত্ব তোমার। এমন লোককে নির্বাচিত করো, যে কামানও বানাতে পারে এবং গুপ্তচরবৃত্তিও করতে পারে। কামান নির্মাতাদের এমন উপহার দেব যাতে তাদের সাত পুরুষও খেয়ে শেষ করতে না পারে।'

দেবলের পতন দাহিরের জন্য মামুলি চোট ছিল না। তিনি এমন আনাড়ী শাসকও ছিলেন না যে, উযীরের পরামর্শ ছাড়া কিছু করবেন। বড্ড ধুরন্ধর ও প্রতারক রাজা এই দাহির। হিন্দু ধর্ম ছাড়া কোন ধর্মের নাম শুনতে চান না। তার উযীর ও সালাররা পর্যন্ত জানেন না, উনি সময়ে-অসময়ে কি ভয়ানক ফরমান জারী করতে পারেন। পরাজিত বাহিনীকে ক্ষমা করার পাত্র নন এই সিন্ধু-রাজ।

তিনি উযীরকে বিদায় দিয়ে অন্দরের দরোজা বন্ধ করে একাকী বসে রইলেন। দরবারী লোকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। তারা জানতেন রাজা দাহির এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। ওটি বিস্ফোরিত হলে জানা নেই কাকে কাকে জ্বালিয়ে দেবে।

দীর্ঘক্ষণ পরে তিনি দরোজা খুলেন। দ্রুত জয়সিংহকে ডেকে পাঠালেন। জয়সিংহ তার বড় পুত্র। আপন বোনের সন্তান নয় এ। কিন্তু এক ইতিহাস দ্বারা জানা যায়, এ সন্তান তার আপন বোনেরই গর্ভজাত। জয়সিংহ সিন্ধু ফৌজের সিপাহসালার। দাহির যখন তাকে ডেকে পাঠান, তখন সে নিরূনের সীমান্তে খীমা গেড়েছে। দূত রওয়ানা হলো।

শেষরাতে জয়সিংহ দরবারে এলো। রাজা দাহির তার অপেক্ষায় বিনিদ্র ছিলেন। পুত্রকে আরামের সুযোগ না দিয়েই কাছে ডেকে নিলেন।

'প্রিয় পুত্র আমার!' দাহির বললেন, আমাদের দেশে আপতিত বিপর্যয়ের আন্দায করেছ কি?'

'আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষায়। ভাবছি আপনি এখনও কেন নিশ্চুপ? আমি হামলার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছি।' বলল জয়সিংহ।

'জোয়ান আর বুড়োর মধ্যে পার্থক্য এখানেই বেটা! জোয়ানরা কাজ করে ভাবে। আর বুড়োরা করার আগে। তুমি হয়ত জানো না, নিরূনও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তা দেহে একফোঁটা রক্ত থাকতে মেনে নেব না।'

'আপনি জানেন না, আরব সালার আমার চেয়েও বয়সে ছোট! জোয়ান বলেই আপনি আমাকে হালকা নজরে দেখছেন।'

'আমি তাঁর সাথে তোমার তুলনা করছি না। এখন পরিস্থিতি নিয়ে ভাবো, যা করতে বলি করো। এও মনে রেখ, এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এক্ষণে দু'দেশ কিংবা দু'রাজার যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ দুটি ধর্মের। মুসলমানরা দেবলের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত করে আমাদের ধর্ম ও দেবতাদের উপর আঘাত করেছে। হিন্দু ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছে। আমি প্রমাণ করে দেখাতে চাই, দেবতাদের সম্ভ্রমহানির মুক্তি নেই। ইসলামের পথে আমরা সার্থক ও কার্যকরী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারলে ইতিহাসের লেখকরা আমার দিকে তর্জনি নির্দেশ করবে। ইতিহাস বলবে, আরব জাতি সিন্ধু জয় করেনি, তাদেরকে সিন্ধু জয় করতে মদদ জুগিয়েছি আমি-ই। এক্ষণে এসব কথা থাক বেটা। আরমানবেলা ও দেবল হাতছাড়া হওয়া বড় কথা নয়। কিন্তু প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণে এটা অবশ্যই বড় কথা যে, দুশমন আমাদের দুটি মযবুত ঘাঁটি পেয়ে গেছে। দেবল বন্দর নগরী। দুশমনের জন্য সমুদ্র পথে মালামাল, রসদ আসা সহজ হয়ে গেল। এদিকে সুন্দর সোমনিও আরবদের সাথে হাত মিলিয়েছে।'

'পিতাজি মহারাজ।' নিরূনকে আমরা এভাবে দখলে রাখতে পারি যে, আমার বাহিনীকে ওখানে পাঠিয়ে দেব এবং সুন্দর সোমনিকে নজর বন্দী করব।'

'না! এমনটা করলে নিরূনবাসী তোমার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে যাবে। হতে পারে ওরা তোমার বিরুদ্ধে হাতিয়ারও উঠাবে। তোমার মনে নেই, উযীর ওদের বিরুদ্ধে জাদুকর পাঠিয়ে কি ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি বলেছেন, আমাদের ব্যর্থতার মূলে কাজ করেছিল আরব্য গোয়েন্দা। এর দ্বারা বোঝা গেছে, সুন্দর সোমনি তলে তলে আরবদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছে।'

'আপনি অনুমতি দিলে বেটাকে চিরতরে খতম করে দেয়ার ব্যবস্থা করতাম।'

'এমনটা করার সুযোগ থাকলে কি আর আমি বসে থাকতাম! কিন্তু এ মুহূর্তে যখন দুশমন আমাদের কেল্লা দখল করে অন্দরে প্রবেশ করতে চাইছে, সে মুহূর্তে এমন কোন ঝুঁকি নিতে চাইছিনা। আসলে একটি ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে যে, নিরূনে বুদ্ধিস্টরা জমায়েত হচ্ছে। ওরা গৃহযুদ্ধ লাগাতে পারে। তাতে লাভ আমাদের চেয়ে দুশমনের-ই বেশী। মুসলমানরা দেবলের সামনে অগ্রসর হলে যে কোন বাহানায় তাকে নিরূনে তলব করব। আমার মতে, দেবল জয় করে মুসলমানরা চুপটি মেরে বসে থাকবে না। তারা নিরূনের পথ ধরবেই। এখন তুমি যেতে পার। তোমার বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদে নিয়ে যাও। নদী পার হওয়া লাগতে পারে তোমার। দুশমন তোমার পথে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে, সর্বদা সতর্ক থেকো। নিরূন বাহিনীকে দেখলে বলো, যে কোন মূল্যে তারা যেন দেবদেবীর সম্মান রাখে।'

'আর জনগণ আমার পথের অন্তরায় হলে তখন কি করব?'

'পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিবে। আমাকে জানাতে পারলে পরিস্থিতি জানিও। আমি কোন পদক্ষেপ হয়ত তখন দিতে পারব। আরব বাহিনীর সালার মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের কাছে আমি একটি পত্র দিতে চাই। এতে তাকে খুব ভয় দেবার ব্যবস্থা করব। জানি, যে এই দূরপাল্লার পথে বাহিনী নিয়ে আসে কথার ভয়ে তাকে ভীত করা যাবে না। কাজেই আমাদের আত্মরক্ষার সর্বশেষ তীরটি পর্যন্ত ছোঁড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

জয়সিংহ বেরিয়ে গেল।

॥ চার ॥

দেবলের আকাশে আযানের সুর লহরী সুমধুর সুরে অনুরণিত হচ্ছে। রাজা দাহিরের যে বাহিনী দেবল থেকে পলায়ন করতে পারেনি তাদেরকে বন্দী করা হয়। বিন কাসিমের নির্দেশে এদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয়। দেবল মন্দিরের ঝান্ডা ভূপাতিত হবার পর শহুরে জনগণ একযোগে হামলা করলেও তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এর ফলে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া লোকজন আবারো এসে স্ব-স্ব বাড়ীতে উঠল।

বিন কাসিম যুদ্ধলব্ধ মাল তার বাহিনীর মধ্যে ভাগ করে দেন এবং বায়তুল মালের এক-পঞ্চমাংশ যুদ্ধবন্দিসহ সামুদ্রিক পথে ইরাকে রওয়ানা করে দেন। হামিদ বিন ওয়াদা দেবলের হাকেম নির্ধারিত হন।

দেবলকে পূর্ণ ইসলামী শহর বানানোর জন্য বিন কাসিম শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজ হাতে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আজ যদিও সেই মসজিদের নাম-নিশানা নেই। এর প্রতিটি ইষ্টকখন্ড যদিও কালের গর্ভে বিলীন, কিন্তু দেবলের ইতিহাস আজো অক্ষয়-অম্লান। চিরদিন তা থাকবে।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তার লোকদের ব্যবহারে দেবলবাসী এতই বিমুগ্ধ হন যে, তারা এই তরুণ সেনাপতির মূর্তি বানিয়ে সকাল-সন্ধ্যা পূজা শুরু করে দেন।

বিন কাসিম ঝড়ের বেগে সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দেবলে সুন্দর ও নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থাপনা না করে আগে বাড়া তার জন্য উচিত নয় বলে মনে করেছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ এই সালার আর দশটা রাজার মত কেবল দেশজয়-ই মুখ্য করেননি যারা কেবল ধ্বংস করে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছেন।

বিন কাসিম হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের মত গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। এজন্য তিনি সর্বদা শাবান ছাকাফীকে সঙ্গে রাখতেন। তিনি দেবলে থেকে নিরূনে গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জালের মত।

একদিন দেবলের প্রবেশদ্বারে আটজন সওয়ার এসে দাঁড়াল। তারা রাজা দাহিরের লোক বলে পরিচয় জানাল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম একথা শোনলেন। বললেন, 'ফটক খুলে দাও। দূতদের সসম্মানে আমার কাছে পাঠাও। রাজার দূতগণ ইবনে কাসিমের কাছে এসে মাথা নোয়াল। তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে লাগল। দোভাষী সেগুলো ভাষান্তর করে যাচ্ছিল।

'ওদের বলে দাও, আমাদের সামনে কাউকে সেজদায় নিপতিত হতে দেয়া হয় না। এটা আমাদের ধর্মের নিষিদ্ধ কাজ। মানুষ মানুষের সামনে মাথা নোয়াতে পারে না। ওদের থেকে সংবাদ নিয়ে বাইরে বসিয়ে দাও।'

দূতগণ এক নিমিষে আরব বিজেতা তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা অবাক, এই তরুণ একদিকে সালার ও বিজেতা! কি অনুপম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী। তারা রাজার পত্র দিয়ে বাইরে গেল।

বিন কাসিম পয়গাম খুললেন। এই পয়গাম রাজা দাহিরের লেখা। দোভাষীর কাছে তা হস্তান্তর করা হলো।

ইতিহাস-পৃষ্ঠে এই পয়গাম সংরক্ষিত। রাজা দাহির লিখেছিলেন—

'এই পয়গাম চাচ-এর পুত্র যিনি সিন্ধুর রাজা ও গোটা ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতার পক্ষ থেকে। এ সেই দাহির যার কথায় দরিয়া, বৃক্ষরাজি, মরু ও পাহাড় চলা-ফেরা করে। এই পত্র আরব ইতিহাসের অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্ক আনাড়ী সেনাপতির নামে—যিনি মানুষ হন্তা ও সম্পদ লোভী। যিনি তার বাহিনীকে বাঘের মুখে পুরে দিয়ে উল্লাস করেন।

অল্পবয়স্ক বালক হে! তোমার পূর্বে তোমার-ই দেশের অভিজ্ঞ সালাররা এই পাগলামি করেছিল। সিন্ধু থেকে গোটা ভারতবর্ষের বুকে তারা ইসলামী পতাকা উড়াতে চেয়েছিল। তুমি কি তাদের পরিণাম শোননি? আমি ওদের এমন মার দিয়েছি যে, পতাকায় পেঁচানোর মত দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। দেবলের চৌহদ্দীতেও ওরা পৌঁছুতে পারেনি। এক্ষণে সেই নির্বুদ্ধিতা তোমাকে পেয়ে বসেছে। দেবল জয় করে তুমি আনন্দ-উল্লাসের ফেনোচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছ। কিন্তু তোমাকে নসিহত করে বলছি, বেশী দেমাগ দেখাতে যেও না। দেবল সে তো চুনোপুঁটি। বেপারী ও ফঁড়িয়াদের বাস এখানে। যুদ্ধংদেহী নয় এরা। লড়াই কাকে বলে জানে না। দু'তিনটি পাথর কুচি নিক্ষেপ করে তাই ওদের দিল-দেমাগে ভয় ঢুকাতে পেরেছ। দেবলে আমাদের তেমন কোন অভিজ্ঞ সেনাও ছিল না। সুতরাং এই বিজয়কে তুমি খুব একটা বড় মনে করতে যেওনা। আমাদের একজনও জাঁদরেল সালার দেবলে থাকলে তোমার পরিণতি ইতোপূর্বেকার দু'সালারের চেয়ে কোন অংশেই কম হত না। তোমার একটা সেপাইও জানে বেঁচে যেতে পারত না।

আমি তোমার তারুণ্যদীপ্ত যৌবনের মূল্যায়ন করে বলছি, আর এক কদমও সামনে বেড়ো না। যেখানে আছ ওখান থেকেই ফিরে যাও। এবারে তোমার সামনে দেখবে আমার অসুর-পুত্র জয়সিংহকে। তুমি ওর প্রভাব-দাপট চিঠির ভাষায় বুঝবে না। বড় বড় মহারাজারা ওর সামনে মাথা নুইয়ে থাকে। আমার গুণধর পুত্রটি সিন্ধু, মাকরান ও তুরানের গভর্ণর। তার অধীনে আছে একশ' জঙ্গী পাগলা হাতি। দুশমনকে কচুকাটা করতে জয়সিংহ শ্বেতহস্তির পিঠে সওয়ার থাকবে। যার মুকাবিলা না করতে পারবে কোন ঘোড়া, না তোমার কোন জানবায সেপাই।

সামান্য বিজয়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার পরিণতি আগামীতে পূর্বাপর দু'আরব সেনাপতির চেয়ে কোন অংশেই কম হবে না।'

ইতি—

দাহির

বিন কাসিম চিঠি পড়ে কেবল মুচকি হাসলেন। তিনি উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠালেন। দোভাষী আবারো তাদের পত্র পড়ে শোনাল। সমস্ত উপদেষ্টারা হো হো করে হেসে ওঠেন।

'লোকটা আমাকে দাম্ভিক বলেছে।' বিন কাসিম বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে এই লোকটাই নির্বোধ ও আনাড়ী নয় কি? আমি উত্তর লিখতে চাই, সে উত্তর শুনে আপনারা মতামত দিবেন।'

বিন কাসিম উত্তরের মৌখিক কথা শোনালে সকলে বললেন, লোকটা এ ধরনের অভিজাত খেতাবের যোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিতে পত্রের ভাষা সংশোধন করে লেখা হয়। তিনি মুন্সী ডেকে পত্র লেখিয়ে আরবের রাজদরবারে পাঠান। বিন কাসিম এই পত্রটি লেখান।

'এই পত্র সেই মুহাম্মদ বিন কাসিম ছাকাফীর পক্ষ থেকে যিনি দাম্ভিক রাজা-বাদশাহদের দম্ভোন্নত মস্তক গুঁড়িয়ে দিতে এসেছেন। মুসলিম নিষ্পাপ কয়েদীর হাতে যে জুলুমের শেকল পরিয়ে দিয়েছে সেই রাজার কালোহাত ভেঙ্গে দিতে এসেছে যে সিংহ-শার্দুল—আমিই সে। এই চিঠি সেই চাচ-পুত্র দাহিরের নামে, যে কাফের, জাহেল, নীতিজ্ঞানহীন, দুশ্চরিত্রবান এমনকি আপন বোনের স্বামী। এ খত্ সেই দাহিরের নামে যে এখনও ঠাহর করতে পারছে না, সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সময়ের নিষ্ঠুর সয়লাব যাকে ভাসিয়ে নিবে অচিরেই।

মূর্খতা ও দাম্ভিকতার বশবর্তী হয়ে তুমি যে পত্রটা লিখেছ, তা পড়েছি আমি। দম্ভ, অহংকার ও শ্লেষ বমি-ই করতে পেরেছ তাতে। শুনেছি, তোমার বেশ শক্তি, হাতিয়ার ও পাগলা হাতি আছে। এও জেনেছি, এগুলো তোমার শক্তি মদ-মত্ততার প্রাণবিন্দু। তোমার মত ওই সব চিজ-সরঞ্জামের ওপর আমি ভরসা করি না। আমার ভরসার আপাদ মস্তক জুড়ে আছেন এক সত্তা—লা-শরীক আল্লাহ।

হে দুর্বলচিত্ত ইনসান! সওয়ার, হাতি ও হাতিয়ারের ওপর ভরসা করতে যেওনা। হাতি তো সেই প্রাণী যে তার দেহ থেকে মাছি সরানোরও ক্ষমতা রাখে না। আমার যে সেপাই ও ঘোড়াগুলো দেখে তুমি হয়রান হচ্ছো, ওরা সবে আল্লাহর সেপাই। আল্লাহ-ভরসা করে ওরা এদেশে এসেছে। ওরা বিজয়ী হবে। কারণ ওরা খোদার সৈনিক।

তোমাদের দেশে আমরা স্বেচ্ছায় আসিনি। আসতে বাধ্য হয়েছি। তোমাদের কুকর্ম, ইসলাম বৈরিতা ও অহমিকাবোধ আমাদেরকে এখানে এনেছে। সরন্দীপের বণিক কাফেলা ও সহযাত্রীদের অপহরণ করে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু তোমার জানা ছিল না,আমাদের খলীফার কাছে গোটা দুনিয়া মাথা নোয়াতে বাধ্য। তোমার ভাগ্য খারাপ যে, আমাদের সাথে দুশমনি শুরু করে দিয়েছ। তুমি হয়ত ভুলে গেছ, তোমাদের বাপ-দাদা আমাদের কর দিয়ে আসত, তুমি রাজা হয়ে যেটা বন্ধ করে দিয়েছ। অতঃপর অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার শুরু করে দিয়েছ। মিত্রতাকে করেছ শত্রুতায় পর্যবসিত। তোমার কৃতকর্মে বিরাগভাজন হয়ে ইসলামী খলীফা আমাকে তোমায় শিক্ষা দিতে প্রেরণ করেছেন। তোমার-আমার মোকাবিলা যেখানেই হোক, সেখানেই আমি আল্লাহর কাছে মিনতি করব, তিনি যেন আমাকে বিজয়ী করেন। তোমাকে করেন লজ্জিত-অপদস্থ।

তোমার মাথা কেটে আমি ইরাকে পাঠাতে চাই। তারপর যেন আমার মৃত্যু হয়। তোমরা যাকে এদেশে সৈন্যমার্চ বলো, আমরা একে বলি জিহাদ। আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্যই আমাদের এ জিহাদ।'

ইতি—
তোমার যম

দূত এই পয়গাম নিয়ে আরোড়র উদ্দেশে রওয়ানা হলো।

॥ পাঁচ ॥

আজকের সিন্ধু আর সেই হাজার বছর আগেকার সিন্ধের মধ্যে কত পার্থক্য! সিন্ধুনদ অসংখ্য বার তার গতিপথ বদলেছে। তাই এক্ষণে বলা সম্ভব নয় যে, কোন পথে বিন কাসিম সিন্ধুতে উপনীত হয়েছিলেন। সেই প্রাচীনযুগের স্মৃতিবহ কিছুই পাওয়ার কায়দা নেই।

সিন্ধুনদের অনেক শাখা ছিল। যেগুলো এখন শুষ্ক প্রান্তরে পর্যবসিত। ওই সময়কার একটি খরস্রোতা নদী খুবই গভীর ছিল। ওই যুগে ব্রাহ্মণাবাদও একটি সুন্দর নগরী ছিল বলে শোনা যায়। রাজা দাহির বাহিনীসহ তার পুত্র জয় সিংহকে ওখানে পাঠান। ওই শহরের নাম-নিশানাও আজ নেই। তবে অনেকের মতে অধুনা মনসুরা'-ই সেই আদিকালের ব্রাহ্মণাবাদ।

বালুঝড়ে সেই সব নগরী ধ্বংস হলেও যারা এখানে পদার্পণ করেছিলেন, তাদের নাম আজো স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। এদের সীনায় কলেমার আওয়াজ ছিল। ওরা আল্লাহর রাহে নিজেদের বুকের তাজা খুন নজরানা দিয়ে ছিলেন।

রাজা দাহির এই ব্রাহ্মণাবাদ থেকে দুশো মাইল দূরে যখন তার পুত্রকে দুটি ধর্মের লড়াইয়ের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবলে জুমআর খুৎবায় বলছিলেন, যে উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি, তা সমাধা হয়েছে। কয়েদীমুক্ত করেছি আমরা। সিন্ধু বাহিনীকে করেছি নাস্তানাবুদ। যুদ্ধলব্ধ মাল ও জঙ্গী কয়েদীদের ইরাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এক্ষণে চিন্তা করে দেখ, আরেকটি দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চেপেছে। তোমরা দেখেছো, মন্দিরের ঝান্ডা যখন ভেঙ্গে পড়ল, অমনি এদের মনোবল টুটে গেল। ওদের ধারণা, যখন মন্দির চূড়া থাকছে, তখন ওরা জয়ী থাকছে। কোন শক্তিই ওদের পরাভূত করতে পারবে না। এরা দেবতাপূজারী ও মূর্তিপূজারী। আল্লাহর নাম ওদের হৃদয়পটে নেই। ওদেরকে বুঝাতে হবে আল্লাহ আছেন যিনি দেবতাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তোমরা দেখনি, এরা সেই আল্লাহর বান্দা হয়েও তাঁর নামোচ্চারণ শিখেনি? ওদের খোদা ওই ঝান্ডা। আমরা ওদের খোদার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। ভেঙ্গে দিয়েছি ওদের সবচে' বড় মন্দির।'

যে সময় রাজা দাহির তার পুত্রকে বলছিলেন, অচিরেই মুসলিম বাহিনীর ওপর দেবতার রোষানল পড়বে তখন বিন কাসিম বলছিলেন, আমরা ওদেরকে জানাতে চাই, আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু ওই তথাকথিত খোদার স্রষ্টা খোদ তোমরাই। আমরা একাজ না করলে 'তোমরা যাদের পথভ্রষ্ট দেখ তাদের সৎপথে আনো' এই বাণীর অস্বীকারকারী হতাম। অন্ধকে রাস্তা পার করানোর দায়িত্ব দিয়ে খোদা তোমাদের সিন্ধু প্রেরণ করেছেন।

দাহির যখন ধর্মযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছিলেন তখন বিন কাসিম হক ও বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই-এ নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের কাছে চিঠি লিখলে হাজ্জাজ অনুমতি দানপূর্বক বললেন, আমি কমান্ডো ও রসদ পাঠাচ্ছি ভাতিজা! মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের এমন কিছু স্থানীয় গুপ্তচর ছিলেন যারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া হারেস আলাফী এমন জনাচারেক লোক দিয়েছিলেন যারা সিন্ধিভাষা বুঝত। এদিকে শাবান ছাকাফী ছিলেন গোয়েন্দা প্রধান। তার কিছু চর নিরূনে আর কিছু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছিল।

তারা সকলেই জানাল, রাজা দাহির সম্মুখ সমরে না নেমে আত্মরক্ষামূলক হামলার পক্ষপাতি। তবে এর দ্বারা যেন এই ধারণা না করা হয় যে, তিনি সম্মুখ সমরে নামার হিম্মৎ হারিয়ে ফেলেছেন। বিন কাসিম জানতেন, দাহির এমন দূরপাল্লার ময়দানে লড়াই করতে চান যেখানে তাঁর বাহিনী পৌঁছুতে পৌঁছুতে নানান মুসিবতের সম্মুখীন হয়। শহীদ ও যখমীর কারণে যাতে তার বাহিনীতে ঘাটতি দেখা দেয়।

বিন কাসিম তার অধীনস্থ সালারদের সামনে একথা তুলে ধরলেন।

'আপনি অভিজ্ঞ। রসদ ও কমান্ডো হেফাযতকল্পে আমরা আরোড় পথের তামাম কেল্লা দখল করতে পারি। কিছু বসতি কব্জা করতে পারি। রেখে যেতে পারি এমন কিছু লোক যারা পালাক্রমে মূল বাহিনীতে রসদ ও অস্ত্র পৌছাতে থাকবে।

এরপর আরেকদল গুপ্তচর জানাল, এখান থেকে নিরূনের (হায়দরাবাদ) পথে শীষম নামী একটা এলাকা আছে। ইবনে কাসিম নিরূন দখল করতে চাইছিলেন। নিরূন দেবল থেকে ২৫ফার্লং দূরে।

সাকুরা নদী নিরূনের পথে অন্তরায়। এটি সিন্দুনদের শাখা। বিন কাসিম সমগ কামানগুলো নৌকায় তুলে সাকুরা নদী বেয়ে চলতে নির্দেশ দিলেন। এছাড়া অন্যান্য সামগ্রীও এতে সন্নিবেশ করার ফরমান দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সৈন্যসহ একদল সাকুরা দিয়ে নদীপথে রওয়ানা হল। এর মধ্যে পালতোলা নৌকাও ছিল। ছিল দাঁড়। নৌকার ছাদে সতর্ক তীরন্দাযরা ধনুক উঁচিয়ে ছিল। নদীর দু'কূল দিয়ে সওয়াররা চলছিল। এরা রসদ সামগ্রীর হেফাজত করে যাচ্ছিল।

অন্যান্য বাহিনী গুপ্তচরদের নির্দেশিত পথে চলছিল। সাথে ছিল পথপ্রদর্শক। শাবান ছাকাফী অগ্রগামী বাহিনী নিয়োগ করে সন্দেহজনক এলাকাসমূহ সনাক্ত করছিলেন। যথাসম্ভব লোকচক্ষু এড়িয়ে নিরূন যাত্রা চলছিল নীরবে নিভৃতে। এই নদীর তীরবর্তী বসতীরা এই বাহিনী দেখছিল। এরা ছিল সাদাসিধে গ্রাম্য লোক।

প্রচন্ড গরম তখন। শ্রাবণী বর্ষা তখনো শুরু হয়নি। এ বাহিনীর কাছে সিন্ধুর গরম তেমন একটা অন্তরায় নয়। বালুকাময় প্রান্তর হলেও এখানে লু-হাওয়া প্রবাহিত হয় না। তবে এই গরম যে আরব্য গরমের চেয়ে ভিন্ন তা বেশ বোঝা গেল।

নৌকাবহর শীষমে পৌঁছুল। সওয়ার ও অন্যান্য বাহিনীও নীত হলো। বিন কাসিম এখানে ছাউনী ফেলার নির্দেশ দিলেন। ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হবার অবস্থা সকলের।

॥ ছয় ॥

রাতের বেলা বসরা থেকে দূত এলো। সে শুষ্ক প্রান্তর ধরে এসেছে। প্রথমে সে দেবল এসেছিল। সেখান থেকে ফৌজের রাস্তাধরে চলেছে। তার সাথে হাজ্জাজের পয়গাম—হাজ্জাজ লিখেছেন।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম! হাজাজ্জের পক্ষ থেকে সালার মুহাম্মদ বিন কাসিমের নামে। আমাদের হৃদয়ের চাহিদা ও সর্বান্তঃকরণের দোয়া বিজয়ের পর বিজয় তোমার পদচুম্বন করুক। আমি বিশ্বাস করি, তোমার সমর জীবনে পরাজয়ের তিলক থাকবে না। আমাদের দুশমনকে খোদা পদে পদে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বেন। এ চিন্তা কখনও করবে না যে, দুশমনের হাতি, ঘোড়া হীরা জহরত সবই তোমার

করতলে। এর চেয়ে তুমি অধীনস্থ বাহিনীর সাথে হাসি খুশীতে থাকবে এই ভালো। এতে তোমার জীবন সমৃদ্ধ হবে।

তুমি যে কাউকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে। ছোট-বড় সকলকে সমান চোখে দেখবে। দুশমনের ঘাড় মটকে ইরাকবাসীকে জানাও, সিন্ধু তোমার। কোন কেল্লা বিজয় করলে প্রয়োজনের সবকিছু তোমার কাছে রেখোনা। এগুলো সৈন্য বাহিনীর মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিও। কেউ অধিক খানা-পিনা কাছে রাখলে তাকে কিছু বলো না।

যে শহর-ই জয় করো সেখানে বাজার দর নির্ধারণ করো। যে সব খাদ্যশস্য দেবলে আছে তা সেনাদের কাজে লাগাও। এমন যেন না হয়, দেবলের গুদামে খাদ্য পচে যায়। শহরবাসীর শান্তি নিরাপত্তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখ। সকলের মন রক্ষা করে চলো। মানুষের ব্যবসা, বসতি ভিটা ও কৃষি খামার জ্বালিয়ে দিও না। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

ইতি, হাজ্জাজ
২০শে রজব ৯৩ হিজরী
মোতাবেক ৭১২ খ্রীস্টাব্দ

হাজ্জাজের এই পত্র বিন কাসিমের উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দিল। তিনি সালার ও বাহিনীর মুখপাত্রদের ডেকে সকলকে এটা শোনাতে বললেন।

দু'একদিন শীষমে থেকে বিন কাসিম নিরূনের পথ ধরলেন। নৌকা চলতে লাগল। এক সপ্তাহ পর তারা বলহারে উপনীত হন। এখানে পানির সমস্যা দেখা দিল। নৌকা চলছিল নদীপথে। ফৌজ চলে গিয়েছিল অনেকটা সামনে। পানি কমে এলো। ঘোড়া পিপাসায় কাতর। ওগুলো হেষাধ্বনি দিতে লাগল। দূর-দরাজে কোথাও পানির চিহ্নও নেই। এক্ষণে চলাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মুহাম্মদ বিন কাসিম কাঠফাটা রোদ্দুরে এস্তেস্কার (বৃষ্টি বর্ষণের) নামায পড়লেন।

সমগ্র বাহিনী কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াল। বিন কাসিম নামাযের ইমামত করলেন। বিন কাসিম এই দোয়া করলেন ঃ

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের চাহিদা তোমার অজানা নয়।'

মুজাহিদবৃন্দ ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। এরপর খোদার রহমতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মরুপ্রান্তর সাক্ষাৎ সমুদ্রে পরিণত হয়। সকলেই পানি সংগ্রহ করেন। ওই দিনই আবার নিরূনের উদ্দেশে কাফেলা এগিয়ে চলে।

নিরূনের সীমান্তে উষ্ট্রারোহী জনৈক সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে সরাসরি বিন কাসিমের কাফেলার দিকে এগিয়ে এল। লোকটা ছিল মুসলিম গোয়েন্দা। নিরূন থেকে এসেছে।

'কি খবর?'—বিন কাসিম প্রশ্ন করেন।

'সালারে আলা! নিরূন গভর্ণর রাজধানী থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছেন।" —আগন্তুক বলল।

'কোথায়?'

'আরোড়।'

'শহরবাসী কি বলে?'

'ওরা লড়াই করবে না। রাজা নিরূনের গভর্ণরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। রাজার ফৌজ শহরবাসীকে তটস্থ করছে। বলছে, মুসলমানরা শহরে ঢুকে লুট-তরাজ

করবে। নারী-শিশুদের ধরে নিয়ে যাবে। কারো ঘর রক্ষা করবে না। কৃষি-খামার বিরান করে দিবে।'

নিরূনের ফৌজ কি আমাদের মোকাবেলা করবে?

–হ্যাঁ, সালারে আলা।

বিন কাসিম অতিদ্রুত নিরূন ঘেরাও করে ঘোষণা করলেন, কেল্লা আমাদের হাতে দিয়ে দাও, নইলে আমাদের দখল করতে হলে একজনকেও জিন্দা ছাড়া হবে না।

॥ সাত ॥

সুন্দর সোমনিকে আরোড়ে তলব এক বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল। মুসলিম বাহিনীকে নিরূনমুখো হতে জেনে দাহির অজ্ঞাত এক বাহানায় তাকে আরোড়ে ডেকে পাঠান। পূর্বে আলোচনা হয়েছে, দাহিরের অনুমতি ছাড়াই সুন্দর সোমনি হাজ্জাজের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জিযিয়া দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

হাজ্জাজ বলেছিলেন, নিরূনে গেলে শহর-ফটক খোলা পাবে। কিন্তু বিন কাসিম এর উল্টাটি পেলেন। তিনি দোটানায় পড়ে গেলেন কামান দ্বারা শহরে পাথর নিক্ষেপ করবেন কি-না। কেননা এতে শহরবাসীর জানমাল ক্ষতির আশংকা ছিল। তাই সুন্দরের সন্ধানে আরোড়ে গুপ্তচর পাঠালেন। আরোড়ে সুন্দর সোমানিকে বসিয়ে রাখেন দাহির। তাঁর আশা, নয়া গভর্ণর ও বাহিনী মুসলিম অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে।

একদিন তাকে ডেকে পাঠান দাহির। জানা গেল সুন্দর তার বিশ্রাম কক্ষে নেই। সর্বস্থানে তাকে তালাশ করা হলো। কিন্তু তিনি উধাও। কি করে তাকে পাওয়া যাবে! তিনি তখন আরোড় থেকে বহুদূরে। তার দ্রুতগতির ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার দেহরক্ষীরাও আরোড় থেকে লাপাত্তা, সকলেই তার সাথে নিরূন চলেছে।

সুন্দরের দেহরক্ষী মূলতঃ আরব্য গোয়েন্দা। শাবান ছাকাফী এদের নিযুক্ত করেছেন।

বিন কাসিম সুন্দরের কাছে এক গুপ্তচর পাঠিয়ে শহরের পরিস্থিতি জানিয়ে কর্তব্য স্থির করতে বললেন।

গুপ্তচরের মারফত অবগত হতে পেরে সুন্দর বুঝলেন, দাহির তাকে এজন্যই নিরূন থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিল। সুন্দর তৎক্ষণাৎ দেহরক্ষীদের বললেন, আমার ঘোড়া এভাবে বের কর যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।

কেউ সন্দেহ করুক চাই না করুক, তাকে আরোড় ছাড়তেই হবে। যত দ্রুত সম্ভব নিরূনে পৌঁছুতে হবে।

গভর্ণরকে দেখে ফটক রক্ষীরা ফটক খুলে দিল। সুন্দর দরোজা বন্ধ না করে একজনের দ্বারা বিন কাসিমের কাছে খবর পাঠিয়ে বললেন, মুসলিম বাহিনীকে শহরে প্রবেশ করতে বলো।

ফুতুহুল বুলদানে আল্লামা বালাজুরী লিখছেন, সুন্দর সোমনি বিন কাসিমকে বীরোচিত সম্বর্ধনা দেন। দামী উপহার দেন। ঘোষণা করেন, চুক্তি মোতাবেক নিরূনবাসী বিন কাসিমের অধীনতা মেনে নিয়েছে।

নিরূনে অবস্থানরত দাহিরের ফৌজের থেকে সংঘর্ষের আশংকা করা হলো। কিন্তু শহরবাসীর উল্লাস ও নিশ্চুপ ভূমিকার সামনে ফৌজের কিছু করার থাকল না। ওই বাহিনীর সালার ভাবলেন, এক্ষণে কিছু একটা ঘটালে মুসলিম বাহিনী ও নিরূনবাসী তাদের আস্ত রাখবে না।

সিস্তানের পথে

॥ এক ॥

নিরূন হাতছাড়া হওয়া রাজা দাহিরের জীবনে আরেক তিক্ত স্বাদ নিয়ে এলো। এবার তার প্রস্তুতি আরমানবেলা ও দেবলের তুলনায় ভিন্ন।

দরবারের এক উপদেষ্টা তাকে বললো, 'মহারাজ! আরবীদের নিরূন থেকে সামনে অগ্রসর হতে দেয়া উচিত নয়।

'হুকুম দিন মহারাজ! আমরা সুন্দর সোমনি ও তার খান্দানের আণ্ডা-বাচ্চাদের কুকুরের মত হত্যা করব।' বললেন অন্য এক উপদেষ্টা।

'শুনেছি সে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। কিন্তু চালবাজিতে বেশ পটু, সিদ্ধান্তে অটল।' বলল জনৈক ফৌজি অফিসার।

'তাকে আরোড়ে আসতে দেয়া যাবে না। নিরূনেই তাকে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, মহারাজ! আমরা নিরূন অবরোধ করবো। তার কামান এখনও নৌকায়।

রাজা দাহির দরবারে এভাবে পায়চারী করছিলেন যেন তাঁর দু'হাত বাঁধা। কেউ নতুন পরামর্শ দিলে থমকে দাঁড়াতেন। আড়চোখে খানিক তার দিকে তাকিয়ে নিতেন। আবারো পায়চারী শুরু হতো তার। এ পরামর্শে তিনি মুচকি হাসতেন। সকলে পরামর্শ দেয়ার পর দরবারে পীনপতন নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। দাহিরের পায়চারীর লঘুশব্দ সেই নীরবতাকে খানিক ভঙ্গ করে চলেছিল।

শেষ পর্যন্ত তিনি পায়চারী বন্ধ করলেন। পরামর্শদাতাদের কথা তিনি হাঁটতে হাঁটতে শুনছেন। তারা অনুরোধের সুরে কথা বললেও তাতে এক ধরনের নির্দেশ ছিল। তিনি মাঝে মধ্যে জবাব দিতেন কিংবা এগুলো খন্ডন করতেন। সিংহাসনে বসতেন, তলোয়ার সামনে রাখতেন। হীরে খচিত এর বাট। তার চেহারায় ক্ষুধাত বাঘের ক্ষিপ্রতা। মনে হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের রাজা তাকাচ্ছেন। এসময় দরবারীরা তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

সকলের মতামত শোনার পর চিরাচরিত নিয়মমাফিক তিনি সিংহাসনের তিনটি ধাপে চড়ে গদিতে বসে সকলের দিকে তাকালেন। বললেন—

'সে এখানেও আসবে। আমরা তাকে এখানে 'আসতে দেব। তবে সে আসবে তার তলোয়ার আমাদের জুতোর তলে রাখতে। আরবী মূর্খ মায়ের সন্তান। নিজকে এক্ষণে জঙ্গলের বাঘ মনে করছে। তাকে মূর্খ বালক ও জংগলের বাঘ বলছি।' মুচকি হাসেন তিনি। বলেন, 'এই বাঘ আরোড় দেয়ালের পাদদেশে তার যখম চাটবে। তোমরা কি জান না, সিন্ধু ধরিত্রীর অসুর পুত্র জয়সিংহ আরোড়ের পথে বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে? ব্রাহ্মণাবাদে এক আরবী পুত্র ও এক সিন্ধু-পুত্রের লড়াই হবে। অতঃপর সেই লড়াই-ই বলবে এদেশে ইসলাম থাকবে, না হিন্দুধর্ম থাকবে। এটা এই মুহূর্তে তোমাদের বুকে লিখে নাও, আমরা বিন কাসিম ও তার বাহিনীকে

রুখছি না, রুখছি এক ধর্মকে। এ সেই ধর্ম—যা সামান্য ক'দিনের ব্যবধানে দূর-দরাজে ছড়িয়ে পড়েছে। জানো, এর কারণ কি?' তিনি বড় মন্দিরের পন্ডিতের দিকে তাকালেন। তাকে বললেন, 'রথি মহারাজ! আপনিই বলুন।'

'ইসলাম এজন্য বিস্তার লাভ করেছে যে, তার মোকাবিলায় কোন ধর্মই সাচ্চা ছিল না। একদিকে অগ্নিপূজারী ইরান অপরদিকে ক্রুশ পূজারী খ্রীস্টান। এ ধর্মদ্বয় অন্তঃসারশূন্য। হিন্দুধর্ম দেবতাদের ধর্ম। দেবতারা আগুন বর্ষণ করতে পারেন। পাহাড় উড়িয়ে যেখানে ইচ্ছা নিতে পারেন। এই ধর্মদ্বয়কে মুসলমানরা ধোঁকা দিয়েছে।' বললেন পন্ডিতজী।

'আর আমাদের ধর্ম সেই ধর্ম যার জন্য নারীরা যে কোন কুরবানী করতে পারে। ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকারকারী নারীদের দেবতারা ধরিত্রী থেকে তুলে আকাশে নিয়ে তাদের ছায়াতলে ঠাঁই দিয়ে থাকেন।' বললেন দাহির।

'মহারাজের জয় হোক। আমাদের নারীরা তখনও ত্যাগ স্বীকার করবে যখন আমরা ময়দানে কচুকাটা হতে থাকব।' বললেন জনৈক ফৌজি অফিসার।

''আমি কি-বলতে চাই, তোমরা তা বোধগম্য করতে পারনি। আমাদের যুবতীরা আসন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।' বললেন দাহির।

'সত্যিই তোমরা বুঝতে পারনি।' পন্ডিতজী বললেন, 'কি নাম যেন তার! ওহ্‌হো বিন কাসিম। সে তলোয়ার ও লড়াইকে ছেলের হাতের মোয়া মনে করেছে। দেবতাদের সাথে সে আগুন নিয়ে খেলছে-কে বোঝাবে তাকে একথা। আমাদের এক সুন্দরী যুবতী তার কাছে গেলে দেখবে তলোয়ার পড়ে গেছে। অবুঝ বাচ্চার হাতের দামী খেলনা ছিনিয়ে না নিয়ে তাকে নকল একটি খেলনার টোপ দিলে সে কি তা লুফে নেবে না?

'কিন্তু এই খেলনা দ্বারা তাকে আমরা আর বশ করতে যাব না। ময়দানেই তার সামনে আমাদের লড়াই হবে। আমার সামনে ভিখারীর মত সে পতিত থাকবে।' দাহির বললেন।

॥ দুই ॥

দাহিরের এই মজলিসে উজীর বুদ্ধমান ছিলেন না। তিনি রাজা দাহিরের আপন বোন আবার যে কিনা স্ত্রীও তার সাথে ওই মহলের এক কোণে কথা বলছিলেন। যে সুন্দরী নারীর টোপ ফেলানোর আলোচনা চলছিল এর যাবতীয় জিম্মাদারী মায়ারাণী ও উজীরের ওপর ন্যস্ত।

ইতিহাস কালের সাক্ষী যে, বিশ্বের দু'টি জাতি তলোয়ারের চেয়েও ধোঁকা ও প্রতারণাকে বড় হাতিয়ার বানিয়েছে কালে কালে। এর একটা হচ্ছে ইহুদী অপরটা হিন্দু। ইহুদীরা কোনদিনও মুসলমানদের সাথে খোলা ময়দানে নামেনি। তারা সর্বদা পর্দার নেপথ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারা এ জন্য দুটো হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। একটা অঢেল টাকা পয়সা। দ্বিতীয় ঃ তাদের সুন্দরী নারী।

ইহুদীদের এই কুলাঙ্গারপনা ইতিহাসে ভুরি ভুরি। তারা মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করলে নারীদের নজরানা দিত। এরাই মুসলিম সালতানাতের শেকড় কাটত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ মোগল সম্রাট আকবর। তার হেরেমে এমন ছলনাময়ী সুন্দরী নারীতে ঠাসা ছিল। এই হিন্দু রমণীরা তাকে এমন বিগড়ে দিয়েছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত দ্বীন-ই-ইলাহীর মত শয়তানী ধর্মের জন্ম দিয়েছিলেন।

যে জাতি সোহাগী নারী চাই তাকে এক রাত মাত্র বাসর করানো হোক না কেন, তার বিধবাকে জ্বলন্ত চিতায় নামায় তাদের জন্য এ কাজ খুব একটা কঠিন নয়। এটা তাদের ধর্মকর্ম। হিন্দুরা তাদের চানক্য নামক লেখকের আরোথ শাস্ত্র বইটি পড়ত। এ বইটি বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের শত বছর পূর্বে লেখা। কূটকৌশলের জনক এই চানক্যকে দাহির অবতার মনে করতেন।

॥ তিন ॥

এক অবতারের মত সম্বর্ধনায় বিন কাসিমকে বরণ করে নিল নিরূনবাসী। তিনি সুন্দর সোমনিকে স্বায়ত্তশাসক ঘোষণা করলেন। অবশ্য প্রশাসন নিজের হাতে রাখলেন। এই শহরের প্রথম নির্মাণ হচ্ছে মসজিদ। আজ হয়ত বলা সম্ভব নয়, বিন কাসিম নিজ হাতে হায়দ্রাবাদের কোন মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

বিন কাসিম দ্রুত কোথাও সৈন্য পরিচালনা করতেন না। কুচ করার পূর্বে চলার পথের রসদ ও বাহিনীর সার্বিক নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করতেন। তিনি জানতেন, দাহির মুসলিম বাহিনীর পথ দূর পাল্লার করতে চাইবে। এদিকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দিন রাত্রির ভাবনা কেবল সিন্ধু আর সিন্ধু। তিনি রোজানা কমাণ্ডো পাঠাচ্ছিলেন। এজন্য দেবল হলো রসদভাণ্ডার ও সেনা ক্যাম্প। এগুলো আসত সমুদ্র পথে।

বিন কাসিম আরেকটি কাজ করলেন। নিরূনের ফৌজ না লড়েই এ শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল। নিরূনের ফৌজের প্রধান তার কিছু বাহিনীসহ পালিয়ে গিয়েছিল। বিন কাসিমকে বলা হয়েছিল, নিরূনের ফৌজ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিল, এমনকি তারা নিরূনের গভর্ণরের নির্দেশ অমান্য করারও মনস্থ করেছিল। কিন্তু গভর্নর ফটক খুলে দিলে তিনি ঘোষণা করেন, এক্ষণে না শহরবাসী লড়বে, না লড়বে আমাদের ফৌজ।

এ তথ্য জেনে তিনি অনুধাবন করলেন, এই বাহিনী যে কোন সময় মারাত্মক হয়ে ওঠতে পারে। এজন্য তিনি নিরূন বাহিনীকে ময়দানে সমবেত করলেন। দোভাষীর মাধ্যমে ওই ফৌজকে সম্বোধন করে বললেন–

'হিন্দুস্তানী সিপাহি ভায়েরা! তোমাদের হৃদয়ে এখনও এই ভয় যে, তোমাদের আমরা কতল করে ফেলব! সত্যি বলতে কি, এমনটিই করার কথা। একটা ধারা

প্রতিটি দেশে চলে আসছে, যে কোন দেশ জয় করা হোক না কেন, তার বাহিনীকে শেষ করে দেয়া। তবে এই নিয়ম সেই সব বিজেতাদের যারা নিছক দেশ জয়ের উদ্দেশে অভিযান চালায়। বিজিত সৈন্যকে এজন্য খতম করে যে, তারা এই বিজয় কাফেলার জন্য না আবার হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আমরা নিছক দেশ জয় কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় এ দেশে আসিনি। আমরা আল্লাহর একটি হুকুম নিয়ে এসেছি। সেই হুকুম আমরা তোমাদের ওপর এ জন্য প্রয়োগ করব না যে, তোমরা আমাদের শহরে পৌঁছার পূর্বেই হাতিয়ার ফেলে দিয়েছ। আমরা স্রেফ সেই সব লোককে হত্যা করব বা করেছি—যারা হাতিয়ার উঠিয়েছে। আমরা তোমাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করছি। তোমরা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ভেবে দেখ। তোমরা এতে সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পেলে গ্রহণ কর। সাথে সাথে এও ভেবো, তোমাদের যে মূর্তিগুলো আমাদেরকে এই শহরে প্রবেশে বাধা দিতে পারল না–তারা তোমাদের কিইবা মদদ করতে পারবে। মাছি পর্যন্ত তাড়ানোর শক্তি নেই তাদের। সাথে এও ঘোষণা করছি, তোমরা যারা এখান থেকে চলে যেতে চাও, নির্বিঘ্নে যেতে পার। অবশ্য দ্বিতীয় বার সে আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না।'

বিন কাসিমের এই হৃদয়স্পর্শী ভাষণে বেশ কিছু ফৌজ ইসলাম গ্রহণ করে। এসব লোক এতদিন মৃত্যু ভয়ে কুচকে গিয়েছিল। প্রাণ রক্ষার কল্পনাও করেনি তারা। বিন কাসিমের এই ফায়সালার জবাবে তারা 'আরব শাহজাদার জয়' নারা লাগাল।

শহরের পণ্ডিতেরা সর্বত্র একটা ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, মুসলমানরা বড্ড জালিম, যেখানেই তারা যায় সব জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যুবতী নারীদের ছিনিয়ে নেয়।

কিন্তু এসব অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হলো। শহরে শান্তির পরিবেশ কায়েম হলো। নিরূনে যে মসজিদ কায়েম হলো তা নির্মাণে শহরের জনতা ও সেপাইরা অংশ গ্রহণ করল।

॥ চার ॥

বিন কাসিমের খীমা।

এশার নামাযান্তে তিনি শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এ সময় খবর এলো, নিরূনের কিছু মহিলা সালারের সাথে দেখা করতে চান। বিন কাসিম তাদেরকে ডেকে পাঠালেন।

সাত/আটজন যুবতী নারীর সাথে বৃদ্ধা এক মহিলা প্রবেশ করল। এরা সবাই হিন্দু। সবাই অতুলনীয়া সুন্দরী। খীমায় এসে তারা হিন্দুয়ানা স্টাইলে অভিবাদন জানাল। বুড়ো মহিলাটি আগে বেড়ে বিন কাসিমের পায়ে মাথা ঠোকাল। বিন কাসিম পেছনে সরে গেলেন। এরপর যুবতীরা আগে বাড়ল। কেউ তার হাত ধরে

চুমো আবার কেউ কোর্তার প্রান্ত চোখে ছোঁয়াল। সকলের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব সুস্পষ্ট। দোভাষী ডেকে এদের আগমন হেতু জানতে চাইলেন তিনি।

'তোমরা কি উদ্দেশে এসেছ?' সালার প্রশ্ন করেন।

'আমরা দীর্ঘদিন পর শুষ্কঘাস ও ভূমির মধ্য থেকে বেরিয়েছি। আমাদের লোকেরা এই যুবতীদের লুকিয়ে রেখেছিল।' বৃদ্ধা বলল।

'কেন?'

'আমাদের বলা হয়েছে, মুসলমানরা শহর জয় করেছে। ওরা সর্বাগ্রে যুবতী নারীদের জমায়েত করে ভাগ করে নেয়। আরো বলা হয়েছে, এ জাতি বড় হিংস্র। সুতরাং শহর ফটক খোলার সঙ্গে সঙ্গে যুবতীদের যেখানে সম্ভব লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু আমরা এর উল্টাটি পেয়েছি। আর আজ শুনলাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা। আপনি ও আপনার ফৌজের কিছু করার থাকলে এতক্ষণে করে ফেলতেন। আমরা লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছি। পথে আপনার বাহিনী আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।' বললেন বৃদ্ধা।

'কিসের ভয় ছিল তোমাদের? তোমার তো যৌবন শেষ। এক্ষণে চুলে পাক ধরেছে।'

'আমি এই যুবতীদের নিজের কাছে রেখেছিলাম। আপনি দেখছেন ওরা কেমন সুন্দরী। বিজেতা সালারকে বোধকরি এদের সৌন্দর্য কীর্তন করতে হবে না। ওরা আপনার শোকরিয়া জানানোর খায়েশ ব্যক্ত করে আমাদের কাছে। ওদের পীড়াপীড়িতেই আমার আসা।

'তুমি একে যতটা আশ্চর্য বোধ করছো আমাদের কাছে এটা ততটা নয়। আমরা এই দূরপাল্লার পথে এ জন্য নামিনি যে অমোদ-ফুর্তি করব। তোমাদের গোলাম বানানোও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের জান মাল ইজ্জত আব্রু হেফাজত আমাদের জিম্মায় ফরজ। এটা আমাদের ধর্মের নির্দেশ। যাও সকলে ঘরে ফিরে যাও।'

ওই যুবতীদের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল তারা ওখান থেকে বেরোতে চাচ্ছিল না। তন্মধ্যে একজন ছিল পরমা সুন্দরী। বিন কাসিমের নির্দেশে এরা বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরমা সুন্দরী যুবতী ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে বললঃ

'আমি এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই।'

'কেন?' সালার প্রশ্ন করেন।

'আপনাকে রক্ত-মাংসের মানুষ মনে হচ্ছে না। অবতার মনে হচ্ছে। কিছু জানতে চাই। চাই বুঝতে।'

বৃদ্ধা মহিলা চলে গেলেন। চলে গেল বাকী মেয়েরা। দোভাষী বেরিয়ে গেল। রয়ে গেল কেবল ওই পরমা সুন্দরীই।

॥ পাঁচ ॥

তিনি-চার দিন পর নিরূনে এক ভৌতিক খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকলে জানল, মন্দিরের প্রধান পন্ডিত আচমকা মারা গেছেন। বিন কাসিম বিধর্মীদের পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। হিন্দুরা যথেচ্ছা মন্দিরে আনাগোনা করত আর বৌদ্ধরা প্যাগোডায়। এহেন এক পন্ডিতের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। বিন কাসিমও এ খবর পেলেন। তিনি পন্ডিতজীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করতে বললেন। গোয়েন্দা প্রধান শাবান ছাকাফী লাশ দেখামাত্রই বললেন, বিষ প্রয়োগে তার মৃত্যু হয়েছে। বিন কাসিমকে তিনি এই রিপোর্ট-ই দিলেন। সালারে আলা বললেন, সন্ধান নাও! এই বিষ কোন মুসলমান প্রয়োগ করেছে কি-না?'

শাবান ছাকাফী মন্দিরের সমস্ত পূজারী পুরোহিতবৃন্দকে জমায়েত করলেন। বললেন, তাঁর সাথে কারো দুশমনি ছিল কি-না! এতটুকু জানা গেল পরমা সুন্দরী এক যুবতী গভীর রাতে মন্দিরে আগমন করেছিল। কেউ জানতে পারেনি সে কখন বেরিয়ে গেছে।

'ওই যুবতীর নাম সোমারাণী কি?' প্রশ্ন গোয়েন্দা প্রধানের।

'হ্যাঁ!' জনৈক পন্ডিত জবাব দেন।

এই পন্ডিত ছাড়া আর কেউ নাম জানতেন না। নাম শুনে শাবান পন্ডিত প্রধানের খাস্ কামরায় যান এবং তল্লাশী চালান। ওখানে একটি পেয়ালা পড়েছিল। শারাবের দু'এক ঢোক তখনও বাকী। তিনি একটি কুকুর ডেকে তা খাইয়ে দিলে ওটি মারা যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সেই যুবতী?'

সকলেই না জানার কথা বলল। সকলকে মন্দিরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো হলো। সংখ্যায় এরা সাতজন। তিনি কয়েকজন তীরন্দাজ ডেকে তাদের ধনুকে তীর সংযোজন করতে বললেন।

'এক্ষণে কেবল সে-ই বাঁচবে, যে ওই যুবতী নারীর সন্ধান দিতে পারবে। কে বলতে পার?' শাবান কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সকলে নিশ্চুপ। তিনি তীন্দাজদের প্রতি ইশারা করলে তারা ধনুকের ছিলা টান করলো।

'আমি বলছি।' জনৈক পন্ডিত বলে ওঠলেন।

শাবান তাকে আলাদা করলেন। তিনি বললেন, আমরা রাতেই শুনেছি সোমারাণী পন্ডিতজীকে বিষ খাইয়েছে। আর তা এভাবে জেনেছি, এক পন্ডিত ওই সময় বড় পন্ডিতজীর কক্ষে প্রবেশ করছিলেন। আর সোমা বেরোচ্ছিল। পন্ডিতজী মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তিনি কষ্ট করে এতটুকু বলতে পেরেছিলেন, ওকে ধর। ও, আমাকে বিষ খাইয়েছে। তার কথামত সোমাকে গ্রেফতার করা হলো। সকাল বেলা শহর ফটক খোলা হলে পুরুষের ছদ্মাবরণে সে পালিয়ে যায়।

'কোথায়?' গোয়েন্দা প্রধান জিজ্ঞাসা করেন।

'এতক্ষণে সে হয়ত আরোড়ের অর্ধেক পথ পৌঁছে গেছে। প্রধান পুরোহিতকে হত্যা সাধারণ অপরাধ নয়।' 'হয়ত তাকে কিছুদিন মারাত্মক দৈহিক শাস্তি দেয়া

হবে। পন্ডিত হত্যাই তার মূল অপরাধ নয়; বরং যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যার কথা বলা হয়েছিল তাকে সে ঘায়েল করতে পারেনি। উল্টো পন্ডিতজীকে সে বিষ প্রয়োগ করেছে।'

'প্রকৃতপক্ষে কাকে বিষ প্রয়োগ করার কথা ছিল?'

'আপনাদের সালার মুহাম্মদ বিন কাসিমকে।'

'যুবতী মন্দিরে এসে বলেছে কি সালারে আলাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা না করার কারণ?

'না। সে এসেই মন্দিরের পন্ডিত প্রধানের কক্ষে প্রবেশ করে।'

'এই মন্দিরে কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে? তোমরা কুকুরের মত মরতে না চাইলে বলো, এখানে কি কি ষড়যন্ত্র চলছে। আমার মর্জির ওপর এখন তোমাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করবে।'

'মিথ্যা বলব না। সেদিন রাতে কিছু যুবতী নিয়ে জনৈকা বৃদ্ধা আপনাদের সালারের কাছে গিয়েছিল। এটা ষড়যন্ত্রের একাংশ। আমরা শুনেছি, মুসলমানরা সুন্দরী নারীর প্রতি দুর্বল। আমাদের উজীর খুবই বিজ্ঞ। তিনি বলেছেন, আরবের সালার উঠতি যুবক। নারী ফাঁদে সে পা দেবেই।

তাদের আমোদ ফুর্তিতে আটকে যুদ্ধের অগ্রযাত্রা রুখতেই এ পন্থা। সোমার ওখানে থাকার কথা। সে-ই পারত সালারকে মায়াজালে আটকাতে। পরে যে কোনদিন আমাদের বাহিনীর দ্বারা অবরোধ করে আপনাদের শেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা ছিল। অবরোধ হলে সুযোগ বুঝে সোমার বিষ প্রয়োগে বিন কাসিমকে মেরে ফেলার কথা।'

'তা কিভাবে?'

'যুবতীর হাতে ঢাকনাওয়ালা আংটি ছিল। খুব কাছ থেকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, এতে ঢাকনা আছে। এর ভেতরে এমন মারাত্মক চূর্ণ বিষ ছিল যা সেবন করা মাত্রই মৃত্যু অবধারিত। সোমার সুযোগমত পানি কিংবা শরবতে ওই বিষ মিশ্রণ করার কথা। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র কি করে ব্যর্থ হলো–তা জানি না। আপনি যেহেতু আমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন সেহেতু বলছি। আপনাদের সালারকে খুব সাবধানে রাখবেন। এটা ভারতবর্ষ। এটা তেলেসমাতি ও ধোঁকার স্বর্গরাজ্য। সালার কেল্লার পর কেল্লা জয় করবেন। কিন্তু যে কোনদিন তাকে বিষ প্রয়োগে মরতে হতে পারে।' বললেন পন্ডিত মশাই।

এদিকে সেই বৃদ্ধা মহিলা অতিদ্রুত সকল যুবতীকে নিরূন থেকে বের করে নিল। মন্দিরের সকল ঠাকুর, পুরোহিত ও দাস-দাসীদের গ্রেফতার করা হলো। সকলেই নিজ নিজ কৃত অপরাধ স্বীকার গেল। সকলেই বিন কাসিম হত্যা ষড়যন্ত্রে শামিল। তারা জবানবন্দির এক পর্যায়ে বলেছে, এই ষড়যন্ত্রের হোতা খোদ রাজা দাহির, তাঁর উজীর ও মায়ারাণী।

'আমরা তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করিনি। তোমরা আমাদের উদারতাকে দুর্বলতা ভেবে একি করলে! তার মানে তোমরা জীবিত থাকতে চাও না। এই তো!' বললেন শাবান ছাকাফী।

'হে আরব সেনা!' পন্ডিত আশ্চর্য রকমের মুচকি হেসে বললেন, 'আমি জীবিত থাকতে চাই না-ঠিকই, কিন্তু আমার ধর্মকে জীবিত রাখতে চাই। আমরা স্রেফ সালারে আলাকে নয়, আপনাকেও কতল করতে চেয়েছিলাম। ছোট বড় তামাম সেপাইও এই তালিকার বাইরে নয়। আপনার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত দুশমনি নেই। এটা আমাদের ধর্মের সংঘর্ষ। জানতাম ধরা পড়লে মারা পড়ব। যেভাবে ধর্মের নামে আপনারা জীবন দেন সেভাবে আমরাও দিতে প্রস্তুত।

'বেকুফ পন্ডিত তুমি! বাতিল পূজারীর পরিণতি এই-ই হয়। খোদা তাদের বিবেকের ওপর পর্দা ফেলে দেন। কান বন্ধ করেন। চোখে ঠুলি এঁটে দেন। দেখতে পারা গেলেও সেই চোখে কোন কাজ হয় না। তখন তারা ধোঁকা খায়।' বললেন শাবান।

'বেকুফ আরব হে!' আমি তোমার সাথে তর্কে যাব না। আমার গরদান তোমার জল্লাদের হাতে। জানি তোমরা এদেশে ইসলাম ছড়িয়ে দেবে। যদিও হিন্দুধর্ম এদেশের মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত। তারা আস্তে আস্তে এই ধর্মের ক্ষমতা তোমাদের দেখাবে। আমাদের অশরীরী আত্মাগুলো অতি অবশ্যই তোমাদের পেছনে ঘুরবে।' পন্ডিত আচমকা হাত উঁচিয়ে বললেন, 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে নাও! তোমাদের সালার শেষ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের শিকার হবেনই। হিন্দুদের হাতে না মরলেও তিনি স্বজাতির হাতেই মারা পড়বেন।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার দৃষ্টি খুবই সুদূরপ্রসারী। তোমাদের জাতির অধঃপতন শুরু হয়েছে। হে আরব্য সালার। আমি জ্যোতিষী কিংবা গণক নই। বিবেকের দৃষ্টিকোণে কথাগুলো বললাম।

ওই দিন মুহাম্মদ বিন কাসিম মন্দির বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দেন। হিন্দুরা যার যার বাড়ীতে পূজা-অর্চনা করবে। এর পাশাপাশি ষড়যন্ত্রকারী সমস্ত পন্ডিত ও ঠাকুরদের হত্যার নির্দেশ জারি করলেন।

॥ ছয় ॥

নিরূনে যখন ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন আরোড়ে সোমারাণী রাজা দাহির, উজির, ও মায়ারাণীর সম্মুখে পন্ডিত হত্যা অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধীবেশে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাকে শুকানো হচ্ছিল। দড়ি বেঁধে তাকে রাস্তায় ঘোরানো হয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিল না। উজির ও মায়ারাণী জিজ্ঞাসা করছিলেন, বিন কাসিমকে না মেরে পন্ডিতকে মারতে গেলে কেন? এর জবাবে সে কেবল পানি চাইল কিন্তু পানি দেয়া হলো না।

'আমি পিপাসায় মরে গেলে তোমাদের প্রশ্নের জবাব কে দেবে? মিথ্যা বলছি না, আগে পানি পান করাও পরে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।' সোমা বলল। শেষ পর্যন্ত তাকে কিছু খাদ্য ও পানি দেয়া হোল।

অতঃপর এই পরমা সুন্দরী সোমার কথা দ্বারা জানা গেল, নিরূনের নারীদের প্রতি মুসলিম জাতি অমায়িক ব্যবহার করেছে। সোমা ট্রেনিং মোতাবেক সালারকে কুপোকাতের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অন্য সব মেয়েরা বেরিয়ে গেলে সে বসে ছিল। সে যেহেতু অভিনয় জানত তাই বেরোয়নি।

সোমা বলল, মুহাম্মদ বিন কাসিম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি যাও! ওরা তোমার অপেক্ষা করছে।'

'আমাকে কি আপনি আপনার কাছে খানিক বসার সুযোগ দেবেন না?'

এবার আমি আরবীতে বলা শুরু করলাম। আমার ভাষায় চমকে ওঠে বিন কাসিম প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আরবী মেয়ে নও। কিন্তু আরবী ভাষা শিখলে কি করে?'

'আমি দেড় বছর আরবদের সাথে মাকরানে ছিলাম। আরবদের আমি খুব পছন্দ করি। তাই আপনার কাছে কিছুক্ষণ বসার সুযোগ দিন।'

'আমার কাছে তোমার কি কাজ?'

'জানি, আপনি শহরে নারীদের পেরেশান করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা বোঝলাম, আপনি দেবতা বৈ তো নন। আমার ধারণা ছিল আপনি বুড়ো, কারণ এই মহৎ গুণের অধিকারী বয়সী মানুষেরা-ই হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষণে অনুধাবন করলাম, বয়সের তুলনায় আপনি ঢের গুণের অধিকারী। ভেতর-বাইরে সমান। আমি আপনার পূজারিণী হতে চাই।'

'তোমাদের ধর্মের খারাপ দিক এটাই। কোন মানুষের প্রতি দুর্বল হলেই তাকে পূজা শুরু করে দাও। আমি যে হুকুম দেই তা আল্লাহর নির্দেশ মতই।'

'আমি ধর্মত্যাগ করতে রাজি। আপনি আমাকে আপনার কাছে রাখলে আর ফিরে যাব না।'

'তোমাকে কেবল বিবাহের শর্তে কাছে রাখতে পারি। কিন্তু আমি এখানে বিবাহ করতে আসিনি। আর আমি এমন বাদশাহও নই যে, দেশ জয় করে দেশের সেরা মেয়েদের বিবি বানাব। আমি এসেছি অন্য উদ্দেশে।'

সোমারাণী উজীর ও মায়ারাণীকে তাদের বাতলে দেয়া পন্থানুযায়ী কাজ করেছে বলে মত ব্যক্ত করল। বলল, আমি তার পৌরুষ-যৌবন ঝাঁঝিয়ে দেখেছি। চাল-চলন, বাচনভঙ্গি, ক্রূর চাহনি কোনটাই বাদ রাখিনি। কিন্তু সে লৌহ মানব। আসমানের অবতার।

শেষ পর্যন্ত সালার আমাকে কাছে ডাকলেন। বুঝলাম শিকার ফাঁদে পা দিচ্ছে। কিন্তু ওমা! তিনি আমার হাতে হাত রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি আমার আংটির দিকে। আংটিটি স্বর্ণের। উপরি অংশ সামান্য উঁচু। তিনি বললেন, খুব সুন্দর আংটি যে?'

আমি বললাম, আপনি এটি নিতে পারেন।

'না, ওর মধ্যে আমার জন্য যা এনেছো তা দাও।'

আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। অকস্মাৎ তাঁর চেহারার রং বিগড়ে গেল। তিনি সজোরে আমার আংটিওয়ালা হাতে চাপ মারলেন। আংগুলটি ধরলেন। আমি হাত ছাড়ানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছিলাম। টানাটানিতে আংটির ঢাকনা খুলে গেল। তিনি দেখলেন ওর মাঝে সাদা চূর্ণ পদার্থ। মুচকি হাসলেন সেই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি।

আমার চেহারার রং তখন বিবর্ণ। তিনি বললেন, 'মিথ্যা বলে লাভ নেই। এই সাদা চূর্ণ আমার জন্য নয় কি?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা হেলালাম।

'কিভাবে এই জিনিস আমাকে সেবন করাতে চেয়েছিলে?'

'আমি বুঝেছিলাম, এ কাজ কঠিন নয়। আমার রূপের আগুণে নিরূনবাসী পুড়ে মরতে বাধ্য। শুনেছি মুসলমানরা মদ খায় না, কিন্তু জোয়ান সালার আমার রূপসুধা পানে মত্ত হতেই পানির পাত্রে তা ঢালব সাব্যস্ত করেছিলাম। এক্ষণে আর কিছু বললে আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না।' আমি বললাম।

'যা বলার বলে ফেল।' তিনি বললেন—

'খুব সম্ভব আপনাকে বিষপান করাতে পারতাম না। যে উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলাম, আপনার আপাদমস্তকে তাকিয়ে তা শ্লথ হয়ে গেছে। আপনি বিশ্বাস করবেন না। এক সাজা থেকে বাঁচতে আমি আরেক সাজার মুখে পড়েছি। শাস্তি যা দেয়ার আপনিই দিন। অন্যের হাওয়ালা করবেন না। ওই বিষ আমার মুখে তুলে দিন। এত মারাত্মক এই বিষ যা সেবন করলে মরতে সময় নেবে না। অতঃপর যেখানে মন চায় আমার লাশ ফেলে দিন।'

'না মেয়ে। তুমি যদি আরবী হতে এবং তোমাকে যারা এখানে পাঠিয়েছে, মদের চেয়েও আকর্ষণীয় যারা মনে করেছে তোমায়, তাহলে আমার তলোয়ার এতক্ষণে তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলত। কিন্তু দুশমনকে প্রভাবিত করতে আমার তলোয়ার উত্থিত হয়নি কোন দিনও। ইসলাম এমন নির্দয় ধর্ম নয়। তোমাকে বাঁচার সুযোগ দিয়ে তোমাদের রাজা আর উজীরের কাছে জিন্দা পাঠাতে চাই।' তিনি বললেন।

'আপনি মানুষ নন। আমি আরবী ভাষা জানি। সাক্ষাৎ ফেরেশতা আপনি। প্রথমে আপনাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বলেছিলাম, আমাকে আপনার কাছে রেখে দিন। কিন্তু এক্ষণে সাচ্চা দিলে বলছি, আমাকে আপনার দাসী বানিয়ে নিন। ভয় নেই, আপনার কাছে ঘেঁষবনা কোনদিনও। দূর থেকে আপনাকে দেখে জীবন কাটাব। আমি সত্যিই আপনার পূজারিণী হতে চাই সালারে মুহতারাম।' বললাম আমি।

তিনি বললেন, 'আমি তোমার প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি। তোমাদের রাজা ইতঃপূর্বে যে তিন হিন্দু যুবতীকে মাকরান পাঠিয়েছিল, যারা আরবদের বিবাহও করেছিল, তাদেরকে আরোড় পাঠিয়েছি। তুমি হয়ত সে কথা জানো না। আমি তোমাদের রাজা ও উজীরকে তাদের মারফত খবর দিয়েছিলাম, লড়াই পুরুষেরা করে—মেয়েদের দিয়ে করাতে যেও না।'

'আমি ওই তিন যুবতীকে চিনি।'

'এবার তোমাদের রাজাকে বলো, আত্মসম্ভ্রমবোধহীন! তুমি কি মনে করেছ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আসা খোদার সৈনিকদের তুমি রুখতে পারবে?'

এরপর আমি দেবতার সামনে নতজানু হয়ে বসলাম। আমার শিকার আমাকেই শিকার করল। চোখে দেখা দিল কৃতজ্ঞতার বড় দুফোঁটা আঁসু।

তিনি বললেন, ভাগ্য বিড়ম্বিত মেয়ে! আমরা সেই ধর্মের বাহক, নারীকে যারা বড্ড শ্রদ্ধার নজরে দেখে থাকে, নারীদের উদ্ধারে সেই সুদূর আরব থেকে আমি এসেছি। নারীর জন্য আমরা জীবন দান করি, নারীকে জীবন দান করাতে নয়। তুমি হয়ত জানো, তোমাদের রাজা নিছক আমাদের জাহাজ লুট করেনি, এর যাত্রীদেরও বন্দী করেছিল। সেই কয়েদীদের উদ্ধারকল্পে আমরা লড়াই শুরু

করেছি। আমাদের দু'সালার প্রথম হামলায় মারা গেছেন। এবার আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তবেই এসেছি। হাজ্জাজের কাছে জনৈকা তরুণী ফরিয়াদ জানিয়েছিল তাকে উদ্ধারে। সবকিছু ছেড়ে আমরা সেই তরুণীর ডাকে সাড়া দিয়েছি।

'আপনি কয়েদীদের উদ্ধার করে ফেলেছেন?'

'শুধু কয়েদী নয়, এক জালিম শাহীর হাত থেকে পুরো দেবল উদ্ধার করেছি। যে রাজা তোমার মত কাঁচা সোনার রঙে মাখা পরমা সুন্দরীকে দুশমনের শিবিরে ইজ্জত বিক্রি করতে পাঠায় সে কি জালিম নয়? তুমি কি এই স্বপ্ন বুকে লালন করো না যে, তোমার বীর বাহাদুর স্বামী ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে?'

'আরব্য শাহজাদা! আমার মত অসংখ্য নারী বিবি হয়ে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে। আমাদের বয়সী উপলব্ধি হওয়ামাত্রই এই কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমরা পুরোহিতদের বিছানায়ও গেছি। কিন্তু আপনি আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়েছেন।'

'তুমি এখন যেতে পার।

'কিন্তু কোথায়?'

'বড় মন্দিরে!'

'আমি তোমার সাথে দু'রক্ষী দেব।'

'না, আমি একাই যাব।'

॥ সাত ॥

'মরার পূর্বে আমি সব কথা ফাঁস করে দিতে চাই,' দম নিয়ে বলল সোমারাণী। উজীর ও মায়ারাণী সে কথা গোগ্রাসে গিলছেন। 'আমি মন্দিরের পথ ধরলাম। মনে হচ্ছিল মুসলিম সালার আমার সাথে রয়েছেন কিংবা তিনি আমাকে জাদু করেছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত মন্দিরের চৌহদ্দীতে গিয়ে পা রাখলাম। আংটিতে ভরা বিষ নিজের মুখেই পুরে দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মাটি ও পাথরের মূর্তিকে লজ্জিত না করে মরতে চাইলাম না।'

উজীর বুদ্ধমান সোমার মুখে প্রচন্ড এক চড় বসিয়ে দিলেন। বললেন, ওই ম্লেচ্ছ মুসলিমের জাদু তোমাকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে, দেবতা ও ভগবানের ওপর হাত ওঠালে?

'আমি ওর শরীরের জোড়া জোড়া আলাদা করে ফেলব। ও ওই লুটেরা দস্যু সেনাপতির স্ত্রী ও দাসী হতে চেয়েছিল।' মায়ারাণী রাগের মুখে বললেন।

'রাণী হওয়ার স্বপ্ন দেখছ। বল এরপর কি হোল?' বললেন উজীর।

সোমার মুখে হাসির করুণ এক চিলতে খেলে গেল। বলতে লাগল, মন্দিরে ঢোকলাম। অন্যান্য যুবতীরা মেহমানখানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রধান পুরোহিত তখনো জাগ্রত। বুদ্ধমান তার গালে আরেকটি চড় কষলেন।

'বল! পন্ডিতজী মহারাজ জেগে ছিলেন।'

'আমি যা বলছি তা আবারো বলব। আমার হৃদয় থেকে যার শ্রদ্ধা মিটে গেছে ঘৃণাভরেই তার নাম স্মরণ করব।' সোমা বলল।

'যা বলছিলি বল। বকবক করিস না।' মায়ারাণী বললেন।

'বড় পন্ডিত আমার অপেক্ষায় জাগ্রত ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, কাজ সেরে এসেছ? বললাম, হ্যাঁ। পন্ডিত খুশীতে হরিবোল দিয়ে ওঠল। দু'হাত উঁচু করে থাকল। এরপর আমাকে পাঁজাকোলা করে ওঠাল। নিয়ে গেল তার খাস কামরায়। তার থুথুর দুর্গন্ধ এখনও আমার গালে বিদ্যমান। সে আমাকে বিছানায় ছুঁড়ে মারল। তখন সে ক্ষিপ্র ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করছিল। আমার সিদ্ধান্ত বদলে গেল। আমার জীবনে পুরুষের অস্তিত্ব এই প্রথম নয়। ওই পন্ডিতের কাছে আরো দু'বার গিয়েছিলাম। সেই দু'বার সে আমাকে সম্মানের সাথে বিদায় দিয়েছে। এবার আমি আর পাথর থাকলাম না। পাপের প্রতি আহ্বানকেও আমি পাপ মনে করি। মুসলিম সালার আমাকে নাগালে পেয়েও কতল কিংবা ইজ্জত হরণ করল না। কোথায় সেই অবতার আর কোথায় এই কুলাঙ্গার পন্ডিত। মুসলিম সেনাপতির ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদের শাস্তি মৃত্যু জেনেও এই বুড়ো পন্ডিতকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমার আপাদমস্তক তার প্রতি ঘৃণায় ভরপুর। আমি যে অভিনয় বিন কাসিমের সাথে করতে চেয়েছিলাম সেটা করলাম পন্ডিতের বেলায়। বললাম, জল খাব, এরপর বিছানা থেকে অসংযত কাপড় ঠিক করে সোরাহীর কাছে গেলাম। পন্ডিত বলল, জলপান করে নাও। আজ রাত জলপানেরই, বলে সে আলমিরা থেকে বোতল বের করে বলল, তুমি পান কর, আমাকেও এক ঢোক দাও। আমি দু'পেয়ালা সোরাহীর কাছে নিয়ে গেলাম। পন্ডিত আরেক দিকে ফিরে মাতাল ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করছিল। একটা পেয়ালায় আংটি খুলে বিষ ঢাললাম। ওই পেয়ালাটি তার হাতে দিলাম। সে এক ঢোকে তা গিলে নিল। জানতাম না এই বিষ এত মারাত্মক।

শরাব গলায় ঢুকতেই দু'হাতে সে কণ্ঠনালী টিপে ধরল। সে স্রেফ একটা কথা বলল, একি খাওয়ালে আমাকে। আমি বললাম, পন্ডিতজী মহারাজ! এ সুধা কাউকে না কাউকে খেতেই হত।

আমি দ্রুত বাইরে বেরোলাম। দরোজায় আরেক পন্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ। কামরায় জ্বলছিল ফানুস। পন্ডিত মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওই পন্ডিত দৌড়ে মহারাজের নিকট পৌঁছল। মরতে মরতে সে এতটুকু উচ্চারণ করতে পেরেছিল, ও আমাকে বিষ খাইয়েছে। আমি ভোঁ করে দৌড় মারলাম।'

' কোথায় যেতে চাচ্ছিলি?' মায়া প্রশ্ন করেন।

'তখন তা জানা ছিল না। অবশ্য এখন যদ্দূর মনে পড়ছে, তখন মুসলিম শিবির উদ্দেশ করেই ছুটছিলাম। কিন্তু আমাকে গন্তব্য বদলাতে হলো। কেননা পেছনে ছুটে আসা মন্দিরের লোকদের পদধ্বনি শুনছিলাম। শেষ পর্যন্ত এমন এক গলিতে ঢোকলাম যার মাথায় দরোজা। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে এলো। ততক্ষণে পন্ডিত এ জগতের সফর শেষ করেছে। এরপরের কাহিনী আপনাদের জানা

এরপর এই সোমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়

॥ আট ॥

বিন কাসিমের পরবর্তী টার্গেট সাহুন। এ পথে নানান কেল্লা। কিন্তু ওগুলো নিয়ে তার তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। সুন্দর সোমনি তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, এতে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। তবে ওই শহরের ফৌজ হিন্দু। তাদের থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন না তিনি।

নিরূন গভর্নর সাহুন গভর্নরের কাছে দূত মারফত খবর পাঠিয়ে বলেছিলেন, মুসলিম ফৌজের সাথে লড়ে পারবে না। সুতরাং শহর ও কেল্লার দরোজা খুলে দিও।' কিন্তু এই দূত ফিরে না আসায় বিন কাসিম নিরূন ছাড়তে পারছিলেন না।

একদিন সাকুরা নদীর তীর থেকে মারাত্মক এক খবর এলো। বলা হলো, নদীর কিনারা পাহারাদার চার সেপাইয়ের দু'জন মরে আছে আর দু'জন লাপাত্তা। সেপাইরা পালাক্রমে এখানে সপ্তাহখানেক পাহারা দিত। খীমায় থাকত তারা। দু'দু'জন করে পাহারার কাজ করত। কিন্তু ঐ ঘটনার সময় টহলদার দু'সেপাইও লাপাত্তা। মৃত দু'জনের বুকে ছোরা ঢোকানো।

বিন কাসিম শাবানসহ ওখানে পৌঁছুলেন। তারা দেখলেন উভয়ের মৃতদেহ নদীর তীরে পড়ে আছে। শাবান সাকাফী মাটির দিকে গভীর নযরে তাকালেন। পদচিহ্নের যে দাগ তাতে লড়াই হয়েছে বলে মনে হলো না। দু'জনের তলোয়ারই কোষবদ্ধ। এর দ্বারা বোঝা গেল তারা মোকাবেলার সুযোগই পায়নি।

'ওদের ওপরই আচমকা হামলা করা হলো। খুব সম্ভব ধোঁকা দিয়ে মারা হয়েছে।' বললেন শাবান সাকাফী।

'তাইলে কি ওদের দু'সাথীই এই হত্যাকান্ডের নায়ক? খোদার কসম এটা মনে করি না আমি।' বললেন বিন কাসিম।

শাবান আবারো মাটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন। এলাকাটি বালুকাময় ও অনাবাদী। পায়ের ছাপ ধরে কদ্দুর এগিয়ে লাপাত্তা দু'সেপাইয়েরও লাশ পাওয়া গেল। শাবান বললেন, কামান গণনা করো।'

'গুনে দেখা গেল ছোট একটা কামান নেই। শাবান বললেন, এটা দুশমনের কারসাজি। ওরা একটি কামান নিয়ে গেছে।

কিন্তু বোধগম্য হয় না কি করে এই কামান নিয়ে শত্রুসৈন্য পালাল। শাবান বললেন, এবার দাহির এই কামানের অনুকরণে তার কারিগর দিয়ে কামান তৈরী করবে।

দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম কামান নির্মাতারা মুসলমান। আরবরাই হিন্দুস্তানে কামান নিয়ে এসেছিল। কামান চুরির দ্বারা কারো বুঝতে বাকী নেই, এটা দাহিরের কৌশল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দেহরক্ষীদের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। নদীর এক তীরে শাবান আরেক দিকে খোদ সালার ইবনে কাসিম পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। দু'জনে অনেক দূর গেলেন, কিন্তু কামানের কোন দেখা নেই। যমীনেও এমন কোন নিশানা পাওয়া গেল না, যদ্দারা কিছু শনাক্ত করা যায়। উভয়েই ফিরে এলেন।

'ইবনে কাসিম।' শাবান বললেন, 'আপনি ফিরে যান। ওপারে আমি যাব। আপনার দু'জন দেহরক্ষী আমার সাথে দিন। আপনার এখানে অবস্থান ঠিক হবে না। দুশমন এবার কৌশল পাল্টেছে।'

'এক্ষণে আমাদের নিরূন থাকাই ঝুঁকি। ফওরান এখান থেকে কোচ করতে হবে। আমাদের কামান চুরির অর্থ দুশমনও অমন কামান বানাতে চায়। আমি ওদেরকে একটা কামান বানানোরও ফুরসত দেবনা।' সালারের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'পথিমধ্যে চোরাদের পাকড়াও করতে পারি। কামান এত তাড়াতাড়ি কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দেখুন। গুপ্তঘাতক যেন আপনাকে পেয়ে না বসে।'

বিন কাসিম নিহত মুজাহিদদের তুলে নিতে বললেন। জানাযার জন্য সকলকে একত্রিত করলেন। কেউ জানে না, রাতের কোন্ প্রহরে কামান চুরি হয়েছে? কোথায় নেয়া হয়েছে? শাবান নিজের দলের দু'তিন জন গোয়েন্দা আর বিন কাসিমের দু'জন অফিসার নিয়ে নিলেন। নদীর তীরবর্তী কাঁটাদার বন থেকে তারা চলতে লাগলেন।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর এক তীরে তারা একটি খালি বজরা পড়ে থাকতে দেখলেন। এই নৌকায়ই কামান ছিল। ওখান থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল কামান এই নৌকা থেকে নামানো হয়েছে। ওই কামানটির চারটি চাকা। মাটিতে ছাপ পড়ে আছে টেনে নেয়ার। ওখানে হাতির পায়ের ছাপও দেখা গেল। দেখা গেল অসংখ্য ঘোড়ার খুরের ছাপ। শাবান বুঝলেন, কামান হাতিতে টেনে নিয়েছে। হাতি খুবই শক্তিশালী। তারপরও তিনি কদ্দূর এগুলেন। যে রাস্তায় কামান টেনে নেয়া হয়েছে সে রাস্তা খুব একটা মসৃণ নয়, বন্ধুর।

অনেক পথ যেয়ে শাবান ফিরে এলেন। তিনি শুধু আঁচ করলেন কামান কোন্ প্রদেশে গেছে। অতঃপর নিরূনের পথ ধরলেন।

॥ নয় ॥

'ইবনে কাসিম!' শাবান বললেন, 'কামান চোররা আমাদের চার সেপাইকে হত্যা করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা সিস্তানে নেয়া হয়েছে। আমাদেরকে অতিশীঘ্র রওয়ানা করতে হবে। দুশমনকে কামান তৈরীর সুযোগ দেয়া যাবে না। কামান বানানো তো দূরে থাক ওরা কামান দেখার সুযোগই পাবে না।'

বিন কাসিম সিস্তানে হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এত শীঘ্রই নয়। তিনি যতই সিন্ধুর ভেতরে ঢুকছিলেন ততই সাবধান হচ্ছিলেন। কেননা দাহির তার বাহিনীকে ভেতরেই নিতে চায়।

সুন্দর সোমনি এবারও এক দূতকে সিস্তানের গভর্নরের কাছে পাঠান। বলেন, মুসলিম ফৌজের মোকাবেলা করো না। সিস্তানের গভর্নরও বৌদ্ধ। মুহাম্মদ বিন কাসিমকেও তার অপেক্ষা করতে হল।

দূত এসে খবর দিলেন, সিস্তান শুধু কেল্লাই নয়, দুর্গম পাহাড়ী এলাকাও। রাজা দাহির সিস্তানের গভর্নরকে আরোড় তলব করে তার স্থলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাজী

রায়কে গভর্নর বানিয়েছেন। এখন বুঝে দেখুন। কেন এই রদবদল। বাজী রায় আসা মাত্রই বাহিনীর মধ্যে সাজ সাজ রব। কেল্লা পূর্ব হতেই দুর্ভেদ্য। বাজী রায় সৈন্যদের ঢেলে সাজালেন, যাতে অবরোধ হলে সহজে তাদের কুপোকাত করা না যায়। এছাড়া কেল্লা রক্ষায় নয়া এক অস্ত্র কামান বসানো হয়েছে। জানি না কোথা থেকে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে?

'এই কামান কবে নাগাদ পৌঁছেছে।' প্রশ্ন করেন বিন কাসিম।

'আমার উপস্থিতিতেই। কেল্লার দিকে ওটিকে নিতে দেখেছি। দু'টি হাতি একে টেনে নিচ্ছে দেখলাম। সাথে তেরটি ঘোড়া। অবাক হয়েছিলাম, এখানকার বাহিনী ওই আজব কামান হাসিল করলো কোথা থেকে! এখানে এমন কোন কারিগর নেই যারা কামান বানাতে পারে।'

'এই কামান আমাদের এখান থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তুমি বলতে পার, ওই কামান ওরা কোথায় বসিয়েছে?'

'শহরের প্রবেশদ্বারে। কামানের পার্শ্বে বড় বড় পাথর বসানো দেখলাম।'

বিন কাসিম হো হো করে হেসে ওঠলেন। হাসি কমিয়ে বললেন, 'খোদার কসম! এরা বড্ড মূর্খ। একদিকে আমাদের লোক কতল করে কামান চুরি করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে। অপর দিকে কামান স্থাপনের জায়গা শনাক্ত করতে পারেনি। কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও বোধ হয় জানে না এই মূর্খের দল।'

'সিস্তানের অধিবাসীদের সিংহভাগই বুদ্ধিস্ট। আমি শহর ঘুরে দেখেছি। শহরের লোকজন যুদ্ধ চায় না। কিন্তু বাজী রায় সকলকে ভয় দেখিয়ে বলে চলেছেন। মুসলিম বাহিনী এলে কারো ঘর রক্ষা পাবে না। তারা যুবতী নারীদের ভাগ করে নেবে।' বললেন দূত।

এই একই প্রোপাগান্ডা সবখানেই চালানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর মর্জিতে সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানদের চমৎকার ব্যবহার সকলকে হতবাক করেছে। দেবল বিজয় হলে ওখানকার কিছু ব্যবসায়ী অপরাপর শহরে যায়। নিরূনের কিছু লোক সিস্তানে আগমন করে। তারা যেখানেই গেছে মুসলমানদের প্রশংসা করেছে।

নিরূনের লোকেরা সিস্তানে বলেছে, মুসলিম বাহিনী ফসলী ক্ষেত নষ্ট করে না। লুটতরাজ করে না। যুবতীদের ধরে নেয় না। এতে সিস্তানবাসী প্রভাবিত হয়। সুন্দর সোমনির দূত বললেন, ফৌজ ও শহরবাসীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। সিস্তানের গভর্নর পরিবর্তন দেখে দূত শেষ পর্যন্ত পত্র না দিয়ে গোয়েন্দায় রূপ নেয়।'

মুহাম্মদ বিন কাসিম নিরূন প্রশাসনের জন্য অর্ধেক বাহিনী রেখে বাদবাকী সৈন্যসহ সিস্তানের পথে ছুটলেন।

বিন কাসিম খুবই সতর্ক হয়ে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। গোটা বাহিনী তিন ভাগ করেন। এছাড়া অগ্রগামী বাহিনী প্রেরণ করেন। ডানে-বামে উষ্ট্রারোহী। তার আশংকা ছিল, কামান চোররা শেষ পর্যন্ত গেরিলা হামলা চালালে বিপর্যয় ঘটতে পারে। তিনি তাঁর বাহিনীকে যথাসম্ভব দ্রুত চলতে ও পথে কম বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দেন। দাহিরের মোকাবেলায় এবারের বাহিনী তাঁর কম। কিন্তু এ বাহিনী

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত ছুটে চলছিল। ইসলাম হিন্দুস্তানে প্রবেশ করছিল। রাজা দাহির তা ঠেকাতে আদা নুন খেয়ে নেমেছিলেন। এজন্যই তিনি সিস্তানের বুদ্ধিস্ট গভর্নরকে অব্যাহতি দিয়ে আপন ভাতিজাকে নিযুক্তি দেন। তিনি ফৌজেরও সেনাপতি ছিলেন।

তৃতীয় দিনে আরবের এ বাহিনী মাওজে তাঁবু ফেলে। স্থানটি সিস্তানের শাসনাধীন। মাওজে কোন লোকালয়ই ছিল না। ওখান থেকে সিস্তানও ছিল খুব নিকটে। সিস্তান শস্য-শ্যামল এলাকা। পানিও ছিল প্রচুর।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ আসায় বুদ্ধিস্টরা বাজী রায়কে জানাল, আপনি ফৌজসহ কেল্লার নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। আমরা বেসামরিক লোক অসহায়। লড়াই কাকে বলে জানি না। আমরা রক্তপাত পছন্দ করি না। তলোয়ার দ্বারা মানুষের দেহ ছিন্নভিন্ন করা যায়। তীর দ্বারা বুক ঝাঁঝরা করা যায়। কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। আমাদের মুসলিম সালারের প্রতি আনুগত্য দেখানোর অনুমতি না দিলে ফৌজ পাঠিয়ে তাদের প্রতিরোধ করুন। কোন অবস্থাতেই আমরা লড়ব না।

অতঃপর ভিক্ষুদের একদল বিন কাসিমের কাছে এলেন। বললেন, আপনি যদি লোকালয় কব্জা করতে চান তাহলে জেনে নিন, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না আপনাকে। যদি আপনি উট, ঘোড়া নিয়ে নিতে চান- নিতে পারেন। সৈন্যদের তরি-তরকারিও প্রয়োজনে নিতে পারেন। নগদ পয়সা-কড়ি চাইলেও আমরা দিতে রাজি।'

'মুহাম্মদ বিন কাসিম বললেন, শান্তি ও নিরাপত্তার সামনে কোন মূল্য দাঁড়াতে পারে না। আপনারা দোস্তির পয়গাম রেখেছেন আমরা আপনাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিলাম।'

॥ দশ ॥

বিন কাসিম ওখান থেকে অগ্রসর হয়ে সিস্তানে উপনীত হলেন। শহরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। শহরের সীমান্ত দেয়ালে ফৌজের টহল। বাজী রায় আরব বাহিনীর আগমন টের পেয়ে কেল্লার প্রহরা নিশ্ছিদ্র করেন।

আরব বাহিনী দেখলেন, প্রবেশদ্বারে কামান বসানো। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে জনৈক সহকারী সালার অগ্রসর হয়ে বললেন, কেল্লার দরোজা খুলে দাও। যদি লড়াই করেই দরোজা খুলতে হয় তাহলে জিযিয়া তো দিবেই, উপরন্তু শহরের সমস্ত সম্পদ আমরা অধিকার করব, আর ফৌজি অফিসারদের কারো রক্ষা নেই।

'এসো না। কেল্লা বিজয় করে দেখাও পারলে।' প্রাচীর থেকে চ্যালেঞ্জ ভেসে এলো।

'কামান প্রাচীরের কাছে নিয়ে এসো।' বিন কাসিম নির্দেশ দিলেন।

কামান নেয়া হলে তীর বৃষ্টি ভেসে এলো প্রাচীরের ওপর থেকে। এর জবাবে কামান থেকে পাথর ছোঁড়া আরম্ভ হলো। আরব বাহিনী প্রাচীরের নিকটে চলে যাওয়ায় পাথর ছোঁড়ার মত যুৎসই জায়গা পাচ্ছিলেন না।

কেল্লার মধ্যে ওদিকে তখন হুলস্থুল ব্যাপার। শহরের প্রতিনিধি বাজী রায়ের কাছে এসে বলল, 'মহারাজ! কেল্লার দরোজা খুলে দিন। এ শহরের লোকদের থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। এরা সব বুদ্ধিস্ট।'

বাজী রায় এই মুখপাত্রদের কারাবন্দী করলেন। তিনি ফরমান জারি করলেন, যারা লড়াই করতে না চাও গৃহবন্দী হয়ে থাক। আর যারা লড়তে চাও হাতিয়ার নিয়ে কেল্লা প্রাচীরে চলে এসো।

যেদিক থেকে মুসলমানরা প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করছিল, বাজী রায় সেদিকে তীর বৃষ্টির হুকুম দিল। এছাড়াও মাঝে মাঝে কেল্লা ফটক খুলে হাজারখানিক সওয়ার বের হয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা করে দ্রুত আবার ফিরে যেতে লাগল।

এবার বিন কাসিম সর্ববৃহৎ কামানচালক জু'না সালামীকে ডেকে পাঠালেন। 'জুনা দেখ আমাদের কামানই ওরা কেল্লা ফটকে চড়িয়েছে। তদ্দ্বারাই আমাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে। ছোট কামান দ্বারা ওদের ওই চোরাই কামানের কিছু করা যাবে না। যে কামান দ্বারা তুমি দেবলের মন্দির চূড়া ভেঙ্গেছিলে সেই কামান দ্বারা ওই কামানটি দ্রুত উড়িয়ে দাও।'

'ইনশাআল্লাহ উড়িয়ে দেব সালারে মুহতারাম! স্রেফ তিনটি পাথর।' জু'না বললেন।

তিনি বড় কামানটি ঠেলে সামনে আনলেন, কাছে রাখলেন প্রকান্ড তিনটি পাথর। তিনি কামানে একটা পাথর চাপালেন। কামানের দড়ি টেনে তা ছেড়ে দিলেন। পাথর গিয়ে প্রাচীরে বসানো কামানটির গায়ে প্রচন্ড শব্দে আঘাত হানল। কামানটি নীচু হয়ে গেল। দ্বিতীয় পাথরটিও কামানের মুখে লাগল। ওটি পিছু হটে এবার কেল্লাভ্যন্তরে আছড়ে পড়ল।

বিন কাসিমের নির্দেশে এবার গোটা কামান থেকে শহরে পাথর বর্ষণ শুরু হোল। এর জবাবে বাজী রায় খোলা ময়দানে নামল। মুসলমানরা ওদের ধাওয়া করলে আবার সবাই কেল্লায় গা ঢাকা দিল।

সপ্তাহখানেক এ ধরনের যুদ্ধ চলল। এক রাতে বিন কাসিমের ফৌজ দু'লোককে ধরে আনল। ওদের চেহারা কুৎসিত। পরিধেয় বস্ত্র ছেঁড়া-ফাটা। ওরা কেল্লার ভেতর থেকে এসেছে বলে জানাল। সালারের সাথে সাক্ষাৎ ওদের উদ্দেশ্য। সালারের আগে ওদেরকে শাবান ছাকাফীর কাছে নিয়ে যাওয়া হোল। কেননা, এদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল।

'কি করে বিশ্বাস করব তোমরা কেল্লা থেকে এসেছ?' শাবান ছাকাফী প্রশ করেন। 'স্রেফ তোমাদের দু'জনার জন্যই কি কেল্লার দরোজা খোলা হয়?'

'তোমরা কি মনে করেছ শুধু কেল্লার দরোজা দিয়েই আসা-যাওয়া করা যায়। কেল্লার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে গুপ্ত দরোজা আছে। ও দিকটা তোমাদের জানা নেই। ওই পথেই আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি।

'কি উদ্দেশ্য তোমাদের?'

'আমরা বৌদ্ধ। সিস্তানের সিংহভাগই বৌদ্ধ তোমরা কি জান না, বৌদ্ধরা লড়াই করতে শেখেনি। আমরা জানি, মুসলমানরা তাদেরকেই দোস্ত বানায়, যারা তাদের সাথে লড়াই করে না। নিরূনে সুন্দর সোমনি কি তোমাদের সম্বর্ধনা দেয়নি? কেল্লার উদ্দেশে তোমরা যে পাথর মারছ তা আমাদের ঘরেই পড়ছে। আমরা শান্তিতেই বসবাস করছিলাম। আমাদের সকলে কিষাণ, বেপারী, কারিগর ও পেশাজীবী। আমাদের কেউ-ই রাজার সেপাই নয়।'

'বলো তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি? তোমরা শহরেই থাকলে আমাদের পাথর থেকে কি করে বাঁচবে?'

'তোমরা নও, আমরাই তোমাদের মদদ করতে এসেছি। যে পথে আমরা এসেছি সে পথে তোমরা হামলা করতে পার। কিন্তু সুড়ঙ্গ বানাতে হবে। মাটি ভেতরে নরম। এখনই সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেল। সকাল নাগাদ তোমাদের অনেক লোক ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে। আমাদের ভিক্ষুরা বলেছেন, ভেতরে তোমরা শহরবাসীর সহায়তা পাবে। আমরাই তোমাদের ওই পথ দেখাব।

শাবান ছাকাফী ওই সময়ই এদের দু'জনকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলেন। এদের কথা তাঁর কাছে পেশ করলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গেলেন। দেখলেন, স্থানটি নর্দমার পাঁকে পূর্ণ। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই দুষ্কর। দুর্গন্ধে নাক ধরে আসছে। বিন কাসিম শাবানকে নিয়ে পানি নিষ্কাশনের পথটি দেখলেন।

সালার দাঁড়িয়েই একটা প্ল্যান ঠিক করে সেমতে কাজ শুরু করে দিলেন। ওই ডোবার দিক থেকে কেল্লামুখী সরু রাস্তার দিকে কামান তাক করে কেল্লায় পাথর নিক্ষেপের হুকুম দিলেন। এদিকে কামান না নিয়ে দূর থেকে পাথর নিক্ষেপণ প্রক্রিয়া যখন চলবে তখন নির্বিঘ্নে চলবে সুড়ঙ্গ খোদাই।

এই সুড়ঙ্গ খুদতে পানি সেচার দরকার পড়ল। মাটি নরম। সুড়ঙ্গ খুদতেই পানিতে এর মুখ ভর্তি হয়ে যায়। সুরঙ্গ খোদাইয়ে নিয়োজিতরা কোমর পানিতে পৌঁছে গেল। বিন কাসিম এবার পানি অন্য খাতে প্রবাহিত করতে আরেকটি প্রকান্ড গর্ত করতে নির্দেশ দিলেন। মুহূর্তে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে পানি সরে গেল।। তখন সকাল হয়ে আসছে। সুড়ঙ্গ খোদাই সম্পন্ন হলো। জানবায মুজাহিদবৃন্দ ওই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লেন। দু'দুজন করে ঢোকত। ভেতরের কাদামাটি খুবই দুর্গন্ধময়। মুজাহিদবৃন্দ বড় কষ্ট করে কাদা লেপ্টে ভিতরে চলে গেলেন। সুড়ঙ্গের ওপারে যেয়ে তাঁরা পেছনের সাথীদের পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করতে বললেন।

বৌদ্ধদের এ দু'সাথী তো পথ দেখাল। বাকী ওদের তৃতীয়জন প্রাচীরের ভিতরেই ছিল। সে একটি নিরাপত্তামূলক দরোজার কাছে এদের পৌঁছে দিল। ওই দরোজায় এক হিন্দু সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। সে ধারণাই করতে পারেনি যে, মুসলিম সেপাই এখানে প্রবেশ করতে পারে। মুসলিম জানবাযরা একে একে দরোজা রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কাবু করে দরোজা খুলে দিতে লাগল। বাইরের সেপাইরা ইশারা পেয়ে পঙ্গপালের মত কেল্লা ফটকে প্রবেশ করল। এ আকস্মিক ঘটনায় বাজী রায় বোকার মত দিক্‌ভ্রম করে হামলা চালানোর কোশেশ করেন। কিন্তু তার এ যুদ্ধ ছিল পরাজয়ের, বিজয়ের নয়। ওই দিনের পয়লা সূর্যের কিরণ কেল্লার এক বুর্জে মুসলিম হেলালী নিশান ওড়তে দেখল।

॥ এগার ॥

বাজী রায়ের বাহিনীকে বন্দী করা শুরু হলে বাজী রায়কে খুঁজে পাওয়া গেল না। সৈনিকরা জানাল, বাজী রায় সপরিবারে অতি ভোরে প্রধান ফটক খুলে রথে চড়ে পালিয়েছে। বিন কাসিম তার পশ্চাদ্ধাবনের হুকম দিলে সিস্তানের কেল্লা প্রধান বললেন, লাভ নেই, সে এতক্ষণে শীষমে পৌঁছে গেছে।

যে সব ফৌজি অফিসার পলায়ন করতে পারেনি তাদের জড়ো করা হল। মুহাম্মদ বিন কাসিম, কড়া ভাষায় বললেন, 'আমাদের হাতে সে সব লোককে সোপর্দ করতে বল যারা কামান চুরি করেছিল। এতে যদি কেউ টালবাহানা করে তাহলে সকলের গর্দান কেটে ফেল এবং তাদের মাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত কর।'

শাবান একথা কমান্ডারদের শোনালেন। বললেন, মিথ্যা কথা বললে গর্দান কাটা তো হবেই, তার আগে চার হাতপা বেঁধে যমীনে শুইয়ে রাখা হবে। ঘোড়ার পায়ের তলে মাড়াই হতে হবে।

কমান্ডার ইশারা করতেই দশ জন জঙ্গী কয়েদী একপাশে সরে গেল। মূলত এরা সংখ্যায় ছিল চৌদ্দ জন। চার জন পালিয়েছে। জনৈক কমান্ডার নিজেও ওই তালিকায় ছিলেন। তিনিও আলাদা হলেন।

তিনি বললেন, কামান চুরির পরিকল্পনা মূলত রাজা দাহিরের। এতে ওই দুষ্ট উজীরের হাতও ছিল। বাজী রায়ের হাতে এই পরিকল্পনা তারা সোপর্দ করেছিলেন। বাজী রায় তার দুঃসাহসী কমান্ডোদের এ-কাজে পাঠিয়েছিলেন। হিন্দু গুপ্তচররা বলেছিল, কিছু কামান এখন নৌকায়। তারা এও বলেছিল, এখানে মাত্র চার পাঁচ জন লোক পাহারা দেয়। একটি মাত্র তাঁবু আছে সেখানে। এ খবর পাওয়ার পর চৌদ্দ জন লোক নিরূনের ওই নদীতীরে যায়, যেখানে কামান ছিল। তন্মধ্যে দু'জন গ্রাম্য কৃষকের বেশে প্রহরীদের কাছে যায়। একজন তাদের বলে, আমরা বৌদ্ধ। এই সামান্য দূরে আমরা ডাকাতের কবলে পড়েছি। আমাদের মেয়েদের ওরা টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলছে। টাকা-কড়ি সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সাথে দু'জন বুড়ো ছিলেন। ওদের হত্যা করা হয়েছে। আমরা কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি। আমরা যেহেতু গৌতম বুদ্ধের অনুসারী সেহেতু সঙ্গে অস্ত্র রাখি না।

'ডাকাতরা কি ঘোড়া বা উটে সওয়ার?'

'না। ওরা পদাতিক। আমরা শুনেছি, মুসলমানেরা মজলুমের মদদ করে থাকেন। এক্ষণে এখানে আপনাদেরই বাদশাহী। কাজেই আমাদের সাহায্য করুন।'

এদের কথায় আরব প্রহরীদের মনে দাগ কাটল। তাঁদের দু'জন তীর বর্শাসহ এই দু'জনের সাথে চলল। যেহেতু ঘোড়া ছিল না কাজেই তাঁরা পায়ে হেঁটে চলছিল।

সামান্য দূর থেকে নারীদের চিৎকার ভেসে আসছিল। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, ডাকাতরা তখনও ঘটনাস্থল ত্যাগ করেনি। ঘটনাস্থলে বৃক্ষ ও ঝোঁপঝাড় ছিল। এ দু'প্রহরীকে আচমকা বাজী রায়ের পাঁচ'ছ জন লোক বেরিয়ে এসে হত্যা করে। এই কাজ করে ফৌজ নদীর তীরে একত্রিত হলো। তারা সর্ব পেছনের কামানভর্তি নৌকাটি খুলে নিয়ে গেল। ওপারে ছিল দুটি জঙ্গী হাতি। নৌকা থেকে কামান নামিয়ে ওই হাতির মাধ্যমে টেনে নেয়া হলো। খুবই ক্ষিপ্র গতিতে তারা হাতি হাঁকাল। রাতের মধ্যে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে গেল।

এই কামানটি রাজধানী আরোড়ে নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু বাজী রায় ভুলক্রমে সেটি কেল্লা ফটকে স্থাপন করে। সে বলেছিল, আরব বাহিনী সিস্তান ঘেরাও করলে এই একটি কামান দ্বারাই তাদের ঘেরাও ভণ্ডুল করা যাবে। কিন্তু হায়! আরবরা বড় কামান দ্বারা ওই চোরাই কামানটির তেরটা বাজিয়ে ছাড়ল।

বাজী রায় হয়ত জানতেন না এই কামানের ব্যাপারে দাহিরের পরিকল্পনা কি ছিল। দাহির তার অস্ত্র নির্মাতাদের কাছে এটি তুলে দিয়ে অমনটা বানাতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দীতে জানা গেল, দাহির চাচ্ছিলেন মাকরানে বসবাসরত বিদ্রোহী আরবদের মাধ্যমে এই কামান বানাতে। তিনি হারেস আলাফীর কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তারা কেউ কামান বানাতে জানে কি-না। 'আলাফী কেউ জানে না' বলে উত্তর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আলাফীর দু'লোক কামান বানাতে জানতেন। কিন্তু এই কামান যেহেতু তাদের আরব ভাইদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার হবে– এজন্য তাদের এ অস্বীকৃতি।

বিন কাসিম কমান্ডারসহ দশ জনকে ওখানেই হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

বুধিয়া জয়

॥ এক ॥

সিস্তান বিজয় হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রবেশের অনন্য মাইল ফলক। এ সেই ফলক যা অর্জন করতে বীর ইসলামী বাহিনীকে বুকের তপ্ত খুন নজরানা দিতে হয়েছিল। লেখতে যতটা সহজ কিংবা পড়তে, এ অভিযান ততটা সহজ ছিল না। বড় কঠিন সফর। আরব্য শাহজাদাগণ এখানে দাফন হয়েছেন। এখানে ওখানে তাঁদের মাজার ছড়ানো ছিটানো। আরব্য মায়েরা সন্তানহারা, স্ত্রীরা স্বামীহারা আর সন্তানরা পিতৃহারা হচ্ছিলেন।

এঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় আসেননি। লুটতরাজ কিংবা প্রজাপীড়ন করতেও আসেননি। যদিও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা ও কবি-সাহিত্যিকগণ খোদার পথের এই মহান সৈনিকদের পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপন করেছেন। এক বংকিম চন্দ্র-ই আরবদের যবন, পাঠানদের পামর ও আরব জাতিকে নেড়ে পর্যন্ত বলেছেন।

কিন্তু ইতিহাস কালের সাক্ষী, হিন্দুদের এই প্রোপাগান্ডা তাদের দৈন্যতা, হীনমন্যতা ও নীচতার-ই স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

বীর আরবী বাহিনী কোন হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ নারীর প্রতি হাত ওঠায়নি। প্রাণঘাতী জেনেও বিন কাসিম থেকে নিয়ে সাধারণ সেপাইরা পর্যন্তও তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা এর সাক্ষী। তারা তলোয়ারের চেয়ে মানুষের হৃদয় বিজয়ের দিকে অধিক নযর দিয়েছেন। তাই তো একের পর এক শহর তরুণ সেনাপতির হাতে পতন ঘটেছে।

বিজেতা তাকেই বলে যে মানুষের হৃদয় জয় করে। এসব আরব জোয়ানের অন্তর রেশমী কোমল ছিল। কিন্তু ইসলাম বৈরী চরম মুসলিম বিদ্বেষী রাজা দাহিরের মোকাবেলায় তারা ছিলেন হিমালয় পাহাড়ের মত ইস্পাত কঠিন।

বিশ্ব ইতিহাসের সবচে' কমবয়স্ক সফল তরুণ সেনাপতি যখন সিস্তানে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁকে বলা হলো, সিস্তানের সামনে একটা প্রদেশ আছে, সেখানে অগ্রাভিযান চালাতে হবে। তরুণ সেনাপতিও বসে থাকার মানুষটি নন। কিন্তু তাঁর নিয়ম ছিল, নতুন কোন দেশ জয় করলে সেই দেশের শাসন শৃঙ্খলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে নিতেন। আদল-ইনসাফ কায়েম করতেন। সেখানে দ্বীনী দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিতেন। এই ইন্তেযামের জন্য বিন কাসিমকে সিস্তানে অনেক দিন থাকতে হল।

তিনি এক পত্রে সিস্তানের বিজয় কাহিনী লেখে হাজ্জাজের কাছে পাঠান। বললেন, তার কাছে কি পরিমাণ ফৌজ পদাতিক ও সওয়ার রয়ে গেছে। কি পরিমাণ যখমী ও শহীদ হয়েছে। জানালেন হাতিয়ার ও রসদের ফিরিস্তিও। দুশমনের কেল্লার কথাও তাঁর পত্রে উল্লেখ থাকল।

সিস্তানের প্রশাসনিক অবকাঠামো স্থির হলো। বিন কাসিম নতুন অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কেল্লায় ঠাঁসা ফৌজ। শহরের জৌলুস আগের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। মুসলিম ভীতি শহরবাসীর মন থেকে বিদূরিত হল।

একদিন ঠিক দুপুর বেলা। শহরে পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের প্রাণ চাঞ্চল্য। এ সময় দু'লোককে কেল্লার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তারা মহিলাদের মত ঘোমটা দেয়া। তাদের পোশাক-আশাক ধূলি ধূসরিত। দেখলে মনে হবে বহু দূরের পর্যটক এরা। কেল্লার বুর্জ থেকে কেউ হেঁকে ওঠল এদের দেখে, 'তোমরা কারা? কোত্থেকে, কি উদ্দেশে এখানে?'

'বহু দূর থেকে। আমরা আশ্রয়প্রার্থী।' তাদের একজন বলল।

'ভেতরে এসে দেউড়ির কাছে দাঁড়াও! 'জলদি। ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।'

দু'আগন্তুক-ই উটসহ ভেতরে প্রবেশ করল। পাহারাদার তাদের আগমন হেত এবং কোন্ জায়গার বাসিন্দা জানতে চাইলে তারা অপরিচিত এক স্থানের নাম বলল। বললো, ওখানে বসবাস অসম্ভব। হিন্দু সৈনিকদের জুলুমে জীবন বিপর্যস্ত। বললো, আমরা গরীব লোক।

'তোমাদেরকে কোন মুসলমান জ্বালাতন করেনি তো?'

'না। মুসলমানরা ওখানে গেলে তো কোন ভয় ছিল না। শুনেছি, মুসলমানরা সকলের ইজ্জত সম্মান করে। কারো জীবন মালে হাত দেয় না। আপনাদের কেল্লায় ঠাঁই না দিলেও আমাদের এ দু'মেয়েকে কেল্লায় আশ্রয় দিন। ওরা ক'দিন ধরে খোলা আকাশের নীচে বাস করছে। দিকভ্রান্ত সফরে ওরা শ্রান্তক্লান্ত।'

আগন্তুকদের এ হৃদয়গ্রাহী কথায় প্রহরীদের মন গলে গেল। কমান্ডার বললেন, সরাইখানা তালাশ করে তোমরা সেখানে ওঠো। খানা পিনার ব্যবস্থা আছে।

'তোমরা কোন্ ধর্মের লোক।'

'বৌদ্ধ ধর্মের।'

'সরাইখানায় মালপত্র রেখে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে তোমাদের ভিক্ষুদের সাথে দেখা কর। ওরা তোমাদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দেবেন। শহরের বেশ কিছু বাড়ী খালি পড়ে আছে। ফেরারী হিন্দুদের বাড়ী ওগুলো। ওই সময় কেল্লার এক সেপাই মাগরিবের আযান দিচ্ছিল। ওই আযানের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ ছিল। আগন্তুকরা থমকে দাঁড়াল। জীবনে এই প্রথম ওদের কানে আযানের শব্দ পড়ে। ওরা আরো দেখল, মুসলিম বাহিনী কাতারবদ্ধ হয়েছে। আগন্তুকরা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল। কাতার সোজা হলে এক লোক সবার সামনে গেল। তাঁর মুখও সেদিকে যেদিকে অন্যদের মুখও। ওরা নামাযের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করে হতবাক হয়ে গেল। ওরা সফরের ক্লান্তি ভুলে গেল।

উট বসিয়ে ওরা ওখানেই নামল। নামল মহিলারা। এর মধ্যে দু'যুবতী মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি গভীর নযরে তাকাল।

'আরে এ তো দেখছি বালক!' বুড়ো মহিলা বললো, 'দেখছ, সকলের কাছে তার কি দাম!' দু'যুবতীর গভীর দৃষ্টি বলছিল তারা সালারের প্রতি বিমুগ্ধ বিহ্বল।

॥ দুই ॥

নামায শেষ। ফৌজ আস্তে আস্তে ওখান থেকে চলে যাচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম ওখানে দাঁড়ানো। সেপাইরা ভক্তিভরে তাঁর সাথে মোসাফাহা করছে। আস্তে আস্তে ভীড় কমে এলো। তাঁর পার্শ্বে দু'তিন উপ-সালার। শাবান ছাড়াও জনাচারেক দেহরক্ষী।

আগন্তুকদ্বয় আগে বাড়ল। নিরূনের এক নও মুসলিমের সাথে তাদের দেখা। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'মুসলমানরা একি করল? নও মুসলিম বললো, ইবাদত করল।'

'সবার আগে দাঁড়ানো উনি কে?'

'আমাদের সিপাহসালার। উনি যেমন ফৌজ নেতা, তেমনি নামাযের ইমাম।

'আমরা তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি কি? সালারের প্রশংসা জেনে বহু দূর থেকে এসেছি।'

'সামনে যাও! ওখানে জানতে পারবে সালারের দেখা পাবে কি-না।'

এরা বিন কাসিমের দিকে এগিয়ে গেল। দু'যুবতী এবং তাদের মা-ও ওদের সাথে। উভয়েই সালারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। তারা সালারের আচকান ধরে চোখে ছোঁয়াল, চুমো খেল।

'ওরা কি চায়?' দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্ন করলে তারা কেল্লার কমান্ডারকে দেয়া উত্তরই দিল।

দু'যুবতী সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। এরা খুবই সুন্দরী। তারা দোভাষীর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

'তোমাদের রাজাকে বলো, মহলে আমাদের চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা এখানেই নিরাপত্তা বোধ করছি।

যেহেতু বিন কাসিম ওখানে স্বয়ং উপস্থিত, সেহেতু কেউ এ প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারছেন না। দোভাষী সালারকে যুবতীদের প্রস্তাব জানালেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম শাবান ছাকাফীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

'সাম্রাজ্য দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে। এই গরীবরা আমাকে সেই সাম্রাজ্যাধিপতিদের বাদশাহ মনে করছে, কিন্তু গোটা দুনিয়ার বাদশাহ যে একজন। তিনি মহান আল্লাহ। আমাদের মধ্যে কোন রাজা নেই। প্রজা নেই। আমরা কোন নারী চাকরানী কিংবা কর্মচারী নিয়োগ করি না। আমাদের জীবন ময়দানে কাটে। তোমরা তোমাদের লোকদের সাথে ফিরে যাও। তোমাদের বসত ভিটায়-ই তোমাদের ইজ্জত সম্মান হেফাজত থাকবে।' দু'যুবতীকে লক্ষ্য করে বলেন বিন কাসিম।

'আপনার কাছে কোন বিনিময় চাইব না। আমাদেরকে আপনার দাসী বানিয়ে রাখুন।'

'কেন? আমি তোমাদের রাজা কিংবা দেবতা নই তো?'

‘দেবতাদের চেয়ে অতি উত্তম আপনি। ধর্মের প্রতি আমরা বীতশ্রদ্ধ। আমাদের পন্ডিতরা যারা নিজেদের দেবদূত বলে বেড়ান, আমাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করেন না তারা। আমরা সেই ইজ্জত রক্ষার্থে এসেছি। শুনেছি, মুসলমানরা নারীর ইজ্জত আবরু হেফাজতের গ্যারান্টি দেয়।’

বিন কাসিম তাদের বারংবার বোঝানোর কোশেশ করছিলেন যে, নারী বিশেষ করে সুন্দরী লাস্যময়ীদের মুসলমানরা হেরেমে রাখে না। কিন্তু উভয় যুবতী নাছোড়বান্দা। তারা সালারের সাথে থাকবেই। তারা বলে, সালার একজন দেবতা। তাঁর পূজা করব আমরা। তারা তাঁর আচকান ও হাতে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

শাবান ছাকাফী দূরে দাঁড়িয়ে গভীর নযরে যুবতীদের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি বুলান। দেখেন ওদের সঙ্গের বুড়ো মহিলাকে। বিন কাসিম শাবানের দিকে ইশারা করেন। শাবান অগ্রসর হয়ে বলেন,

‘এসো আমার সাথে, আমি তোমাদের চাকরী দেব।’

যুবতীরা বিন কাসিমের দিকে তাকাল। তিনি মাথা হেলালেন। এর মানে তার সাথে যাও। শাবান সকলকে নিয়ে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার কালো পর্দা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মশাল জ্বলে ওঠছে। শাবান এদেরকে একটি কামরায় নিয়ে গেলেন।

যুবতীদের সাথে রেখে পুরুষদের বাইরে রাখলেন। দরোজার খিল এঁটে দিলেন। কামরায় দু'তিনটা বাতি জ্বলছে। তিনি উভয়ের ওড়না খুলে ফেললেন। চুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন। হাতের আংটি ও অলংকারাদি পর্যবেক্ষণ করলেন। বললেন,

‘তোমরা ঠিকই শুনেছ মুসলমানরা নারীদের ইজ্জত আবরু রক্ষার গ্যারান্টি দেয়। এখানে তোমাদের ওই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে না। তবে আমরা তোমাদের মত মেয়েদের হত্যা করে থাকি, সেই হত্যার ধরন খুবই ভয়াবহ। তোমরা সত্য কথা বললে সেই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু থেকে বেঁচে যেতে এবং সম্মানের সাথে বিদায় নিতে পার।’

যুবতীরা এ কথায় কেঁপে ওঠল। তারা বলল, কি অপরাধে হত্যা করা হবে। ওদের বলার ধরন কতকটা বাজারী মেয়ের মত। যেন শাবানের সাথে মিলে যেতে চায়। তার পৌরুষ জাগিয়ে তুলতে চায়। শাবানের মত রহস্যভেদী জাঁদরেল গোয়েন্দা প্রধানের কাছে যুবতীদের এ অভিনয় গোপন থাকে না। তিনি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারেন, গরীব সম্ভ্রমহারা যুবতীদের চালচলন এতটা লাগাম ছাড়া হতে পারে না। ওদের চুল, হাত, চেহারা ও বাযু দেখেছেন তিনি। এই চুল, হাত ও বাযু কৃষক ঘরের মেয়েদের হতে পারে না। বিন কাসিমের সাথে কথা বলার আগ্রহী মেয়ে কৃষকের ঘরের না হওয়াই স্বাভাবিক। শাবান বলেন,

‘তারা নিরেট মূর্খ যারা তোমাদের পাঠিয়েছে। তারা এও ঠাহর করেনি যে, তোমাদের আদৌ কিষানী মেয়েদের ছদ্মবেশে মানায় কি-না। তোমরা বলো, কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন। আমাদের সালারকে বিষ প্রয়োগে হত্যাই কি মুখ্য উদ্দেশ্য?’

শাবান ছাকাফী একটা মেয়েকে কাছে নিয়ে মৃদু টোকা মেরে বলেন, 'বলো! আমি চাই তোমরা শাহযাদী হয়েই দিন গুজরান করো। তোমাদের রাজকুমারীর মর্যাদায় যেমন এখানে রাখতে পারি, তেমনি পারি হাত-পা বেঁধে ঘোড়ার পেছনে হেঁচড়াতে।'

'কে আপনি? প্রকৃতপক্ষে আপনি কি সালারে আলা?' যুবতী প্রশ্ন করে।

'আমি এখানকার সবকিছু। যা জিজ্ঞাসা করছি এর জবাব দাও।'

শাবান ছাকাফীর কবল থেকে নিজকে মুক্ত না করে মেয়েটি যেন তার দেহে মিশে যেতে চায়। মনে হয় সে ওই আরব গোয়েন্দার মাঝে নিজেকে লীন করে দিতে অত্যাগ্রহী। অপর যুবতীর ঠোঁটে খেলে যায় এ সময় পরিধি বাড়ানো হাসি। আচমকা তিনি যুবতীকে ঠেলে দরোজা খুলে বাইরে অপেক্ষমাণ পুরুষদ্বয়কে ডেকে আনেন। কেননা, তার বুঝতে বাকী নেই যে, এ যুবতীরা পাক্কা শিকারী, নির্লজ্জ ও বাকপটু। পুরুষদের তিনি বললেন,

'তোমরা এতটা নীচ ও বেকুফ, ছি ছি! তোমরা আরবদের এতটা বোকা মনে করেছ? আমাদের মেধা ও পরিকল্পনা কি এত হাল্‌কা। আমি হাত-পা দেখে বলতে পারি, কার কি পেশা?'—বলে তিনি এক লোকের হাত দেখে বলেন, তোমাদের চৌদ্দ খান্দানে কোন কৃষক নেই। এক্ষণে বলো, ফৌজে তোমাদের পদমর্যাদা কি?'

'আপনি আমাদের ভেতরে ডেকে না আনলে আমরাই ভেতরে আসতাম। আমরা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য স্বীকৃতি দিচ্ছি। আমরা দু'জনেই বাইরে বসে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভেতরে গিয়ে আপনাকে পরিষ্কার বলব, বুধিয়ার কাকো রাজার প্রেরিত লোক আমরা।

'এই কেল্লা থেকে পালানো বাজী রায় আমাদের এ কাজের জন্য তৈরী করেছে। এ দু'যুবতী বাজী রায়ের খান্দানের।'

'বাজী রায় কি শীষম পৌঁছে গেছে?'

'হ্যাঁ, বুধিয়ার রাজা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। উভয়েই আপনাদের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করছেন।'

সিস্তানের পর তাঁর পরবর্তী টার্গেট শীষম দুর্গ। যেটা বুধিয়া রাজার কব্জায়। ওখানকার রাজাও বুদ্ধিস্ট। এ প্রদেশ কাগজে-কলমে স্বাধীন থাকলেও মূলতঃ রাজা দাহিরেরই করদরাজ্য। কাকো রাজার আশা, শত্রুর হামলা হলে দাহির তাকে মদদ করবেনই।

এটি একটি অপ্রত্যাশিত সংবাদ যা এই চরদের মাধ্যমে শাবান অবগত হলেন। বিন কাসিম মনে করেছিলেন শীষম একটি মামুলি কেল্লা। তাছাড়া রাজা বৌদ্ধ। সুতরাং বিগত বৌদ্ধ রাজারা যেভাবে তার আনুগত্য স্বীকার করেছে সেভাবে করবেন এই রাজাও। কিন্তু এই গুপ্তচরদের কথা কতটুকু সত্য–তা নিয়েও বেশ সন্দেহ। এটা ধোঁকাও তো হতে পারে। হতে পারে এই উদ্দেশেই এদের পাঠানো হয়েছে। শীষমে তড়িঘড়ি করে হামলা করার উদ্দেশেও হতে পারে।

॥ তিন ॥

'আমরা জানি আপনি আমাদের এমনিতে ছাড়বেন না। অপরাধ করে আমরা আমাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করেছি। বলে বুঝাতে পারব না, আমরা আমাদের বক্তব্যে কতটা সত্য।' বললো ওই দুসালারের একজন।

'তোমাদের বুদ্ধিমানই মনে হচ্ছে। তবে জেনে রাখ, আমি তাদের প্রধান যারা তোমাদের মত লোকদের পাঠায়। আমাদের পক্ষ থেকে যারা গুপ্তচর হয় আমি তাদের প্রধান। তোমরা মিথ্যা বললে আমি বুঝব এটা মিথ্যা। সত্য বললেও বুঝব–এতটুকু সত্য। তোমরা কি জীবন বাঁচানো ছাড়া নিজেদের রহস্য জট খুলতে পার না?' বললেন শাবান।

'আমরা এই প্রথম মুসলমানদের ইবাদত দেখলাম। আযানও বোধহয় এই প্রথম জানলাম। আমরা মানুষ। বৌদ্ধদের পূজা অর্চনা দেখেছি। মন্দিরেও গেছি, হিন্দু চেন্নাই বংশের আমরা। আমাদের ধর্মে কর্মে ওগুলো নেই, যেগুলো আপনাদের মাঝে দেখলাম। আমরা আমাদের প্রভাব প্রতিক্রিয়া ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

'আমি এত লম্বা উপাখ্যান শুনতে চাইনি। স্রেফ এতটুকু বলো, তোমাদের এখানে আসার গরজটা কি। ধর্মীয় প্রশংসায় মোমের মত গলে যাবার ব্যক্তি নই আমি।'

'আমাদের দেখার উদ্দেশ্য, আপনারা এখান থেকে কোন্ দিকে যান। আপনার সৈন্য, রসদ, ও হাতিয়ারের পর্যবেক্ষণও জানার ছিল। রসদ ও হাতিয়ার কোত্থেকে, কোন্ পথে, কিভাবে আসে তাও জানতে এসেছি।'

'ওই যুবতীদের আনার প্রয়োজন পড়ল কেন? তোমরা দু'জন কি একাজ সমাধা করতে পারতে না।'

'ওদের দ্বারা উপরস্থ অফিসারদের হাত করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, মুসলিম সালার নব যুবক, তিনি অবশ্যই যুবতীদের মায়াজালে পা দেবেন। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা বুমেরাং হয়েছে। সালার এদের দিকে কামুক দৃষ্টিতে একটি বারের জন্যও তাকাননি।'

'যুবতীদের প্রতি কামুক দৃষ্টিতে তাকানোর ফুরসত কৈ তাঁর। তোমরা কি দেখনি তিনি কেবল আমাদের সালার নন ইমামও। সালার পাপী হলে সেনাবাহিনীর ওপর তেমন কোন প্রভাব পড়ে না, কিন্তু ইমাম পাপী হলে নামায শুদ্ধ হয় না। আমরা ইতঃপূর্বে তোমাদের রাজার পাঠানো কিছু যুবতীকে ধরেও ছেড়ে দিয়েছি। মনে রেখ, তোমরা তোমাদের দেশ, জাতি ও সম্ভ্রম নারীদের ইজ্জতের বিনিময়ে রক্ষা করতে পারবে না। তার ভাতিজা এ দু'যুবতীকে মানব ঢাল বানিয়েছে।

'আমরা আপনার কাছে কৃপা ভিক্ষা চাই না। আমরা চাই, আমাদের পক্ষ থেকে রাজা দাহির ও তার ভাতিজার কাছে একটা পয়গাম পাঠানো হোক। আমরা তাদের বলতে চাই, তোমরা ওই জাতির সাথে মোকাবেলা করে টিকতে পারবে না, যারা কাতারবদ্ধ হয়ে নামায পড়ে। নামাযের মধ্যে যাদের এই আনুগত্য, ময়দানে সে আনুগত্যই দেখায়।'

শাবান ছাকাফী এদেরকে বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলেন। এদের কথা তাকে পেশ করলেন।

বিন কাসিম এদেরকে কেল্লা থেকে বহিষ্কার করতে বললেন। ইতিহাস বলে, বিন কাসিম এ ধরনের ব্যাপারে জিন্দা ছাড়ার লোক নন, কিন্তু কি একটা চিন্তা করে তিনি এদের জানে রক্ষা করেন।

শাবান ছাকাফী এদের লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের সালার তোমাদের জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন। রাজা দাহির ও বাজী রায়কে বলো, অতিশীঘ্র তাদের সাথে আমাদের দেখা হবে। আমরা কামানের হুংকার আর তীরের শোঁ শোঁ ধ্বনির মাধ্যমেই তাদেরকে কেল্লার অভ্যন্তরে আগমনবার্তা শোনাব।

শেষ রাতে এদেরকে ফটক খুলে ছেড়ে দেয়া হলো।

॥ চার ॥

বাজী রায় শীষম পৌঁছে ওখানকার রাজা কাকোকে জানাল, মুসলমানরা টর্নেডো গতিতে ধেয়ে আসছে। এদেরকে না রুখতে পারলে ধর্ম ও জাতি উভয়টার যবনিকাপাত ঘটবে। কাকো বললেন, 'তোমাদের অজানা নয় আমরা বৌদ্ধ। ভালবাসার পূজারী আমরা। কারো রক্ত প্রবাহ বৈধ মনে করি না।'

'কিন্তু মুসলমানরা বিধর্মীদের খুন পিয়াসী। জানি তুমি কি বলতে চাও। তোমাকে আর কিছু বলার সুযোগ দেব না। বৌদ্ধদের কারণে গোটা দেশের বারোটা বেজেছে। নিরূন ওরা মুসলমানদের হাওয়ালা করে দিয়েছে। মাওজের বৌদ্ধরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে। পরিণতিতে সিস্তান হারিয়েছি আমরা। এখন তুমি আবার অন্য সুর ধরেছো। ধর্মের বাহানা তুলছ। তোমরা যে মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করছ তারা তোমাদের বধূ-মাতাদের নিয়ে রঙ্গ-রসের আসর বসাবে।'

'এমনটি হবে না বাজী রায়। নিরূনের পরিবেশ পরিস্থিতি তোমার জানা নেই। আমার জানা আছে।'

'মুসলমানরা না করলেও আমরাই তোমাদের বধূ-মাতাদের নিয়ে রঙ্গ-রসের আসর বসাব। তুমি কি করে ভুলে গেলে, রাজা দাহিরের নুন খেয়ে বেঁচে আছ। তুমিও আমাদের ধোঁকা দিলে সবংশে তোমাকে নিপাত করব। আমার সাথে যোগ দাও। সিস্তান পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাই। তুমি জানো না, রাজা দাহির আমার প্রতি কতটা আস্থাশীল?'

'তুমি কি করতে বল আমাকে?' কাকো বললেন।

'নিয়ত বদলে ফেল, চেন্নাই জাতি তোমার প্রজা ও তারা যুদ্ধংদেহী।'

কাকো বেকায়দায় পড়ে গেলেন। চাপের মুখে পড়ে তিনি নিয়ত বদলে ফেললেন। তিনি বিন কাসিমের মোকাবেলায় সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ বিন কাসিম এদিকে আসবে তা জানার উপায় কি?' মুসলমানরা যে আসবে তা অনিবার্য। তারা কেল্লা ঘেরাও করে লড়াই করে না।

তাই দাহিরের নির্দেশ, সম্মুখ সমরে ওদের সাথে লড়াই করে পারা যাবে না। কিন্তু এক্ষণের সমস্যা হল, মুসলিম সৈন্যদের গতি-প্রকৃতি কেমনে জানব?'

'আমি আমার গুপ্তচর পাঠাব। কিন্তু এমন কোন মেয়ে নেই যাকে চর নিযুক্ত করতে পারি। একজন কিংবা দু'জন যুবতীই এ কাজে যথেষ্ট।'

'যুবতী আমার কাছ থেকে নিতে পার। আমার বংশে দু'টি সুন্দর ও চৌকস যুবতী আছে।' বলল বাজী রায়।

সে খান্দানের ওই যুবতীদের সাথে কথা বললে তারা সানন্দে চর বৃত্তিতে রাজি হলো। কাকো তাদের কৌশল বাতলে দিলেন, বললেন, অন্যান্য রাজা বাদশাহ ও সেনাপতিরা যেভাবে সুন্দরী ললনাদের হেরেমের চেরাগ বানিয়ে নেয়, সেভাবে মুসলিম সালারও তোমাদের লুফে নেবে। নারী মাংসের ঘ্রাণ পেলে তারা ধর্ম কম ভুলে যাবে। এই সুযোগে তোমাদের পক্ষে ওদের পেটের কথা উদ্ধার করা খুব একটা কঠিন হবে না।

কাকো দুনিয়ার স্বাভাবিকতার বিচারে এই পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, মন্দিরের পন্ডিতেরা সুন্দরীদের সাথে খেল তামাশার জন্য তাদের একত্রিত করে। তারা এ কাজে ধর্মের দোহাই পাড়ে। কাকোর ধারণা, দূরদেশ থেকে আসা মুসলিম সেনাপতি অবশ্যই নারীসঙ্গ লাভে ব্যাকুল থাকবেন। ইতিহাসও তাই বলে, কোন বিজয়ী সালার সর্বপ্রথম সুন্দরী নারী অন্বেষণ করে। বিজেতা সেনারা সোনাদানার পূর্বে শহরের সুন্দরী অভিজাত তরুণীদের সঙ্গ কামনা করে। তিনি বৃদ্ধা যে মহিলাকে সঙ্গে পাঠালেন, সে ছিল বাজী রায়ের চাকরানী। খুবই চালাক ও প্রতারক স্বভাবের ছিল সে। ওই খান্দানকে আঙ্গুলে নাচাত। চালাক হলেও গুপ্তচরের মত চৌকস ছিল না সে। সিস্তানে গিয়ে মুসলমানদের নামাযের অপরূপ দৃশ্য দেখে সে প্রভাবিত হলো। কাজেই তাড়াতাড়ি সে রহস্য জট খুলে দিয়েছিল।

অবশেষে একদিন এই গুপ্তচররা বাজী রায় ও রাজা কাকোর কাছে ফিরে এলো। তারা এদের স্বতস্ফূর্ত চিত্তে সম্বর্ধনা জানান। অবশ্য যুবতীদের সাথে দেখে হয়রান হয়ে প্রশ্ন করেন, ওদের নিয়ে এসেছ কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে তারা শাবান ছাকাফীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরল। বাজী রায় ও কাকোর মুখ কালো হয়ে গেল? তারা পুরুষদ্বয়কে নিন্দামন্দ বলতে লাগল।

'তোমাদেরকে জল্লাদের কাছে সোপর্দ করাই শ্রেয়।' বললেন বাজী রায়।

'ওদেরকে হাত-পা বেঁধে তপ্ত বালুতে শুইয়ে দেয়া হোক। ভুখ-পিপাসায় মারা যাক। কি জন্য ওদের পাঠালাম আর করে আসল কি।' বললেন কাকো।

'আমরা আপনাদের জন্য অতি উত্তম একটি রহস্য সংবাদ নিয়ে এসেছি। তা হলো, আপনারা কোনভাবেই ওদের পরাস্ত করতে পারবেন না। যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে ওদের নামায পড়তে দেখলাম, তাতে ওদের ওই ঐক্যে ফাটল ধরানো চাট্টিখানি কথা নয়। ওখানকার অমুসলিম বসতিতে শান্তি-সুখের ফোয়ারা বইতে দেখেছি।' গুপ্তচরদের একজন বলল।

যুবতীদ্বয় নিশ্চুপ। ওরা ছিল হতাশায় বিমর্ষ। কেননা ওদের মিশন ব্যর্থ।

সিস্তান থেকে বের করে দেয়ার আফসোস এর চেয়েও বেশী ওদের। যেন মরা লাশ হয়ে এসেছে ওরা।

'যদি মুসলমানদের পরাজিত করতে চান তাহলে ওদের মত চরিত্র ও ঐক্য গড়ে তুলতে হবে আপনাদের মাঝে। কিংবা অন্য কোন তদবীর করতে থাকুন। বিন কাসিম সিস্তান থেকে শীষমে পৌঁছলে পথিমধ্যে আচমকা হামলা করেও দেখতে পারেন। আমাদের এমন কোন কাজে লাগালে দেখবেন, জানবাযী রেখে লড়ছি।'

এরা আচমকা গেরিলা হামলার পরিকল্পনাই নিলেন। কাকো চেন্নাই গোত্রের এক হাজার গেরিলা সওয়ার প্রস্তুত করলেন।

দু'তিন দিনের মধ্যে চেন্নাই গোত্রের এক হাজার সওয়ার তৈরী হয়ে নিল। কাকো এদেরকে বাজী রায়ের হাতে সোপর্দ করে বলল, এরা গেরিলা হামলা চালাবে। বাজী রায় এদের মহড়া শুরু করলেন। তিনি মুসলমানদের উপর আক্রমণ পদ্ধতি শেখালেন। আরো বললেন, এক স্থানে সকলে জড়ো হয়ে লড়বে না। চারদিক থেকে অল্প-স্বল্প করে হামলা শানাবে। এভাবেই নির্দেশ দেয়া হলো।

॥ পাঁচ ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিস্তান থেকে রওয়ানা করলেন। শীষম তার গন্তব্য। তিনি অধীনস্থ সালারদের বললেন, অগ্রযাত্রা খুবই ক্ষিপ্র হবে। গুপ্তচররা জানাল, পথে বেশ কিছু কেল্লা আছে, যেগুলো কব্জা করতে হবে। এদের সাথে স্থানীয় গাইড ছিল।

ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়স্ক এই সালারের যশোগাঁথা বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করা খুবই মুশকিল। তাদের চলার পথে বেশ কিছু শহর ও বসতি পড়েছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা তার কোন ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহ করে রাখতে পারেনি, যাতে বোধগম্য হতে পারে তিনি কি পরিমাণ রাস্তা ও বসতি অতিক্রম করেছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক হেগ বলেছেন, আজকের 'শাহ হাসান'-ই সেদিনের শীষম।

শীষমের পথে বাধা ছিল সিন্ধুনদ। বিন কাসিম কিশতীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফৌজ অল্প সময়ের মধ্যে নদী পার হতে পারত, কিন্তু তাদের রসদ বিশেষ করে কামান নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ঐতিহাসিক মতে সিন্ধু নদের ওই দিকটায় একটা সেতু ছিল। দাহির মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগমনবার্তা শুনে সেতুটি অতি তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে।

বিন কাসিম নৌকা দ্বারা সেতু বানালেন। তিনি ঘোড়ায় চেপে সকলকে দ্রুত পেরোতে বললেন। উদীয়মান সূর্যের দিকে ইশারা করে বললেন, ওই দেখ! তোমাদের আগে সূর্য ওঠছে। ও তোমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

সালারের কথায় বাহিনীর মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। তারা অতি তাড়াতাড়ি পারাপার কার্য সমাধা করল। এভাবে মুজাহিদবৃন্দ সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গমালা পরাভূত করে এগিয়ে গেলেন গন্তব্যে।

শীষমের পথে কয়েকটি কেল্লা ছিল। পথের দূরত্বও ছিল অনেক, তাই এ সফরে মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বন্ধান নামক স্থানে উপনীত হলেন। এটি ছিল শীষমের এলাকাভুক্ত। মুজাহিদ বাহিনী এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত, তাই তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

বাজী রায় যখন জানলেন, মুসলিম বাহিনী এসে গেছে এবং বন্ধান এলাকায় তারা খীমা গেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই এক হাজার গেরিলা যোদ্ধা সওয়ারকে জড়ো করলেন। এদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে দিলেন। যেমন, ওরা যুবতী মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়। মাল-সম্পদ লুট করে। ফসলী ক্ষেত ও ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে দেয়। ওদেরকে আরো বলেন, এই হামলাবাজদের ঠেকানো না গেলে আমরা মুসলিমদের গোলামে পরিণত হব।

ওই সময় বুধিয়ার ঐ এলাকার জাঠ সম্প্রদায় শীষম কেল্লায় গিয়ে মুসলমানদের ওপর গেরিলা হামলার আগ্রহ ব্যক্ত করল। এতে বাজী রায় যারপরনাই খুশী হলেন। তিনি মন্দিরের পণ্ডিতদের ডেকে গেরিলা হামলার শুভ রাত্রী নির্ধারণের অনুরোধ করলেন। এও বললেন, গেরিলা হামলার আগেভাগে কোন বলিদান করার দরকার আছে কি না? দরকার হলে তাও করা হবে।

পণ্ডিত কিছু না বলে মন্দিরে চলে গেলেন। এরপরের সময় আরো আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার আশার চেয়ে রইল। বাজী রায় তার এই নয়া গেরিলা বাহিনীকে বললেন, 'তোমরা আরব বাহিনীর ছাউনি লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারলে পুরস্কারে তোমাদের ঝুলি ভরে দেব। যে সেপাই মুসলিম সেনাপতির মাথা নিয়ে আসতে পারবে তাকে বিশাল পদমর্যাদা দেয়া হবে। মুসলিম সেনাপতির মাথাসম ওজনের স্বর্ণ তাকে দেয়া হবে এবং বুধিয়ার যে যুবতীকে বিয়ে করতে চায় তাকেই দেয়া হবে। আর জীবিত ধরে আনতে পারলে তার শরীরের সমপরিমাণ হীরা-জহরত দেয়া হবে।'

'আমরা তোমাদের একাকী ছাড়ছি না। চেন্নাই জাতির এক হাজার সওয়ারও যাবে তোমাদের সাথে। তোমরা ওদের সাথে মিলে হত্যা করবে।' বললেন রাজা কাকো।

'মহারাজের জয় হোক! আমরা এ জন্য ময়দানে নামতে বাধ্য হলাম যে, মহারাজ দাহিরের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে পারছে না। ওরা আমাদের বর্শা ও তীর বৃষ্টির সামনে টিকতে পারবে না। আমরা পুরস্কারের লোভে আসিনি। এসেছি জিম্মা আদায় করতে।' প্রতিনিধি প্রধান বলল।

'পণ্ডিতজী! শুভ রাত্র ঠিক করুন। যে রাতে হামলা হবে সে রাতে আপনারা পূজা-অর্চনা করতেই থাকবেন। এটা আপনাদের দায়িত্বের পর্যায়ভুক্ত।'

পণ্ডিত দু'দিন পর শুভ রাত্রির পক্ষে মত দিলেন। হামলা একটু দেরীতে করতে বললেন।

'কোন বলিদান করতে হবে কি? বাজী রায় জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ! একজন কুমারীকে বলি দিতে হবে। হামলা করার পূর্বে কুমারীর খুন আমাদের ফৌজের চলার পথে ছিটাতে হবে। ওই কুমারীর মাথা ঝিলের জলে ফেলা হবে। আমাদের সকল সেনা ঐ মাথা ফেলার পর ওই ঝিলের এক আঁজলা জল পান করে তবেই যাবে।'

পণ্ডিতের নির্ধারিত শুভ রাত্রি এসে গেল। জাঠ কবিলার ৮/৯শ' লোক বর্শা ও তীর সজ্জিত হয়ে কেল্লায় জমায়েত হলো। সাথে এক হাজার চেন্নাই ফৌজ।

বাজী রায় এই ১৮শ' ফৌজের সামনে আগুনঝরা বক্তব্য দিয়ে যখন তাদের রক্তে আগুন ধরাচ্ছিলেন, তখন মন্দিরে ১৬ বছরের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত কুমারীর বলিদান কার্যকর হচ্ছিল। তার মাথা কেটে বালতিতে রক্ত জমা করা হলো। মাথা রাখা হলো তশতরীতে। পণ্ডিতরা সমানে ভজন গেয়ে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর পণ্ডিত এই তশতরী নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত বাহিনীর কাছে গেলেন। সন্ধ্যার কালো ছায়া জমেছে প্রকৃতিতে। জ্বলছে বেশুমার মশাল। তশতরীর আগে পিছে মশালধারী দু'ঠাকুর। পেছনে চার পণ্ডিত হরিবোল দিচ্ছে।

বাজী রায় অগ্রসর হয়ে পণ্ডিতের হাত থেকে তশতরী গ্রহণ করলেন। উঁচু স্থানে তা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গেরিলাদের ওই তশতরীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। কুমারীর মাথার চুল তশতরী থেকে ঝুলে পড়েছে। তা থেকে টপকে পড়ছে রক্ত। কুমারীর চোখ বন্ধ। মুখটা খানিক হাঁ করা।

'এই মস্তক ঝিলে ফেলা হবে। তোমরা সবে ঝিলের জল পান করে যাবে। বিন কাসিমের মাথা কেটে আনার পর এই তশতরীতেই রাখা হবে। মনে রেখো, তোমাদের কামিয়াবীর জন্য এই কুমারী আত্মাহুতি দিয়েছে।'

কুমারীর রক্তের বালতি কেল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সৈন্যদের চলার পথে ছিটিয়ে দেয়া হলো।

'যে পণ্ডিত নিজ হাতে কুমারীর বলিদান করেছে সে খালি তশতরী হাতে কেল্লা ফটকে এগিয়ে গেল। পূজারীরা তখন মুখ ফুলিয়ে শঙ্খ ফুঁকে প্যাঁ-পোঁ করছে।

অবশেষে কুমারীর কাটা মস্তক ঝিলে ফেলা হলো। নীরব রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক চিরে ঝপ করে একটি শব্দ হলো। গভীর রাতে কেল্লা ফটক থেকে ১৮০০ ফৌজ বেরিয়ে গেল। সকলেই এক আঁজলা জল পান করল। বাজী রায় এদের সফলতার প্রার্থনা করে বিদায় জানালেন। ঘোড়া ধূলিঝড় উড়িয়ে ছুটে চলল।

॥ ছয় ॥

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও তিনি ধর্মবিশ্বাস থেকে এতটুকু পিছপা হতে নারাজ। জঙ্গী নির্দেশনার পাশাপাশি তিনি বিন কাসিমকে সর্বদা আল্লাহর কাছে মদদ চাইতে বলেন। মার্চ করার সময় সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন।

মুজাহিদবৃন্দ ছাউনিতে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকেন। অনেকে নফল নামাযে লিপ্ত থাকেন। দুপুরের দিকে তারা নগর কেল্লা অবরোধ করেন।

গেরিলা আক্রমণ কিন্তু মুসলিম সমরনীতির অন্তর্ভুক্ত। এতে দুশমনেরা এতই ক্ষতির সম্মুখীন হত যতটা সম্মুখ সমরে হোত না। এক্ষণে দেখার বিষয়, কাকোর বাহিনী মুসলিম গেরিলাদের সামনে কতুটুকু সাফল্য লাভ করে? তবে ভয় যা তা

হচ্ছে মুসলমানরা এই হামলা সম্পর্কে ছিল অনবহিত। তাদের কাছে এটা ছিল কল্পনাতীত। তাদের ছাউনিতে অনেক কমাণ্ডার সস্ত্রীক এসেছিলেন। ছিল অনেক রসদ ও হাতিয়ার।

সফলতার জন্য হিন্দু গেরিলারা কুমারী হত্যা করে এসেছিল। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ও কংসধ্বনি চলছিল সমানে।

কিন্তু মুজাহিদবৃন্দের ভরসা আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও নফল নামায। হিন্দু গেরিলাদের উদ্দেশ্য ছিল এই মুসলিম কাফেলাকে নাস্তানাবুদ-ই নয়; বরং ইসলামকে আরব সাগরের তীরে আটকে দেয়া।

বিন কাসিম যেখানে খীমা গেড়েছিলেন সেখান থেকে শীষম আধা দিনের পথ। এলাকাটি বন্ধুর। চারদিকে টিলার সমাহার।

ধীমান এই সালার সাধারণ রাস্তায় মার্চ করলেন না। তারা গেরিলা হামলা থেকে সতর্কতাবশতঃ এই পন্থা ধরলেন। কাকো ও বাজী রায় মুসলিম ছাউনি ও তাদের চলার পথ শনাক্ত করেই গেরিলা বাহিনী প্রেরণ করেছিল।

বিন কাসিমের ছাউনিতে কুরআন তেলাওয়াতের সুরলহরি ভেসে আসছে। খানিক বাদে বাদে যখমীদের আর্ত চিৎকারে ওই সুরে কিছুটা ভাটা পড়ত। মহিলারা এদের চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

সব কিছু ঠিক থাকলে গেরিলাদের ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীর হামলা হবার কথা। কিন্তু ক্যাম্পের আওয়াজ ক্রমশঃ খামোশ হয়ে গেল। শেষ রাতে ফজরের আজানে সিন্ধুর আকাশ প্রকম্পিত হলো।

ওদিকে শীষমের মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি চলছে অনবরত। বাজী রায় ও কাকো গভীর আগ্রহে কেল্লা বুরুজে অপেক্ষমাণ। তারা গেরিলাদের পথ চেয়ে রয়েছে। এতক্ষণে এদের ফিরে আসার কথা। ওই তশতরী ঝিলের কিনারে পড়ে ছিল যাতে বিন কাসিমের মাথা রেখে দেয়ার কথা।

মুসলিম শিবিরে ফজরের কাতার সোজা হলো। ক্যাম্পের সর্বত্র নিস্তব্ধতা। বিন কাসিমের তেলাওয়াত ভেসে আসছে।

গভীর নযরে বাজী রায় ও কাকো গেরিলাদের পথে তাকাচ্ছেন। আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই ফর্সাভাব তাদের কাছে বিরক্তির কারণ হলো।

নতুন দিনের পয়গাম নিয়ে এক সময় সূর্য বেরিয়ে এলো।

বাজী রায়ের অপেক্ষা এবার তিক্ততায় পর্যবসিত হলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এদিক ওদিক তাকান তিনি।

'সবগুলো কি মারা পড়ল? না না, তা হয় কি করে?' বললেন তিনি।

'কি হয়েছে আমি বলছি। ওরা মুসলমানদের ধ্বংস করে সম্পদ লুণ্ঠনে লেগে গেছে। ওদের নারীদের টানা ছেঁচড়া করছে' এসে যাবে। আসতেই হবে।' বললেন কাকো।

'ওই দেখ!' বাজী রায় দিগন্তের দিকে ইশারা করে বললেন।

দিগন্তে কালো রেখা। পরে পদাতিক ও সওয়ারদের দেখা গেল। বাজী রায় ও কাকো দ্রুত কেল্লা প্রাচীর থেকে নেমে এলেন। ঘোড়ার জিন লাগানো ছিল। তিনি দ্রুত ঘোড়ায় চাপলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটল।

উভয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত তারা গেরিলাদের কাছে পৌঁছুল। তাদের আশা মোতাবেক এরা কোন জয় ধ্বনি করল না। তাদের কমাণ্ডারের চেহারায় হতাশার কালো রেখা।

'আমি পরাজয়ের খবর শুনতে চাই না।' গোসসা কম্পিত কণ্ঠে বাজী রায় বললেন।

কমাণ্ডার করুণার দৃষ্টিতে বাজী রায়ের দিকে তাকালেন। পদাতিক সেনারা থমকে দাঁড়াল। বাজী রায় ঘুরে সকলের দিকে তাকালেন। এদের কেউ-ই যখমী নয়। দ্রুত তিনি একজনের কোষ থেকে তলোয়ার বের করলেন। তলোয়ার রোদে চিকচিক করে ওঠল।

'তলোয়ার যেভাবে গেছে সেভাবেই ফিরে এসেছে যে? কোষ থেকে বের-ই করা হয়নি। তোমরা কথা বলছ না কেন?' গর্জে ওঠেন তিনি।

'মহারাজের জয় হোক। আমরা মুসলিম ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারিনি।' কমাণ্ডার শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দেন।

'কেন?' কোথায় মরেছিলে?

'যারা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম, মুসলমানদের টিকিটিও নেই। পরে তারা বলল, আমরা ভুল করে ফেলেছি। এবার তারা আমাদের দূর দরাজে নিয়ে গেল। সেখানেও কিছু চোখে পড়ল না। এভাবে তারা আমাদের দিগভ্রমের মত ঘোরাতে থাকে। রাত্রির গেরিলা হামলার সময় ততক্ষণে শেষ। শেষ পর্যন্ত ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। মহারাজ! দিবাভাগে আমরা ওদের সামনে পড়লে পরিণতি কি হতো?' গেরিলা কমাণ্ডার বলল।

ওই কমাণ্ডারের তলোয়ার তখনো বাজী রায়ের হাতে। গোস্‌সায় কাঁপছেন তিনি।

আচমকা তলোয়ার উত্থান করে কমাণ্ডারের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। রক্তে যমীন লাল হয়ে গেল। বললেন, 'ওর মাথা ঝিলে ফেলে দাও। পথপ্রদর্শক দু'জন কৈ?'

ওরা ছিল গাইড। যাবার সময় সাথে ছিল। কিন্তু ফেরার পথে ওদের আর পাওয়া যায়নি। জনৈক পদাতিক ফৌজ কমাণ্ডারের মাথা তুলে ঝিলের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সেই ঝিল যেখানে এক কুমারী মেয়ের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল। কমাণ্ডারের মাথাও ওখানে ফেলা হলো। ঝিলের কিনারাস্থ সেই রৌপ্যের তশতরী খালিই পড়ে রইল।

পথপ্রদর্শক দু'লোককে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বাজী রায় বললেন, ওদের দেখামাত্রই মাথা কেটে ঝিলে ফেলবে। দেহ ওদের না জ্বালিয়ে কেল্লার বাইরে ফেলে রাখবে। শৃগাল-কুকুরের উদর-ই ওদের সমাধি হবে।

এদিকে ওরা দু'জন বাজী রায় ও কাকোর আক্রোশ থেকে বাঁচতে মুসলিম শিবিরে আরামে বসে ছিল। এরা দু'জন সেই বৃদ্ধা ও যুবতী, যাদের ইতঃপূর্বে সিস্তান কেল্লা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এদেরকে টহলদার মুজাহিদগণ পাকড়াও

করেছিল। শাবান ছাকাফী এদের দেখামাত্র বললেন, 'তোমরা ফের এসেছ? এবার অন্য কোন যুবতী বুঝি? কিন্তু এবার তোমাদের জীবিত ছাড়া হবে না। ওবার আমাদের সালারে আ'লার কৃপাবলে বেঁচে গিয়েছ।'

'আমরা সেই কৃপার প্রতিদান দিতে এসেছি এবার। এবার জিন্দা থাকা এবং চিরদিনের তরে আপনাদের কাছে চলে এসেছি।' এদের একজন বলল।

শাবান এদের ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না। কিন্তু এদের কথাও ফেলে দেবার মত নয়। তারা বাজী রায়ের পরিকল্পনা সবিস্তারে জানাল। বললো, তারা বাজী রায়কে বলেছে, মুসলিম জাতিকে সম্মুখ সমরে পরাভূত করা সম্ভব নয়।

'পরে এটাই হলো। বাজী রায়কে আমরা বললাম, জীবনবাজি রাখার মত কাজে এবার আমাদের ছেড়ে দিন। তবে আমরা গোয়েন্দাগিরি করতে পারব না। তিনি আমাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। আচমকা তারা রাতে আপনাদের ছাউনিতে গেরিলা হামলার কথা বলে। আমরাও এতে সায় দিলাম।'

তারা শাবানকে বললো, আমাদের দায়িত্ব দেয়া হলো ছাউনি শনাক্ত করতে। আমরা আপনাদের সালারের মেধার প্রশংসা করি। আপনারা এমন এক পথে চললেন যে পথে সাধারণত চলাচলতি হয় না। এমন এক স্থানে ছাউনি ফেললেন, যেখানে এই বিশাল বাহিনীর ছাউনি ফেলার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ঘটনাচক্রে আপনাদের ছাউনি দেখে গিয়ে বাজী রায়কে বলি, গেরিলা শিবিরে আমাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরাই এ বাহিনীর পথ প্রদর্শন করব।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে গাইড বানানো হয়েছিল। নির্ধারিত রাতে এরা গেরিলা বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলো।

'আমরা কি ওদেরকে সোজা আপনাদের ছাউনি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারতাম না? পারতাম। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, আপনাদের কথা, কর্ম ও ইবাদতে আমরা যারপরনাই প্রভাবিত ও বিস্মিত হয়েছি। আপনাদের সালার আমাদের জিন্দা পাঠাবেন কল্পনাও করিনি। আমরা ঠিক করেছিলাম, এই প্রতিদানের বদলা দেব-ই। সেই প্রতিদান আমরা এভাবে দিয়েছি যে, গেরিলা বাহিনীকে ছাউনি বাদে অন্যত্র বোকার মত ঘুরিয়েছি। রাত শেষ করেছি ওদের এভাবেই। শীষমের পথে ওদের ফেরত যেতে বাধ্য করেছি। আঁধার রাতে এক ফাঁকে আমরা কেটে পড়েছি। ওরা অনেক দূর চলে গেলে আমরা কেটে পড়ি। এক্ষণে জনাব। আমাদের চাইলে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু আমরা ইসলাম কবুল করার জন্যই এসেছি।'

'নিজ ধর্মের প্রতি তোমরা এত বীতশ্রদ্ধ!'

'ইতঃপূর্বে ছিলাম না। একে তো আপনাদের ইবাদত আমাদের প্রভাবিত করেছে। এরপর গেরিলা বাহিনীর শুভ কামনায় শীষমে এক কুমারী মেয়ের খামোখা হত্যা সেই বীতশ্রদ্ধভাবে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। আপনারা কি এভাবে মানুষের বলিদান কার্যকর করেন?'

'হ্যাঁ! আমরা ধর্ম রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দেই, তবে সেটা নিরপরাধ শিশু ও কুমারীদের দিয়ে নয়, বরং ওদের জান রক্ষার জন্যই আমাদের লড়াই। চাই সে যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন।'

'জুলুমের কাপালিকতা কি এখানেই শেষ। গেরিলারা যে পথে রওয়ানা করেছে সে পথে ওই কুমারীর রক্ত ছিটানো হয়েছে। শুনেছি আমাদের ধর্মে আত্মাহুতি আছে–তবে সেটা এভাবে বলে শুনিনি। ওই মেয়ের বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়। আপনাদের ধর্মে এমনটা আছে কি?'

'না। আমরা সরল-সঠিক পথে চলি। আমাদের চলার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করলে তার যথাযথ প্রতিরোধও আমরা করি।'

॥ সাত ॥

শাবান সাকাফী দু'জনকেই কাসিমের কাছে নিয়ে গত রাতের বিভীষিকার কথা জানান।

'এটা খোদার অশেষ কৃপা বৈ তো নয়।' বিন কাসিম বললেন, 'আমার চাচা বারবার আল্লাহর মদদ চাইতে এজন্যই বলেছেন। শীষমের রাজার পরবর্তী পরিকল্পনা কি?'

'তিনি লড়াকু নন। বাজী রায়ের কথায়ই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের পরামর্শ নিলে তার কাছে দূত প্রেরণ করে সন্ধি করুন।'

'কিন্তু বাজী রায় যে মানবে না।' বললেন শাবান–'না মানলে কি হবে? তার কাছে কোন ফৌজ নেই। তিনি তো ওই কেল্লায় আশ্রয়ী মাত্র।'

এগুলো ছিল জঙ্গী বিষয়ে আলোচনা। এদের সাথে এগুলো আলোচনা না করাই সমীচীন। তিনি শাবান ছাকাফীকে ইজ্জতের সাথে তাদের রাখতে বললেন। তারা বললো, 'এর চেয়ে বড় ইজ্জতপ্রাপ্তি আর কি হতে পারে যে, আপনারা আমাদেরকে আপনাদের ধর্মে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি এজাযত দিলে আমরা মুসলিম হিসাবে আপনাদের বাহিনীতে যোগ দেব।'

উভয়ে বিন কাসিমের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন। শাবানকে বললেন, আগে তাদের ইসলামী তালীম-তরবিয়ত দেয়া হোক। আপাততঃ ফৌজে শামিল স্থগিত থাক।

আল্লাহর অপার করুণায় বিন কাসিম এক মহাবিপদ থেকে বেঁচে পরদিন শীষম অবরোধ করার হুকুম দিলেন।

এ সময় নাবাতাহ বিন হানযালাহ চারজন দূত কাকো রাজার কাছে প্রেরণ করেন। কাকো জিযিয়ার শর্তে রাজি হন। তিনি যুদ্ধে সম্মত ছিলেন না।

এদিকে কাকো ও বাজী রায়ের মধ্যে এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। কাকো বাজী রায়কে বললেন, 'গেরিলাদের

ব্যর্থতা এক চরম অশুভ পরিণতির লক্ষণ। এটা সুস্পষ্ট যে, অবরোধে পড়লে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

'কাপুরুষতার প্রমাণ করো না কাকো। অবরোধ দেখলে কোথায়। রাজা দাহিরের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে আমি সৈন্য সংগ্রহ করব। তোমার কাছেও পর্যাপ্ত ফৌজ আছে। আঠারশ' যোদ্ধা তো অক্ষতই রয়েছে। আমরা ওদের বাইরে পাঠিয়ে দেব। মুসলমানরা অবরোধ করলে এরা ওদের ওপর পেছন থেকে হামলা করবে।'

'বাজী রায়! তোমার একটাই গর্ব করার বিষয় যে, তুমি রাজা দাহিরের ভাতিজা। সিস্তানেও তোমার কাছে ফৌজ কম ছিল না। তুমি দক্ষ সেনানায়ক হলে ওখান থেকে শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালাতে না। যা বলছি বোঝার চেষ্টা করো। ধর্মে আমি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম এভাবে মানুষের রক্তপাত পছন্দ করে না। কিন্তু তুমি আমার সামনে এক নিষ্পাপ কুমারীর বলিদান করেছ। এর দ্বারা তোমার লাভটা কি হয়েছে শুনি? বিফলতা ও হতাশা। এক্ষণে ওই নিষ্পাপ যুবতীর অভিশাপই তোমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার পরই সম্ভবতঃ আমাকেও পাবে তার অভিশাপে। আমি আমার লোকদের রক্ত বইতে দেব না।'

'তাহলে তুমি এ শহর মুসলমানদের হাতে দিয়ে দিতে চাও?'

'চাই বৈ কি। যে তশতরীতে তুমি বিন কাসিমের মাথা দেখতে চেয়েছিলে, আমার উচিত সেই তশতরীতে তোমার মাথা রাখা। কিন্তু আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না। তুমি এ শহর থেকে বেরিয়ে যাও।'

বাজী রায় তার সাথে ফৌজ না থাকায় নিজেকে অসহায় মনে করলেন। এক্ষণে তার পলায়ন ছাড়া গতি নেই। তিনি সপরিবারে বেরিয়ে পড়লেন। কাকো তাকে বিদায় জানাতে কেল্লার প্রাচীরে উঠলেন। তিনি দিগন্তে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগমন স্থল দেখছিলেন এবং বিক্ষিপ্ত পায়চারি করছিলেন। খানিক বাদে তিনি ৫ জন সওয়ারকে কেল্লামুখে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তিনি তখন কেল্লার প্রধান ফটকের ওপর দাঁড়ানো। তারা নিকটে এলে পোশাকে-আশাকে ভিনদেশী মনে হলো। তার বুঝতে দেরী হলো না যে, এরা আরব সওয়ার।

দরোজার সামনে এসে সওয়ার থেমে গেল।

ফটক প্রহরী দরোজা খুলে এদের কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই কাকো জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি উদ্দেশে এখানে?'

এরা সিন্ধী ভাষা জানে বিধায় জবাব দিলো, 'আরব সালার বিন কাসিমের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি।' নাবাতাহ বললেন।

'উদ্দেশ্য কি?'

'বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে। আপনি যেমন চান না মানুষের খামাখা রক্তারক্তি, তেমন আমরাও তা পছন্দ করি না। এক নিষ্পাপ যুবতীর বলিদান করে ফায়দা হয়েছে কতটুকু?'

কাকো পূর্ব হতেই এ ধরনের প্রস্তাবের জন্য তৈরী ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম কি করে তার কাছে আসবেন। বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রেরণ করেন কিনা। করলেও তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে কিনা। তিনি দৌড়ে নামলেন। কেল্লা ফটক খুলে বেরিয়ে এলেন। সহাস্য বদনে নাবাতাহ বিন হানযালাকে অভিবাদন জানালেন। বললেন, 'আমি কেল্লা ফটক আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে আপনাদের পরিকল্পনা কি হবে? আর আপনাদের সন্ধি প্রস্তাবই বা কি ধরনের?'

নাবাতাহ বিন কাসিমের সন্ধির শর্তসমূহ তুলে ধরলেন। কাকো বিস্মিত চিত্তে শর্ত মেনে নিলেন। তার বিস্ময়ের কারণ–প্রবল প্রতিপক্ষ এত সহজ প্রস্তাব রাখে কি করে? নাবাতাহ কাকোকে বললেন, আপনি আমাদের সালারের সাথে দেখা করতে যাবেন কি? একটি শর্ত আমি এখনো বলিনি। বাজী রায়ের খান্দানকে আমাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে।'

'আপনারা দেরী করে ফেলেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সে আমায় উস্‌কে দিয়েছিল। কিন্তু আমি তার কথায় কর্ণপাত করিনি। আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জেনে গ্রেফতার হবার ভয়ে সে সপরিবারে পলায়ন করেছে। আমি আপনাদের সাথে সালারের কাছে যেতে প্রস্তুত।'

খানিক বাদে দূতবর্গের সাথে কাকো বিশাল উপঢৌকনাদিসহ মুসলিম শিবিরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দেহরক্ষীসহ এদিকেই আসছিলেন। পথিমধ্যেই তাদের সাক্ষাত হল। কাকো যে কোন শর্তে বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করলেন। বিন কাসিমও শুধু তার নয়, তার গোটা খান্দানের হেফাজতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

কাকোর সাথে বিন কাসিম শীষম কেল্লায় প্রবেশ করলেন।

'এদেশে গদিকে খুবই সম্মানের নযরে দেখা হয়। এদেশে গদিতে রেশমী ঝালর থাকে। যাতে মাথাও পেঁচাতে হয়।' বললেন কাকো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার পাশাপাশি একটি চেয়ারে কাকোকে বসতে দিলেন। দামী একটা রেশমী কাপড় তিনি কাকোর মাথায় পেঁচিয়ে দিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সভাসদগণ সালারের এই আচরণে খুবই বিমুগ্ধ হন।

এরপর বিন কাসিম তাঁর উপ-সেনাধ্যক্ষ আবদুল মালিক ইবনে কায়েসকে কিছ ফৌজ দিয়ে বিদ্রোহী বসতিগুলোয় হামলা করতে বললেন। আব্দুল মালিক সে মতে হামলা শুরু করলেন। বিদ্রোহীরা মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় নামল। তাদের লাশের স্তূপ হয়ে গেল। সেই লাশের ভীড়ে বাজী রায়কেও আবিষ্কার করা হলো। আবদুল মালিকের এই অভিযানে শীষম বিদ্রোহীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেল।

বিদ্রোহী ঘাঁটিতে বহু মূল্যবান সম্পদ পাওয়া গেল। স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার। কয়েদীরা বলল, বাজী রায় তাদের জড়ো করেছিল। তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম দ্রুত হামলা না করলে অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াত।

বিভিন্ন গোত্রের যে সব সর্দার বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল তারা সাধারণ ক্ষমার আবেদন করল। তারা বার্ষিক এক হাজার দেরহাম করে দেবে শর্তে তাদের মাফ করে দেয়া হলো। তারা সানন্দে এ শর্ত মেনে নিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ বসরায় প্রেরণ করলেন। হাজ্জাজকে শীষম তথা বুধিয়া জয়ের সংবাদ জানানো হলো। এখানে তিনি দু'হাকেমকে নিয়োগ করলেন। তন্মধ্যে একজন আব্দুল মালিক ইবনে কায়েস, আরেকজন হামিদ বিন ওয়াফা। উভয়ে জারূদ বংশোদ্ভূত।

॥ আট ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ইরাক থেকে হাজ্জাজের ফরমান এলো। হাজ্জাজ জানালেন, পরবর্তী অভিযানে না গিয়ে নিরূনে চলে যাও। সৈনিকদের কিছু আরামের সুযোগ দাও। রসদ সামগ্রী পুরোপুরি সংগ্রহ কর। দাহিরকে খোলা ময়দানে ডাকো। এভাবে ওকে পরাস্ত করো যেন সে তোমার কদমে এসে আছড়ে পড়ে। ওই রাজাকে পরাস্ত করতে পারলে হিন্দুস্থানে তোমার ভাগ্যের অবারিত দ্বার খুলে যাবে। তোমার মোকাবেলায় কেউই দাঁড়াতে পারবে না। নামায ও দোয়া-দরূদের প্রতি উদাসীন থেকো না। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

চিঠি পাওয়ামাত্রই বিন কাসিম শীষমে হাকেমদের কাজকর্ম বুঝিয়ে নিরূন যাত্রার বন্দোবস্ত করলেন। ফৌজ কিছু এখানে রেখে গেলেন। বাকীদের সাথে নিলেন।

তিনি যাত্রা করবেন–এসময় খবর এলো, সেই গুপ্তচর দু'যুবতী ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা তাদের সর্দারদেরকে ইসলাম বুঝিয়েছে।

চেন্নাই জাতি মুসলমানদের চরিত্র জানতে পারল। তারা সালারের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। বিন কাসিম তার সৈন্যদের কোচ করার হুকুম দিলেন।

দাহিরের দেশে

॥ এক ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন নিরূনে উপনীত হন তখন দুই মেরুতে দু'জন লোক রাতের ঘুম হারাম করেছিলেন। দু'জনেই এ আশায় উৎকর্ণ থাকতেন যে, রণক্ষেত্র থেকে দূত এসেছেন। আবার এরা দু'জন কখনও বা পেরেশানীতে প্রাসাদের বারান্দায় পায়চারি করতেন। কেমন একটা উদ্বেগ তাদের দিল মনে ছেয়ে থাকত যেন।

তন্মধ্যে একজন রাজা দাহির অন্যজন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। একজন রাজধানী আরোড়ে অন্যজন বাগদাদে।

দাহিরের দেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ী ঘোড়া সদম্ভেই হাঁকিয়ে চলছিলেন। মন্দিরের শহর পরিণত হচ্ছিল মসজিদে। রাজা দাহির হিন্দু ধর্ম, হিন্দু মন্দির ও হিন্দু বিশ্বাস ছাড়া আর কোন ধর্ম সহ্য করতে পারতেন না। এজন্য তিনি বৌদ্ধ বিহারগুলোয় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। স্রেফ সেই প্রদেশে তার এই আইন চলত না যেখানকার গভর্ণর বৌদ্ধ এবং জনগণ বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এক্ষণে নতুন এক ধর্ম এসে দেশ জয়ের পাশাপাশি তাদের ধর্ম কর্ম ও মানুষকে হিন্দু ধর্ম ছাড়তে সহায়তা করছে।

যৌবনকালে রাজা দাহির চিন্তা করে রেখেছিলেন, কোন না কোনদিন তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। মাকরানে আরব বিদ্রোহীদের বসবাসের মধ্য দিয়েই তার সেই চিন্তার শুরু। বিন কাসিম তখনও পয়দা হননি। রাজা দাহির তাই আরব খেলাফতকে কমযোর করতে এদের-আশ্রয় দেন। এ উদ্দেশেই তিনি আরবের বণিক কাফেলা ও সহযাত্রীদের জাহাজ লুণ্ঠন করেছিলেন। যাতে মুসলমানরা ভয় পেয়ে যায় এবং সিন্ধু অভিযানের কল্পনাও না করে।

কিন্তু দাহিরকে এই কৃতকর্মের মাসুল কড়ায় গন্ডায় আদায় করতে হয়েছিল। তার আকলমন্দ উজীরও হয়ত ঠাহর করতে পারেননি যে, তারা কোন্ জাতির আত্মসম্ভ্রমের ওপর হাত দিয়েছেন।

রাজা দাহির আরোড়ে প্রতিদিনই পরাজয় কাহিনী হজম করছিলেন। তার সকালের নাশতার টেবিলে কোন দুর্গ, লোকালয় কিংবা প্রদেশের পরাজিত হবার সংবাদ পরিবেশন হতই। একদিন তিনি নাশ্তার টেবিলে বললেন, 'বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে।' তার স্ত্রী (যে কিনা আপন বোনও) মায়ারাণী বললেন, 'মহারাজ! দেবলের শাসক তো ভিক্ষু ছিলেন না। বাজী রায়তো আমাদের-ই ভাতিজা। অমনটা ভাববেন না। বরং এই উত্থিত তুফান রুখবার চিন্তা করুন। ফৌজ সংগ্রহ করুন। এবার আপনাকে খোলা ময়দানে নামতে হবে।

‘দেখছ না কি পরিমাণ ফৌজ আমরা সমবেত করেছি? আর কাকে তুমি তুফান বলছ? বিন কাসিমের পরাজয় আমার হাতেই লেখা। ওই বেটা আমাদের হাতির মোকাবেলা করবে কি করে?’

‘মহারাজের জয় হোক। আপনার প্রভাবে শত্রু কাঁপে ঠিকই, তবে আপনার গোলাম সাহস করে বলতে পারে যে, যে সেনাপতি পরমা সুন্দরীদের নাগাল পেয়েও দূরে ঠেলে দেয়, সে হাতির মোকাবেলায় সক্ষম।’ বললেন উজীর।

‘কিন্তু ওদেরকে আমি আরোড় পর্যন্ত পৌঁছতে দেব না। ওরা এখনও রাজকুমার জয় সিংহের মোকাবেলা করেনি। আরব বাহিনীকে খতম করে আমি বুদ্ধিস্টদের গাদ্দারীর শোধ নেব। সিন্ধুতে গাদ্দার জাতির ঠাঁই নেই। এক একটাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলব।’ বলতে বলতে দাহির থেমে যান। খানিক চিন্তা করে বলেন, ‘এমন কেউ নাই যে আমাকে বলবে, আরব বাহিনী এখন কোথায় কোচ করছে?’

উজীর বললেন, ‘এই রহস্য উদঘাটন খুবই মুশকিল। শীষম থেকে বিন কাসিম সসৈন্যে নিরূনের পথ ধরেছে। আমাদের ধারণা ছিল সে আরোড় অভিমুখে অগ্রসর হবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে নিরূন গেছে।’

‘রহস্য উদঘাটন নারীদের পক্ষেই সম্ভব। ওরা পাথরের বুক চিরে রহস্য বের করে আনতে পারে। শরাব দ্বারাও সম্ভব রহস্যোদঘাটন করা। কিন্তু মুসলমানরা এ দু'টি জিনিস ছুঁয়েও দেখে না। আমি যে যুবতীদের পাঠিয়েছিলাম তাদের দেহে ছিল নাগরাণীর বিষ। কিন্তু জোয়ান সালারকে সে বিষে ওরা ছোবল মেরে নীল করতে পারেনি।’ বললেন মায়ারাণী।

‘আমি নারীদের একটা বাহিনী তৈরী করতে পারি মহারাজ!’ মায়ারাণী বললেন।

‘আর বুদ্ধমান তুমি? বীটে কোন বিচক্ষণ লোক পাঠাও। সে বৈশ্যদের বলবে, নিরূন, শীষমের পর মুসলমানরা সিস্তানও কব্জা করে নিয়েছে। তোমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা ও তোমরা সবাই আরবদের প্রজা হয়ে গেছ। তুমি বোঝ, আমার বক্তব্য কি! বৈশ্যদের গভর্নর বিশ্বনাথ আমার দোস্ত ও অনুগত লোক। সে নিশ্চুপ বসে থাকবে না।’

॥ দুই ॥

বীটরান কচ্ছ এলাকার বিশেষ একটি কেল্লার নাম। এলাকাটি আর্দ্র। ওই অঞ্চলের গভর্নর বিশ্বনাথ। দাহির-ই তাকে গভর্নর বানিয়েছিলেন। অবশ্য ইনি স্বাধীন রাজা। তার ছিল দু'পুত্র। রাসেল ও মুকু। মুকু রাসেলের ছোট ভাই ও জোয়ান। দু'ভাই-ই তেগ চালনা ও শাহসওয়ারীতে সমানে নামযশ কুড়িয়েছিল।

মুকু বড় ভাই রাসেল থেকেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। প্রজাদের সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তার এই মানসিকতা পিতা ও ভাই পছন্দ করত না। মুকুকে বারবার তারা বলেছে, রাজা-প্রজার সম্পর্ক মনিব-গোলামের। রুটি প্রজাদের হাতে তুলে না দিয়ে নিক্ষেপ করে দেয়াই উত্তম। মুকুর কাছে একথা ভাল লাগত না।

মুকুর বিবাহের কথা চলছিল। তার কনে সম্ভবত কোন গভর্নর-পুত্রী। কিন্তু মুকু আরেকজনকে বিবাহের কথা বলে রেখেছিল। সেই মেয়ে প্রজাদের কেউ। ফৌজের মামুলী এক কর্মকর্তার মেয়ে। মুকুর সাথে তার মেলামেশা ছিল। মুকু বলল, আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। বাবা এতে পেরেশান। তিনি প্রথমে ওকে স্নেহভরে বোঝান। অতঃপর ধমকি দেন। বলেন, তাহলে তোমাকে উত্তরাধিকার ও গদি থেকে বঞ্চিত করা হবে।

মুকু বললো, 'ওই মেয়ের সাথে জংগলে থাকতে হলেও থাকব। ক্ষমতার প্রতি লোভ নেই আমার। আমি ওই মেয়েকেই চাই। বিশ্বনাথ শেষ পর্যন্ত ওই মেয়ের বাবাকে ডেকে বললেন, তোমার মেয়ে যেন রাজকুমারের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়। নইলে তোমাকে পদচ্যুত করা হবে।'

বাবা মেয়েকে একথা বললে সে বলল, 'রাজকুমার যখন আমার জন্য রাজপ্রাসাদ ছাড়তে চাইছে তখন আমি কিছুতেই মেলামেশা বন্ধ করব না।'

বাবা মেয়ের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে গলাটিপে তাকে মেরে ফেলল এবং সরাসরি রাজদরবারে গেল। বললো, 'মহারাজ বলেছিলেন আমার মেয়েকে রাজকুমারের সাথে মেলামেশা করতে না দেই। আমার ওয়াদা আমি মেয়েকে গলাটিপে মেরে পালন করেছি। আপনার সম্ভ্রম রেখেছি।'

'শাবাশ! বলো, তোমার মেয়ের খুনের কি বদলা চাও?' বিশ্বনাথ বললেন। এসময় একটা শব্দে মেয়ের বাবা পেছনে তাকালেন। কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই মুকুর নিক্ষিপ্ত বর্শা তার বুকে গেঁথে গেল। দেহরক্ষীরা কেউ মুকুকে ধরতে গেল না। কেননা বিশ্বনাথের পুত্র সে।

'ওকে গ্রেপ্তার করো। কালো কুঠরীতে নিয়ে যাও।' গভর্ণর বললেন। মুকু তলোয়ার বের করলেন। তার কোষে দু'টি হাতিয়ার। আচমকা সে দরবারীদের দিকে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'এসো! হিম্মত থাকলে আগে বাড়ো।'

বড় ভাই রাসেল খালি হাতে অগ্রসর হলো। 'চলে যাও মুকু! দ্রুত বেরিয়ে যাও!' মুকু দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার কালে বাবাকে বলে গেল, তাকে শ্রীঘরে পাঠানো হলে ফল ভাল হবে না। জনগণের মাঝে মুকুর খুব প্রভাব ছিল। বিশ্বনাথ ও রাসেল ভয় করছিলেন, পেছনে না জানি আবার জনগণ বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। জনগণ মুকুর প্রতি যে দুর্বল তা তার অজানা ছিল না। মুকু আরো বলেছিল, তাকে আলাদা অঞ্চল দেয়া না হলে মসিবত নেমে আসবে দেশের ওপর। বিশ্বনাথ ও রাসেল পরামর্শ করে মুকুকে দেশের এক দশমাংশের কর্তৃত্ব দিলেন। মুকু ওই স্থানের স্বাধীন রাজা হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

মুকুর মনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি কিভাবে টান সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে তারীখে মাসুনীর বর্ণনা মতে এতটুকু উদ্ধার করা গেছে, সেই শৈশবাধি তার মনে শিকারের প্রচন্ড শখ ছিল। শিকার করতে করতে সে বহু দূরে চলে যেত। ঘটনাক্রমে একবার মাকরানের বিদ্রোহী আরবদের সাথে তার সাক্ষাৎ। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের প্রথা ও রসম-রেওয়ায অবগত হন। এরা যেহেতু রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ রাখে না, সেহেতু বিষয়টি তার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি দেখেন, মুসলমানরা মানবতাকে সর্বোচ্চে ঠাঁই দেয়।

এরপর মুকু খোলাখুলি মুসলমানদের সমর্থন শুরু করে। বিশ্বনাথ ও রাসেলের কানে এখবর যেতেই তারা ওকে ইসলাম বিদ্বেষী বানানোর কোশেশ করে। তারা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তুমি এদেশের রাজকুমার। পক্ষান্তরে মুসলমানরা তোমার দেশ, জাতি ও ধর্মের দুশমন। কিন্তু বড় ভাই ও বাবার এই কূট চালে মুকু এতটুকু প্রভাবিত হয় না। তারা কিছুতেই মুকুর হৃদয়ের সেই কাঁটা অপসারণ করতে পারে না যে, এক বাবা তার মেয়ের গলা টিপে দিয়েছিল। ওই মেয়ের দোষ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে সাধারণ এক প্রজা।

এদিকে দেশের জনসাধারণ বিন কাসিমের প্রজা বনে যায়। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। সকলেই শাবান ছাকাফীর কর্মী হয়ে যায়। শাবান এদের ট্রেনিং দিয়ে জাঁদরেল গোয়েন্দা বানিয়ে ফেলে। আরব্য গোয়েন্দারাও ছিল, কিন্তু তারা সুন্দর সাদা চেহারার দরুন গোয়েন্দাগিরিতে অতটা যুৎ করতে পারতেন না যতটা পারত শ্যামলা চেহারাবিশিষ্ট সিন্ধুবাসী। কেবল সেই সব আরব্য লোককে সিন্ধুতে গোয়েন্দা বানানো হত যারা দেখতে কিছুটা কালো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ওই গোয়েন্দাদের দূর-দরাজে প্রেরণ করেছিলেন। এর থেকে দু'জন গোয়েন্দা কচ্ছ এলাকায়ও গিয়েছিল। তন্মধ্যে একজন নিরূন এসে মুকু সম্পর্কে জানাল, তিনি মুসলমানদের প্রতি দুর্বল। সে আরও বলল, মুকুর কাছে দূত প্রেরণ করলে ভালো ফলাফলের আশা করা যায়। তিনি শুধু দোস্তী-ই গ্রহণ করবেন না, আনুগত্যও কবুল করবেন।

শাবান ছাকাফী এই পুরো কথা বিন কাসিমের কানে দিলেন। তিনি বললেন, শাবান! তুমিই যাও তার দরবারে। শাবান ছাকাফীর দেহরক্ষী ব্যবসায়ীর ছদ্মাবেশে রওয়ানা করল। বিন কাসিম মুকুর নামে বেশ কিছু তোহফা পেশ করেছিলেন।

এই কাফেলা দু'তিন দিন টানা সফর করার পর মুকুর এলাকা সুরথে উপনীত হলো। তাদের আগমনে ওখানকার ব্যবসায়ীরা সব একত্রিত হলেন। শাবান ছাকাফী বেশী চাহিদার জিনিসগুলো নিয়ে মুকুর কাছে গেলেন। তিনি মুকুকে জানালেন, দক্ষিণ হিন্দুস্থানের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা এসেছে। তাদের দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। শাবান পণ্যের সবটাই তার কাছে পেশ করলেন। মুকু কিছু জিনিস পছন্দ করলেন এবং দাম জিজ্ঞাসা করলেন, শাবান বললেন, 'মহারাজ বোধ হয় মূল্য পরিশোধ করে ফেলেছেন।'

'কি বলছ তুমি? তোমাকে তো এই প্রথম দেখছি।' বললেন সম্রাট মুকু।

'আমি এখানে এসে শোনলাম আপনি মুসলমানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জনসাধারণকে আল্লাহর মাখলুক সাব্যস্ত করেন। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেননি, আমি মুসলমান। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের বণিক। আমরা মুসলমানরা অকৃতজ্ঞ নই। শুনে আনন্দ লেগেছে, আপনি খোদার বান্দা ও উঁচু-নীচু জাতিভেদ প্রথা মিসমার করার পক্ষে। আমি এগুলো বেচতে এসেছি। তবে আপনার যা পছন্দ হয় বেছে নিন। তোহফাস্বরূপ দেব ওগুলো।

'না! মুসলিমের পক্ষে যদি কোন ভালো কথা বলে থাকি তবে এর বদলা নেব না। তোমার উদ্দেশ্য এই নয় তো যে, আমাকে কিছু বিনা মূল্যে দিয়ে আমার প্রজাদের কাছ থেকে গগণচুম্বী মূল্য আদায় করবে? আমার প্রজাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণা আমি বরদাশ্‌ত করব না।'

'আপনি বণিক সমিতির মাধ্যমে আমার পণ্যের দাম যাচাই করতে পারেন। মুসলমানরা ধোঁকা খেতে পারে, দিতে জানে না।

শাবান ছাকাফী তার উচ্চ জ্ঞানের মহান বিবেকবলে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। এখানেই তার সার্থকতা ও অন্যের সাথে তার পার্থক্য। এ সময় তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নামোল্লেখ করেন। বলেন,

'আপনি আরব বাহিনীর মোকাবেলা করলে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বেন। কাজেই আপনি আগে ভাগে তাঁর সাথে সন্ধি করে নিলে ভালো। এতে আপনার গভর্ণরী টিকবে। এতে আর যে উপকারটি হবে তা হচ্ছে, আপনার প্রজারা-তাদের পছন্দমত সুখী জীবন যাপন করতে পারবেন।'

'আমার বিশ্বাস হয় না। কোন বিজেতা কি বিজিতদের সাথে এমন আচরণ করে থাকে?'

দেবল থেকে না হয় খবর জেনে নিন। নিজনে খোদ আপনি গিয়েই সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে পারেন। আরো কিছু বসতি মুসলিম কব্জায় এসে গেছে। সত্যিই আপনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান কি-না।'

'তুমি নিছক একজন ব্যবসায়ী। তোমার সাথে রাষ্ট্রীয় কথা বলতে চাই না আমি। আমি মুসলমানদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা কিংবা মিত্রতা করতে চাইলে তুমি তো আমার কোন কাজে আসতে পারছ না।'

'আপনার এরাদা জানালে চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমি আরব সালার মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে কথা বলার মত মর্যাদা ভোগ করি।'

'খোদ আমি আরব সালারের কাছে যাব না। এর কারণ, একে তো তিনি আমাকে বুযছিল ঠাওরাবেন। দ্বিতীয়ত আমার বাবা ও বড় ভাই মুসলিম জাতিকে ভালো বলায় চটে আছেন। তারা বলবে, লড়াই না করেই আমি মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করেছি।'

'আমি ওয়াদা করছি, আপনি বিন কাসিমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে আপনার গদি বহাল থাকবে। তবে এক শর্তে। তা হলো, বিন কাসিমের মদদ লাগলে করতে হবে।'

'দেখ তুমি কিন্তু হালির চেয়ে বেশী হাঁটছ। যে কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব, এক সালারের পক্ষ হয়ে তা কপচাতে যেও না। তোমার দেমাগ ব্যবসায়ী পণ্যের মাঝেই সীমিত রাখ।'

'আমি সালারের পক্ষ হয়েই কথা বলছি মহারাজ! তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি ব্যবসায়ী নই। দক্ষিণ হিন্দুস্থানে আমার ব্যবসাও নেই। আমি বিন কাসিমের দূত। এ পণ্য তিনিই উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।'

'তা হলে তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করলে যে?'

'কেননা আপনি আমার ওইসব কথায় বীতশ্রদ্ধও হতে পারতেন। আমি দূত হিসাবে আসছি জেনে আপনি আমায় কয়েদ করতে পারতেন। কিংবা বে-ইজ্জতি করে বহিষ্কারও করতে পারতেন। আমি আমার পরিচয় ঠিক তখনই তুলে ধরেছি যখন জেনেছি সত্যিই আপনি দোস্তীর পক্ষে।'

'তোমার সালারকে বলো, আমি তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছি। তুমি এই ছদ্মাবরণেই চলে যাও। কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়।'

শাবান সাকাফী চৌরাস্তায় এলেন। তাঁর ছদ্মবেশী সঙ্গীরা স্ব-স্ব মাল বিক্রি করে বসে ছিল। সকলকে নিয়ে তিনি নিরূনাভিমুখী হন। ওদিকে তাঁর ছদ্মবেশী সাথীরা মুকুর বাবা বিশ্বনাথ ও বড় ভাই রাসেলের অবস্থা এবং সৈন্য পরিসংখ্যান জেনে নিয়েছিল।

॥ চার ॥

শাবান ছাকাফী নিরূন পৌঁছে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে পুরো মত বিনিময়ের কথা জানান। জানান কচ্ছ এলাকার ফৌজ ও রসদের কথাও। তাঁর রিপোর্টে প্রধানতঃ দু'টি দিক ছিল। প্রথমতঃ মুকু দোস্তী প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত কচ্ছ প্রদেশে বিশ্বনাথের মদদের জন্য জাবীন নামী এক ফৌজি জেনারেলকে প্রেরণ করেছেন রাজা দাহির। জাবীন দেবলের গভর্ণর ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি দেবল থেকে জীবিত পলায়ন করেন। দাহির আঁচ করেছিল বিন কাসিমের এবারের টার্গেট কচ্ছ।

নিরূনে বসে বিন কাসিম যখন কচ্ছ প্রদেশের কথা শাবান ছাকাফীর মুখে শুনছিলেন তখন হাজ্জাজের পত্র তাঁর সামনে। শীষমেই এই পত্র তিনি পেয়েছিলেন। শাবানের রিপোর্ট পাবার পর তিনি হাজ্জাজের নামে পত্র লেখলেন। এতে তিনি বিজয়ের পুরো কাহিনী লেখেন। লেখেন সে সব গভর্ণরের কথাও যারা বিজয়ী এলাকাগুলোয় নিয়োজিত হয়েছেন। লেখেন শহীদ ও যখমীদের তালিকা। লেখেন রসদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজনের কথা। শেষে লেখেন শাবান সাকাফীর সফল কূটনৈতিক মিশনের কথা।

এ চিঠি লেখে বিন কাসিম তাঁর বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন। তিন/চার দিন চলার পর একস্থানে ছাউনি ফেললেন। এখানে তিনি হাজ্জাজের পত্রের অপেক্ষা করছিলেন।

হাজ্জাজের উত্তর খুবই জলদি এসে গেল। ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর ফতুহুল বুলদানে এ চিঠি পুরোপুরি তুলে ধরেছেন। হাজ্জাজের কাছে লেখা পত্রে বিন কাসিম খুবই শ্রদ্ধা-সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছিলেন। বেশ কিছু খেতাবও জুড়ে দিয়েছিলেন। হাজ্জাজের কাছে এটা বেখাপ্পা লেগেছিল। তিনি তাঁকে এরূপ লেখেন–

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম---প্রিয় বেটা করিমুদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসিম! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন। তোমার পত্র খেতাব আর কৃত্রিমতায় ভরপুর। বুঝে আসছে না তুমি এমনটা করলে কেন! অবস্থা ও পরিবেশের যে ধরন তুমি লেখেছ, আগাগোড়া তা গভীর নযরে পড়েছি। প্রিয় পুত্র হে! তোমার কি হয়েছে? নিজস্ব মেধা, বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে কাজ করতে পারছ না কেন? আমার বিশ্বাস, প্রাচ্যের সমস্ত রাজা-বাদশাদের তখত তাজ তুমি ধূলি নিষিক্ত করবে। কাফেরদের সমস্ত কেল্লায় বিজয় কেতন ওড়াবে। তুমি ওদের পরাভূত করার শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলেছো কি? ওরা তো ইসলামকে পদানত করতে এক পায়ে খাড়া। মনকে শক্ত কর বেটা! খোদার দুশমনকে পরাভূত করতে যত ইচ্ছা অর্থ খরচ করো। সকলের দরখাস্ত যথাসাধ্য কবুল করতে চেষ্টা কর। নিরাপত্তা চাইলে নিরাপত্তা দিও। কোন বিধর্মী প্রশাসক তোমার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করলে তাকে স্বপদে বহাল তবিয়তে রেখো। যে পরিমাণ কর তারা দিতে সম্মত হয় অতি সত্বর তা মেনে নিয়ে উসুল কর। বেটা আমার! দূতবর্গের ব্যাপারে খুবই সচেতন থেকো। বিজিত এলাকায় যাদের দূত নিয়োগ কর ওদের ব্যাপারে সুপরিপক্ষ ধারণা রেখেই প্রস্তুত থেক। ওদের দূরদর্শিতা, ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি ঈগলের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখ, ওরা যেন শত্রুর দাপট, নারী ও লোভ লালসার মায়াজালে আটকে না যায়। মনে রেখো, হিন্দুস্থান নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও প্রতারণার দেশ বেটা! সুতরাং ভেবে চিন্তেই দূত নিয়োগ করো।

দাহিরের চালবাজি থেকে সাবধান! তোমার পক্ষ থেকে কোন দূত কিংবা কূটনৈতিক প্রতিনিধি তার কাছে গেলে সে যেন বচসায় লিপ্ত না হয়। তোমার যে কোন দূত যেন ভিনদেশী রাজার সামনে নির্ভীক থাকে। রাজাগণ কোন উত্তর দিলে গভীর হৃদয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে পড়। এ বিশাল বাহিনীর জয়-পরাজয়ের জিম্মা তোমার হাতে ন্যস্ত বাবা! দূত এমন লোকই হওয়া দরকার যে ধার্মিক। যার কথায় প্রভাব আছে। যে বাদশাহর দরবারে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে ওজস্বী ভাষায় বলতে পারে–খোদার একত্ববাদের উপর ঈমান আনো। যদি এতে মত না দেও তা হলে তোমাদের দেশের জিম্মা আমাদের ওপর ন্যস্ত করো। বাতিল আকিদা মনে রেখে খোদার একত্বের ওপর ঈমান আনলে আমরা তোমাদের ক্ষমা করব না। তৈরী হয়ে নাও চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য।

এবার তোমার মোকাবেলা হবে দাহিরের সাথে। সিন্ধু ও মোহরা নদীর ওপারে তার দেশ। সিন্ধু নদ তুমি পাড়ি দেবে। দাহিরকে এপারে আসতে দিবে না। তাকে ডেকে বলবে, আমরা সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়েই তবে তোমার সাথে লড়ব। এর পর লড়াইয়ের জন্য সমতল ও মসৃন প্রান্তর নির্বাচন কর, যাতে তোমার পদাতিক ও সওয়ারদের রীতিমত দেখেশুনে কমান্ড করতে পার এবং সুযোগ বুঝে যুদ্ধের পন্থা

পাল্টাতে পার। তোমার বাহিনী টহল দিতে দিতে লড়বে। তোমাদের জন্য এটা যত কঠিন-ই হোক না কেন। আল্লাহ্ ভরসা করো। কেননা জয়-পরাজয় তাঁর হাতেই ন্যস্ত। তাঁর রশি মজবুতভাবে ধারণ করো। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে লড়াই। মদদ-ও তাই তাঁর কাছে চাও। মন দিয়ে লড়। হতাশা জিনিসটা তোমার মন থেকে মুছে নাও। দেখবে খোদার পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কি নিষ্ঠুর পরিণতি নেমে আসে।

যদি দেখ তোমরা নদী পার হতে পারছ না, আবার দাহিরও নদীর ওপারে জমায়েত হয়েছে, তা হলে তাকে এপার না ডেকে যে কোনভাবে তুমি ওপারে যাবে। খবরদার! কোন ময়দানেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। জান কবুল লড়াই করবে। এটাই খোদামস্ত মুজাহিদীনের লড়াইয়ের হালচিত্র।

নদীর সে দিক দিয়েই পার হবে যে দিকটায় তোমার বাহিনী নির্বিঘ্নে পার হতে পারে। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মত রণব্যূহ সাজাবে। পদাতিকদের সামনে ও দাঙ্গা বাহিনীকে মাঝে রাখবে।

–ইতি

তোমার চাচা হাজ্জাজ

মুহাম্মদ বিন কাসিম উপ-সেনাপতি ও গোয়েন্দা অফিসারদের ডেকে হাজ্জাজের পত্র দেখালেন। তাদেরকে সম্ভাব্য লড়াইয়ের কথা বললেন। উপ-সালারদের উদ্দেশে বললেন,

‘বন্ধুরা আমার! কসম খোদার। আমরা হাজ্জাজের জবাবদিহিতা কিংবা তাঁর সন্তুষ্টিতে লড়ছি না। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে আমাদের এ লড়াই। জবাবদিহিতা ও সন্তুষ্টি অর্জন তাঁর জন্যেই। তাঁর কাছেই।’

বিন কাসিম জানতেন, তাঁর উপ-সালারদের কিছু বলার জরুরত নেই। তারা সবাই ইস্পাত কঠিন। এ সেই জেহাদী প্রেরণার কারিশমা, যা তাদের হর রণাঙ্গনেই বিজয়ী করেছে।

॥ পাঁচ ॥

১৩ই মুহাররম ৯৩ হিজরী (৭১১-১২ খৃঃ)।

বিন কাসিমের বয়সও এ সময় আঠার।

তিনি কচ্ছের ঈশবিহারে পৌঁছান।

কেল্লাটি মজবুত। মুসলিম ফৌজ অবরোধ করে এটি। ওই কেল্লার স্বাধীন গভর্ণর বিশ্বনাথ। তিনি আশপাশের গ্রাম্য লোকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। তার এ বাহিনীতে বর্শা, তীর নেযাবাজও ছিল।

বিন কাসিম ঘোষণা করলেন, কেল্লা আমাদের দিয়ে দাও। তোমরা এতে নিরাপত্তা পাবে। পক্ষান্তরে আমরা কেল্লা দখল করে নিলে পরিণতি ভালো হবে না।

‘এসো না। দখল করে নাও পারলে।’ কেল্লার্বুজ থেকে আওয়াজ এলো।

কেল্লা প্রাচীরে তীরন্দাজের সারি। তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে ঠাট্টা-তামাশা করছিল। বিন কাসিম তীরন্দাজদের আগে বাড়তে বললে দু'পক্ষ থেকেই তীর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তীর মারতে মারতে মুজাহিদদের এক দল কেল্লা ফটকে গিয়ে উপনীত হলেন। এ সময় প্রাচীর থেকে তিনটি বর্ষা ছুটে এলো। তিন মুজাহিদ মারাত্মক যখমী হয়ে পিছু হটলেন। বার কয়েক প্রাচীরের কাছে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তাদের আশা, প্রাচীর পর্যন্ত যেতে পারলে সুড়ঙ্গ খোদাই করা যেত। দেয়ালে বিশ্বনাথের বিরাট এক বাহিনী মোতায়েন ছিল। ঐ বাহিনীর তীর বৃষ্টির দরুন প্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছানোই মুশকিল। মুসলমানদের কোন তীর-ই ব্যর্থ হচ্ছিল না। শত্রু সেনাদের কারো না কারো গায়ে তা লাগত–ই।

মুসলমানরা একাধারে সাত দিন এভাবে লড়াই চালিয়ে গেলেন। ওদিকে প্রাচীররক্ষীদের অসংখ্য সেপাই যখমী হয়। এরা ফৌজ নয়। গ্রাম থেকে ডেকে আনা। তাদের সাথীদের তীরাঘাতে যখমী হতে দেখে বাকীরা হিম্মৎহারা হয়ে গেল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার তাঁর শেষ ও চূড়ান্ত রণ কৌশল প্রয়োগ করলেন। তিনি কামানের হুংকার মারলেন তীব্রবেগে। প্রকান্ড পাথর বর্ষণ শুরু হোল। মাত্র দু'তিনটি কামান আনা হয়েছিল এই অভিযানে। প্রকান্ড পাথর বর্ষণের পাশাপাশি জানবায মুজাহিদবৃন্দ কেল্লা প্রাচীরে পৌঁছে গেলেন। এতে হিন্দু বাহিনীর হিম্মতে ভাটা পড়ে গেল।

যুদ্ধের অষ্টম দিনে কেল্লার ছাদে সাদা পতাকা ওড়ানো হয়। বিশ্বনাথ দরোজা খোলার হুকুম দেন এবং নিরাপত্তা কামনা করেন। বিন কাসিম তার এ আর্জি পুরো করে বার্ষিক খাজনা ধার্য করেন এবং এখানে এক নয়া হাকেম নিয়োগ করেন।

ঈশবিহারবাসীর মধ্যে হতাশা ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভয়ের কারণ, মুসলমানরা লুটতরাজ শুরু করতে পারে। নারীদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্ত আশংকার প্রতিফলন কোথাও ঘটেনি।

কচ্ছ অঞ্চলের আরেকটি কেল্লার নাম বীট। দেবলের দেশান্তরী গভর্ণর এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। বিন কাসিম এ কেল্লা ঘেরাও করলে জাবীন হাতিয়ার ফেলে দেয় এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কেল্লাও মুসলমানদের দখলে আসে।

॥ ছয় ॥

সুরথ দুর্গ তখনও রক্ষিত। এর হাকেম মুকু। মহাম্মদ বিন কাসিম মুকুর কাছে মিত্রতার পয়গাম দিয়ে শাবানকেই প্রেরণ করেন এবং কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেন। সাথে দেয়া হয় ২০ জন সওয়ার।

মুসলিম দূত এসেছে জেনে তিনি তৎক্ষণাত তাদের ডেকে পাঠান। এবার শাবান ছাকাফী ব্যবসায়ী ছদ্মাবরণে নয়। পোশাক-ই তাঁর পদমর্যাদার কথা বলে দিচ্ছিল। মুকু তাঁকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং ইজ্জত সম্মান করলেন। এক বাদশাহর দূতের মতই তাঁকে জমকালো সম্বর্ধনা জানানো হয়। মুকু বললেন, 'জানি তুমি কেন এসেছ।

আমি আমার অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ়পদ রয়েছি। শাবান বললেন,'তাহলে তো চুক্তি হতে দেরী হবার কথা নয়। আমাদের ইমাম মুহাম্মদ বিন কাসিম বলেছেন, তোমার রাজত্ব বহাল তবিয়তে থাকবে। তোমার ও তোমার প্রজাদের জিম্মাদারী আমাদের। আমাদের সালারের সাথে দেখা করার ইচ্ছা আছে কি? নাকি তিনিই আসবেন এবং তুমি কেল্লার দরোজা খুলে দিবে?'

সম্মানিত বন্ধু! তোমার অজানা নয় আমি অত্র এলাকার হাকেম ও খান্দানীভাবে রাজকুমার। আর আমাদের খান্দান যুদ্ধংদেহী। জনগণ আমাদেরকে নিরাপত্তার রক্ষা কবজ ঠাওরায়। তারা মনে করে, নিরাপত্তার রক্ষাকবজ কেবল যুদ্ধংদেহী বাহাদুর লোকদেরই মানায়। তোমাদের সালারের সাথে আমার সাক্ষাৎ করার অর্থ হলো, আমি আনুগত্য কবুল করিনি, কিন্তু পরাস্ত হয়েছি। প্রথম সাক্ষাতে তোমাকে বলেছিলাম, বাবা-ভাই আমার প্রাণঘাতী দুশমন। তবে সেটা পরস্পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামার পর্যায়ে যায়নি। তারা বলেন, আমি কুলাঙ্গার।

'কিন্তু তারা তো হাতিয়ার সমর্পণ করেছেন। তারা তো তোমার দ্বারস্থ হবারও সাহস রাখেন না।'

'ওই একটি মাত্র কারণেই তো আমি তোমাদের সালারের কাছে যেতে চাই না।'

'তার মানে তুমি কৃত অঙ্গীকার পালন করতে চাইছ না। তুমি আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে?'

'মোকাবেলা করব কি করব না- সে ভিন্ন কথা। মিত্রতা অবশ্যই করব, তবে তা ভিন্ন পদ্ধতিতে। আমার প্রতি অকৃত্রিম অনুগত প্রজাদের এই অনুভূতি কিছুতেই দিতে পারব না যে, কাপুরুষের মত আমি মুসলমানদের কাছে হাতিয়ার সমর্পণ করেছি।'

'তোমার কথা কেমন যেন গোলমেলে। বোধ হয় ধোঁকা দিতে চাচ্ছ আমাদের।'

'আরবী দোস্ত আমার! তোমাদের সালারের কাছে যাওয়ার যে পন্থা ঠিক করেছি , বলছি—শোন তা, ক'দিন পরে আমার এক বোনের শাদী হতে যাচ্ছে। এই শাদী সাকুরায় হবে। আমিও যাব। তোমাদেরকে দিনক্ষণ বলছি। স্থানও নির্ধারণ করে দিচ্ছি। তোমাদের এক হাজার লোক আমার ওপর হামলা করবে। আমাকে গ্রেফতার করে নেবে। আমার সাথে খুবই নগণ্য লোক থাকবে। তোমরা আমাকে গ্রেফতার করলে কাপুরুষতার ধিক্কার পোহাতে হবে না আমাকে।'

এই পরিকল্পনা শাবানের পছন্দ হলো। মুকু তাঁকে কাঁটাদার বৃক্ষলতাদি সংকীণ একটি এলাকার কথা বললেন।

শাবান সাকাফী বিস্তারিত জেনে চলে এলেন।

শাবান ছাকাফী কেল্লা থেকে বেরিয়ে যেতে মুকু তার কমান্ডারদের ডেকে পাঠালেন। বললেন,

'তোমরা হয়ত শুনেছ, সম্রাট বিশ্বনাথ মুসলমানদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। মুসলমানরা আমাকে আমার বাবার মত কাপুরুষ ঠাওরিয়েছে। দেখলে! এই মাত্র মুসলিম দূত আমার কাছ থেকে চলে গেল। তারা না লড়েই আনুগত্য স্বীকার করতে বলে গেল। আমি মুসলিম দূতকে তিরস্কার করে বের করে দিয়েছি।'

'তাকে জীবিত ফেরত দেয়া ঠিক হয়নি মহারাজ! ওর মাথা কেটে সালারের কাছে উপহার পাঠানোর প্রয়োজন ছিল।' জনৈক কমান্ডার বললেন।

'আমিও এমনটা ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা কূটনৈতিক নীতির লংঘণ, সর্বোপরি কাপুরুষতার লক্ষণ। কোন শক্তিমান কখনো একাকী লোককে হত্যা করে না। তারা দুশমনের মোকাবেলা করে থাকে। জনগণকে বলে দাও, আমি দুশমনের আনুগত্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। সকলকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে বলো। দু'দিন পর আমি বোনের বিবাহে যাচ্ছি। ওই বিয়েতে তোমাদের যাবার কথা। কিন্তু তোমাদের এখানে থাকা জরুরী। দুশমন আমার অনুপস্থিতিতে হামলা করে বসতে পারে। আমার অনুপস্থিতিতে হামলা হলে আমাকে তোমাদের মাঝে বিরাজমান মনে করে হামলা মোকাবেলা করো। দেখবে, দুশমন লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে।'

যা হোক, মুকু দেশবাসীকে উস্কে দিলেন। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে তিনি বিবাহ স্থগিত না রেখে কেন গেলেন তার জবাব ইতিহাস দিতে পারেনি। তবে শাবান ছাকাফীর হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়ার কৌশলই বুঝি ছিল এটা।'

শাবান সাকাফী মুকুর পরিকল্পনা সালারের কাছে পেশ করলেন। বিন কাসিম বললেন,

'ভেবে দেখেছ কি শাবান! হতে পারে তুমি এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে যাবে, আর শত্রু তার ঘাঁটিতে এর তিন গুণ নিয়ে ওঁৎ পেতে আছে। তারা আমাদের কুপোকাত করতে পারে।'

'ঝুঁকি নেয়া ছাড়া এ মুহূর্তে গতি নেই। আমার যা ধারণা, এ কাজ সে করবে না। তবে আমরা একটা কাজ করতে পারি, হাজার খানেকের পেছনে আরো শ'পাঁচেক সওয়ার। রাখতে পারি।

মুহাম্মদ বিন কাসিম শাবানের এ প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। তিনি যে ভয় করছিলেন অমূলক নয় সেটা। ধোঁকা প্রতারণাই হিন্দুদের চরিত্র ও অবলম্বন। বিন কাসিম হাড়ে হাড়ে সিন্ধুর মাটিতে এ তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এজন্য তিনি এক হাজারের পেছনে পাঁচশ' সওয়ার প্রেরণ করেন এবং দেড় মাইল দূরত্ব রেখে তারা এগিয়ে চলছিল।

শেষ পর্যন্ত এক হাজার ফৌজ নির্বাচন করে নাবাতাহ ইবনে হানযালাহকে কমান্ডার বানানো হলো। স্থানটি খুব একটা দূরে নয়। তবে বাহিনী সাধারণ রাস্তা ছেড়ে দুর্গম রাস্তা ধরে চলল। মুকুর নির্দেশিত স্থানে পৌঁছতে সকাল হয়ে গেল।

ওখানে একটি প্রশস্ত গিরিপথ নযরে পড়ল। ডানে বামে উঁচু টিলা। গভীর খাদ মাঝে মধ্যে নযরে পড়ে। কোথাও বালুকাময় প্রান্তর। ঘাঁটি বানানোর জন্য এই অঞ্চল খুবই যুৎসই।

পাঁচশ সওয়ারও এসে পৌঁছল। কিন্তু তাদের ওখান থেকে সরিয়ে দূরের এক উঁচু টিলায় ওঁৎ পেতে থাকতে বলা হলো। আরো নির্দেশ দেয়া হলো, বিপদ বুঝে ইশারা পেলে তারা যেন নেমে আসে।

॥ সাত ॥

গভীর রাত।

দূরে এক সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। নাবাতা ইবনে হানাযালাহ—যিনি গিরিপথের মাথায় দাঁড়িয়েছিলেন উঁচু টিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মুজাহিদদের প্রস্তুতি নিতে হুকুম করলেন। টিলাকে আড় করে পরবর্তী ঘটনা দেখার অপেক্ষায় রইলেন। সওয়ারের পেছনের লোকজন ফৌজি শৃঙ্খলায় এগিয়ে আসছিল।

ইবনে হানযালাহ গভীর দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কোথাও পদাতিক ফৌজ দেখলেন না।

এই কাফেলা মুকুর। তার সাথে শ'খানেকের মত সওয়ার। ইবনে হানযালাহ সংকেত দিলেন, তুফানের মত এক হাজার ফৌজ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এলো। মুহূর্তেই তারা মুকু বাহিনীকে ঘিরে নিল। ইবনে হানযালাহ বললেন—

'সকলে হাতিয়ার সমর্পণ করো। হাতিয়ার ফেলে ঘোড়া থেকে নেমে এসো। ঘোড়া দূরে রেখো।' তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন, 'তুমিই নিশ্চয় মুকু? তোমার লোকজন নিয়ে আমাদের সাথে লড়ে মরতে চাও কি?'

'কি বলতে চাও তোমরা?' মুকু প্রশ্ন করেন।

মুকুর সঙ্গীরা তখনো হাতিয়ার ফেলেনি।

'সবার আগে চাচ্ছি, তোমার লোকজন হাতিয়ার ফেলে ঘোড়া থেকে নেমে আসুক। আমাদের অস্ত্রে তোমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হোক—এই আশা থাকলে আর অস্ত্র সমর্পণের দরকার নেই।

'হাতিয়ার ফেলে দিলে আমাদের সাথে তোমরা কি আচরণ করবে?'

'এমনটা করলে তোমার লোকজনকে ছেড়ে দেয়া হবে। আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার লোকদের অকালে মারা যাওয়া থেকে উদ্ধার করবে। তোমরা দেখছ, আমরা গোটা পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছি।'

একথা দেহরক্ষীদের শোনার জন্য মুকু বলে যাচ্ছিলেন। স্রেফ মুকুই নাবাতাহকে চিনতেন। এটি একটি সাজানো নাটক মাত্র। সে নাটকের শেষ অংশ এভাবে মঞ্চায়িত হলো যে, মুকুকে মুজাহিদবৃন্দ গ্রেফতার করল এবং তাদের ভয়ে দেহরক্ষীরা হাতিয়ার ফেলে দিল। নাবাতাহ তাদের বন্দী করে নিয়ে চললেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মুকুকে সম্মানের সাথে পাশে বসালেন। বললেন, 'আপনি কি সহজভাবে আনুগত্য কবুল করতে পারতেন না? এই সাজানো নাটকের দরকার ছিল কি?'

মুকু বললেন, 'বোঝার চেষ্টা করুন আরবী দোস্ত! রাজা দাহির আমাদের প্রিয় লোক এবং প্রভুও। সিন্ধুর জমীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের। আমরা জানি, রাজা দাহিরের রাজত্ব টিকে থাকলে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। দাহির আমাদের প্রতি যে কৃপা বর্ষণ করেছেন, এর বদলা এই নয় যে, আমরা দুশমনের সাথে এমনিতেই মিশে যাব। কিন্তু যখন আমরা দুশমনকে পরাভূত করতে পারছি না

কিছুতেই, তখন ফৌজের পতন ও জনতার সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ দেয়া বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ নয়। তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'নতুন পরিস্থিতি থেকে ফায়দা উঠানোই এক্ষণের দাবী।'

এভাবে মুকু বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করলেন। ইতিহাস সাক্ষী, মুকুকে তিনি পাশে বসিয়েছিলেন এবং এক লাখ দেরহাম উপহার দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর কেল্লায় গেলে সর্দার ও অভিজাতগণকে দামী দামী তাজাদম ঘোড়া উপহার দেন। এছাড়া বীট ও সুরথের গভর্ণরীও তাকে দেয়া হয়। এও বলেন, মুকুর বংশধরও আজীবন এদেশ শাসন করতে থাকবে। বিন কাসিম তার কাছ স্রেফ এতটুকু দাবী করলেন যেন তাকে সিন্ধুনদ পাড়ি দেবার মত প্রয়োজনীয় নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। কেননা বিশাল মুজাহিদ বাহিনীর নৌকা যোগাড় চাট্টিখানি কথা নয়।

॥ আট ॥

রাজধানী আরোড়।

দাহিরের মহলের ভেতরে বাইরে তখন ভূতুড়ে অবস্থা।

গলার আওয়াজ শোনা গেলে কেবল দাহিরেরটাই শোনা যেত। তার কণ্ঠস্বরে যেন প্রতিশোধ আর আগুনের শোঁ শোঁ আওয়াজ।

প্রতিশোধের তীব্রতা তার হবে না কেন! এ মাত্র খবর এসেছে, বিশ্বনাথ ও তদীয় পুত্র রাসেল এবং মুকু মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করেছে। খবরটা তার কানে এনেছেন সাবেক দেবল গভর্নর জাবীন। দাহির তাকে বললেন—

'প্রথমে তুমি দেবল ছেড়ে পলায়ন করেছিলে এবার ওখান থেকেও, কিন্তু বুযদিল ইনসান! তোমার প্রাণের এত মায়া?'

'মহারাজ! মন্দিরের ঝান্ডা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর শহরবাসী ও ফৌজের মধ্যে মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। তারা আমার অনুমতি ব্যতিরেকে প্রধান ফটক খুলে দিয়েছিল। এ সময় মুসলিম বাহিনী পঙ্গপালের মত শহরে প্রবেশ করে। পরাজয় না হয়ে উপায় আছে কি। এদিকে বিশ্বনাথ ও রাসেল মুকুর বিরোধী হয়ে যায়। মুক বেশ পূর্ব হতেই মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করছিল। ওরা পিতা-পুত্রে যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব, তখন সেখানে আমার কিইবা করার ছিল।' জাবীন বলল।

'তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে আমার কোন লাভ নেই। অবশ্য তোমাকে শেষ একটা সুযোগ দিতে চাই।'

'এটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম মহারাজ! কিন্তু আমার বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য দেখতে চাইলে কেল্লাবন্দী হয়ে লড়তে নির্দেশ দিবেন না। আমি লড়াকু সৈনিক।'

'এবার আমরা সম্মুখ সমরেই নামব। আমার সমস্ত চিন্তাধারা ভন্ডুল হয়ে গেছে। আমার চিন্তা ছিল, কেল্লাবন্দী ফৌজ ও গভর্ণরদের আরব বাহিনী কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না এবং বিন কাসিমের ফৌজি কুওৎ আস্তে আস্তে লয়প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সবাই

আমাকে লজ্জায় ফেলল। মুসলমানদের শক্তি কমার স্থলে প্রতিদিন বেড়েই চলল। আমার বুযদিল গভর্ণররা দুশমনের বাহুকেই অধিক শক্তিশালী করেছেন।'

'মহারাজের জয় হোক। আত্মরক্ষামূলক সমস্ত হামলা পরিকল্পনা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। মুসলমানরা হয়ত ধরেই নিয়েছে আমরা কেল্লার বাইরে লড়াই করতে জানি না।'

'মুসলমানদের আমি সিন্ধু নদে চুবিয়ে মারব। আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও। ময়দানে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নাও। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। অর্ধেক রাজ্য দুশমনের হাতে তুলে দিয়ে এখন পরামর্শ কপচাতে এসেছো। আবার বলছ, মহারাজের জয় হোক।'

আবার সেই নিস্তব্ধতা। মাঝে মধ্যে উন্মাদের মত দাহির গর্জে ওঠত। তবে সেই গর্জন কিছুক্ষণের মধ্যেই লীন হয়ে যেত। তার ভৃত্য বারবার কাউকে না কাউকে ডাকতে ডাকতে দিশেহারা হয়ে পড়ছিল।

দাহির হুকুম দিলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে সব সৈন্যদের সমবেত করা হয়েছে সকলকে কোচ করতে। গোটা শহরের হুলস্থূল পড়ে গেল। তিনি যুদ্ধ ছাড়া কোন আলোচনাই আর কারো সাথে করেন না।

॥ নয় ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিমও জানতেন, এবার তাঁর চূড়ান্ত লড়াই দাহিরের সাথে হবে। হাজ্জাজ বলেছিলেন, এবার আর কেল্লা দখল নয়। দাহিরকে বধ করতে হবে। দাহিরকে পরাজিত করতে পারলে হিন্দুস্থানে তোমার আর কোন বাধা থাকবে না। মুহাম্মদ বিন কাসিম মুকুর কাছে স্রেফ সিন্ধু পারাপারের খেয়াযান তলব করেছিলেন। তাঁর এখনকার ভাবনা সিন্ধু নদের খরস্রোত, যা পাড়ি দিতে হবে তাঁকে।

বিন কাসিম নিরূনে ফিরে এলেন। শাবান সাকাফী অন্যান্য সালারদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'সম্মুখ সমরে নামার সময় এসে গেছে। দাহির এবার প্রতিপক্ষ। আপনাদের সকলকে পরামর্শের জন্য ডেকেছি। আচ্ছা, দাহিরের কাছে আনুগত্যের পয়গাম পৌঁছালে কেমন হয়? যদি সে লড়াই করতে চায় তাহলে জানতে চাইব, সে কি সিন্ধু নদ পাড়ি দেবে, না আমরা? তারা প্রথমটায় মত দিলে আমাদের কেউই ওদের ওপর তীর মারবে না। দরিয়া পার হয়ে আসার পরই দেখে নেব অপদার্থটার ঘাড়ে মাথা ক'টা? পক্ষান্তরে আমাদেরকে দরিয়া পার হবার আমন্ত্রণ জানালেও সে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না।'

সকলে বিষয়টি আগাগোড়া ভেবে নিলেন। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, দূত পাঠানো হবে।

বৈঠক তখনও মুলতবী হয়নি। এমতাবস্থায় খবর এলো, এক লোক সাক্ষাতপ্রার্থী। তাকে ভেতরে ডাকা হোল। ইনি শাবান ছাকাফীর প্রেরিত চর। চর মারফত জানা গেল, রাজা দাহির আরোড়ের বাইরে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ

করেছেন। তবে এরা কোথায় খীমা গেড়েছে তা এখনও জানা যায়নি। অবশ্য এতটুকু বোঝা গেছে, দাহির প্রতিশোধ নিতে উন্মাদ বনে গেছেন।

বিন কাসিম তাঁর থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট নিলেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক দু'জনকে দূত নিয়োগ দেয়া হলো। তন্মধ্যে একজন মাওলানা ইসলামী। ইতিহাসে তাঁর পুরো নাম নেই। তিনি দেবলের হিন্দু বাসিন্দা ছিলেন। বিন কাসিমের হাতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ। দেবলের হাজারো লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার সুযোগ হয়েছে কেবল তাঁর-ই। ইসলামের প্রতি তাঁর এ অগাধ টান দেখে মুহতারাম সালার তাঁর নাম রাখেন 'ইসলামী'। অপর দূতের নাম শামী। ইতিহাস স্রেফ এতটুকু আমাদের জানিয়েছে। তিনিও আলেম ও বিজ্ঞ ছিলেন।

বিন কাসিম তাঁদেরকে দাহিরের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণের পূর্বে সব কথা বুঝিয়ে দেন। মাওলানা শামী বলেন, 'আমরা বুঝেছি ইবনে কাসিম! আমরা স্রেফ আপনার নয়, ইসলামী খেলাফতের মুখপাত্র হিসাবে যাচ্ছি।'

॥ দশ ॥

এই কাফেলা আরোড়ে উপনীত হলো। দাহির অবগত হয়ে তাদের ডেকে পাঠালেন। দূতগণ তাঁদের দেহরক্ষীসহ রাজমহলে প্রবেশ করলেন। দরবারের দু'পাশে এঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। সকলের হাতে বর্শা। বর্শারফলক বাহারী লণ্ঠনে চকচক করছে।

উভয় দূত মস্তক উত্থিত ও সিনা টান করে দাঁড়ানো। দরবারে এলেন দাহির। দোভাষীর দরকার নেই। কেননা মাওলানা ইসলামী সিন্ধুর-ই লোক।

'তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক।' মাওলানা ইসলামী বললেন। দাহির তাঁদের দিকে বড় চোখ করে তাকাচ্ছিলেন। তার মাথা চড়কগাছ। তিনি রুক্ষ স্বরে বললেন,

'তোমরা কি শাহী কানুন জানো না? কেউ কি তোমাদের বলেনি যে, তোমরা এক প্রভাবশালী রাজদরবারে প্রবেশ করছ?

'এটা মহারাজার দরবার! সিন্ধুর মহারাজা। যার ভয়ে পাহাড় কাঁপে।' দরবারীদের কেউ বলল। মাওলানা ইসলামী তাঁর সাথীকে বোঝালেন। তাঁকে তিনি বললেন, তুমি তো জানো তাঁকে কি জবাব দিতে হবে। মাথা উঁচু রেখেই কথা বলবে।'

'আমরা স্রেফ খোদার দরবারের কানুন জানি। কোন মানুষের সামনে মাথা নোয়ানোর সবক ইসলাম দেয় না।'

'শুনেছি তুমি দেবলবাসী। আমাদের-ই নওকর ছিলে। আমাদের-ই উচ্ছিষ্ট চেটেপুটে খেয়েছো। ভালো করেই জানো এ দরবারের রীতি শুধু মাথা নোয়ানো নয়, সেজদা করতে হয় এখানে। দরবারে এসে তোমার আদব রক্ষার দরকার ছিল।'

'যখন আপনার আনুগত্য করতাম তখন ঝুকিয়েছি নিঃসন্দেহে। এক্ষণে আমি মুসলমান। সিজদার যোগ্য কেবল আল্লাহ পাক-ই। আপনি আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা। আপনাকে সে পথের পথিক করতে চাই যে পথ সত্য, সুন্দর ও মনোরম।'

'ভাগ্যিস তুমি দূত হয়ে এসেছ। নইলে তোমাদের দু'জনকেই হত্যা করতাম। তারপর বুঝতে সেজদা করতে হয় কি-না।'

মাওলানা ইসলামী শামীকে দাহিরের কথা বুঝালেন। তিনি বললেন, তাঁকে বলো, আমাদের দু'জনকে হত্যা করলে আরব বাহিনীর কিছু যায় আসে না। কিন্তু এর বদলায় তোমাদের এমন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে যার কল্পনাও তুমি করতে পার না। আমাদের প্রতি ফোঁটা খুনের বদলায় তোমাদের এক একজন জ্যান্ত মানুষকে পুঁতে ফেলা হবে।'

মাওলানা ইসলামী দাহিরকে একথা সিন্ধীভাষায় শোনালেন। দাহির কেঁপে এক পা পিছু হটলেন। মনে হলো তিনি শক্ পেয়েছেন। গোসসায় চেহারা লাল। দরবারে পিনপতন নিস্তব্ধতা। দরবারীরা ভাবছে, এই বুঝি বেটাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ যবান রুদ্ধ করার হুকুম দেবেন।

'আমাদের সহ্যাতীত গা-জ্বালা করা কথা তোমরা আওড়েছো। বলো, কি পয়গাম নিয়ে এসেছো। জলদি।'

'সেই রাজার দরবারও আমাদের জন্য সহ্যাতীত যে এক বীর সালারের দূত মহোদয়গণকে বসার আমন্ত্রণটুকু পর্যন্ত জানাতে জানে না। আমরা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছি। তুমি আল্লাহর পয়গামে সাড়া দেবে কি? ইসলাম সেই পয়গামের নাম।' শামী। বললেন।

'না!' গর্জে ওঠলেন দাহির। বললেন, 'অন্য কোন কথা থাকলে বলো। আমার বাহিনীর মুখোমুখি হলে তোমরা আল্লাহর পয়গাম ভুলে যাবে।'

'কথা হলো, আমাদের মহান সালার বলেছেন, তুমি সিন্ধু নদ পাড়ি দেবে, না আমরা? তবে নদী যে-ই পার হোক না কেন, নির্বিঘ্নে পার হতে দিতে হবে। দরিয়া পারাপারকালীন আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করব না, তোমরাও করবে না।'

দাহির বললেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় লাগবে।' বলে রাজা দাহির ওপাশের কামরায় চলে গেলেন। তার অন্যতম উজীর সাকুরা বললো, 'মহারাজ! কথা পরিষ্কার। মুসলমানদেরকে এদিকে আসতে বলুন। কেননা এতে আমাদের লাভ। ওরা পালাতে পারবে না। পেছনে খরস্রোতা সিন্ধু আর সামনে আমরা। আমাদের রসদ নিয়েও খুব একটা ভাবাভাবির দরকার পড়বে না।

দাহির আবারো দরবারে এলেন। বললেন, 'তোমাদের সালারকে বলো, সিন্ধু পাড়ি দিয়ে সে-ই এপার আসুক। তাকে বলো, এপারে এলে সে আর জীবিত ফেরত যাবে না এবং তার কোন শর্তই আমরা মঞ্জুর করিনি। যাদের ধর্ম সাচ্চা তারাই আসন যুদ্ধে জয়লাভ করবে। আমরা তোমাদের নির্বিঘ্নে নদী পার হতে দেব। পারাপারকালীন কেউ তোমাদের ওপর হাত ওঠাবে না। আমরা নামছি চূড়ান্ত লড়াইয়ে।'

মাওলানা ইসলামী ও শামী নিরূন এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে তাঁদের মত বিনিময়ের কথা জানালেন। বিন কাসিম বললেন, শোকর খোদার! আমরা এটাই চাচ্ছিলাম।

মুসলিম দূত চলে যাবার পর পরই রাজা দাহির বিদ্রোহী আরব সর্দার হারেস আলাফীকে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে ডেকে দূতের সাথে হওয়া সব কথা তুলে ধরেন। বলেন,

'তোমাকে এজন্য ডেকেছি যে, তুমিও এক আরব। স্বদেশীদের লড়াই কৌশল জানো। আমি ওদের অভ্যাস জানতে চাই।'

'আমার মতামত হচ্ছে, আপনার উজীরের মতামত সঠিক নয়। প্রথম কথা হলো, বিন কাসিমের দলে অভিজ্ঞ সালার রয়েছেন বেশ ক'জন। আর তাঁর সেপাইরা অধিকাংশ পরস্পর আত্মীয় এবং তারা জীবন দিতে ক্ষিপ্র। বিনা উদ্দেশে মুসলমানরা লড়াই করে না। তারা জং-কে জেহাদ বলে। ধর্ম বিকাশের উদ্দেশেই তাদের লড়াই। তাদের জেহাদ পিছু হটার তরে নয়– সামনে অগ্রসর হবার তরে। রণাঙ্গনে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হলে জীবন হাতে নিয়ে ওরা তা অপসারণ করে।' বললেন আলাফী।

'আমি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। তোমার আরব ভায়েরা নদী পেছনে রেখে কি করে যুদ্ধ করবে? তাদের রসদের ব্যবস্থাপনাই বা কিরূপে হবে? ওরা এপারে এলে আমরা তাদের রসদবাহী নৌকা আটকে দেব।'

'মুসলমানদেরকে এভাবে আপনি রসদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি এই ফরমান জারি করতে পারেন, যারা কোন প্রকার খাদ্য শস্য ওদের যোগান দিতে গিয়ে ধরা পড়বে তাদের হত্যা করা হবে। এভাবে মুসলমানদের পেরেশান করতে পারেন। দরিয়া পার হয়ে এপার এসে যুদ্ধ করায় ওদের তেমন কোন শক্তি-ফারাক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা নেই।'

রাজা দাহির মুসলমানদের নদী পার হবার সুযোগ দেয়ার পক্ষে অটল রইলেন।

॥ এগার ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দাহিরের দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন তখনই দ্রুতগামী এক সওয়ারকে বসরায় পাঠিয়েছিলেন পত্র দিয়ে। তিনি ওই পত্রে হাজ্জাজকে জানান, তিন জন রাজা ও গভর্ণর আমাদের আনুগত্য স্বীকার করেছে। এক্ষণে আমরা পশ্চিম সিন্ধু উপকূল ধরে রাজধানী আরোড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পথিমধ্যে কোথাও আপনার উত্তর পাওয়ার আশা রাখছি।

নিরূন থেকে কামান ও সৈনিকদের স্ত্রী-সন্তানগণ নৌকা করে যাচ্ছিল। বাকী ফৌজ নদীর তীর ঘেঁষে চলছিল। রসদ সামগ্রী উট ও বলদ গাড়ীতে। এই বাহিনী কুফর-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে চলছিল।

ওদিকে রাজা দাহিরের তখন নিদ্রা হারাম। তিনি যুদ্ধংদেহী। ভীত নন। তার মনে কোন দ্বিধা নেই। তার শাসন খুবই স্বচ্ছ। তিনি তার বাহিনীকে পরিষ্কার জানালেন, ইসলাম এখান থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

তিনি মন্দিরের পন্ডিত পুরোহিতদের হুকুম দিলেন ওখানে অনবরতঃ ঘন্টা, কাঁসা ও শঙ্খধ্বনি চালাতে। পূজা অর্চনায় লিপ্ত থাকতে। জনগণকে অধিকাংশ সময় মন্দিরে কাটাতে এবং বেশী হারে নজরানা দিতে বললেন। জনগণের মনে ইসলাম

বিদ্বেষী ভাব ছড়াতে তিনি যাচ্ছেতাই বলে তাদের খুনে বিদ্বেষের আগুন ধরালেন। বললেন, মুসলমান বড় হিংস্র ও জালিম প্রকৃতির। তিনি নারী জাতিকে বিশেষ কথায় প্রভাবিত করলেন। ইজ্জত বাঁচাতে তারা যেন পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে। রাজধানীর খোলা ময়দানে মায়ারাণী যুবতী ও মাঝ বয়সী নারীদের তেগ, তলোয়ার, তীর ও বর্শা নিক্ষেপের ট্রেনিং দিতে থাকেন।

গোটা আরোড়ে যুদ্ধ সাজ। যুবকরা ফৌজে ভর্তি হতে এলো। নয়া ফৌজদের ট্রেনিং হতে লাগল। রাজা দূর-দরাজে প্রচারণা চালালেন। জনগণের মাঝে পুরোদমে ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বিশেষ করে যাদের ঘরে যুবতী নারী কিংবা সম্পদ ছিল।

বিন কাসিমের বাহিনী এগিয়ে চলছিল।

মুজাহিদবৃন্দ আরোড় সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। আরোড় (বর্তমানে রোহরী) সিন্ধ নদ থেকে ২০/২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বিন কাসিম আরোড়ের রাজমহল থেকে বেশ দূরে তাঁবু ফেললেন এবং ওখানে হাজ্জাজের পত্রের ইন্তেযার করতে লাগলেন। পরদিন দূত এসে গেল। তিনি নির্দেশনা তো দিলেনই, কিন্তু প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ ভরসা করতে বললেন, তার পত্রটি নিম্নরূপ–

'পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শয়নে-স্বপনে দোয়া করি, খোদা তোমায় কাফেরের মোকাবিলায় জয়ী করুন। তোমাদের দুশমনের নাক ধুলি ধূসরিত হোক। তাকদীর ফলকে যা লেখা আছে তা হবেই। আল্লাহর দরগাহে দোয়া করে বলি, মাবুদ! তুমি এমএই এক বাদশাহ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সম্ভব যে কোন উপায়ে নদী পার হও। আল্লাহর মদদ কামনা কর। দেখবে বদরী, হুনায়নী মদদ সিন্ধুতে নামছে।

দুশমন পলায়ন করলে তার মাল-সম্পদ কব্জা কর। ভান্ডার লুফে নাও। কিন্ত ধোঁকা প্রতারণা থেকে বাঁচার কোশেশ করো। দুশমনকে ইসলামের দাওয়াত দাও। বিধর্মীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তালীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা কর। এমনটা করতে পারলে দেখবে, দুশমন তোমার রাহায় বাধ সাধতে পারছে না।'

–ইতি
হাজ্জাজ

তিনি বিন কাসিমকে সর্বদা আয়াতুল কুরসী পড়তে বলেন। সৈনিকদেরও এ দোয়া উচ্চারণে তাকিদ করতে বলেন। হাজ্জাজের পক্ষে এই পত্র লেখক ছিলেন। হিমরান ইবনে আইয়ান।

এই হিমরান এক যুদ্ধে খালেদের হাতে বন্দী হন। খালেদ তাকে মদীনায় নিয়ে এলে দেখা গেল তাঁর খুব মেধা। তাঁকে বিদ্যাপীঠে ভর্তি করে দেয়া হলো। এ সময় তিনি কেতাবাত রপ্ত করেন। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) তাঁকে সহকারী বানান এবং রাষ্ট্রীয় সিলমোহরও তাঁর কাছে জমা রাখেন। হযরত ওসমান পরবর্তীতে তাঁকে বসরার গভর্ণর বানান। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে খুব সমীহ করতেন। তিনি খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। হাজ্জাজ যদিও ভিন্ন ধাতুর, তবুও তাঁর প্রতি খুব দুর্বল ছিলেন। একবার হাজ্জাজ যে কোন কারণে তাঁর প্রতি ক্ষেপে যান এবং তাঁর সহায় সম্পত্তি বাতিলের জন্য খলীফার কাছে দরখাস্ত করেন। খলীফা হাজ্জাজকে উল্টা শাসালেন।

বললেন, হিমরানের প্রতি শত্রু মনোভাবপন্ন হয়ো না। সে স্পষ্টবাদীমাত্র। শেষ পর্যন্ত হাজ্জাজ তাঁকে নিজ মুন্সী বানান।

ওই পত্রে হাজ্জাজ নদী পারাপারে সতর্কতা রক্ষায় বলেন, নৌকার মাঝি যেহেতু স্থানীয় লোকজন হবে; সুতরাং তাদের ভালো করে চিনে নির্বাচিত করো। ওদের পুরস্কার দিও। যে স্থান দিয়েই সিন্ধু নদ পাড়ি দাও সেখানকার ঘাঁটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো। এ লড়াইয়ের একটা উপকার এই যে, তোমাদের পেছনে নদী থাকায় দুশমন পেছন দিক দিয়ে হামলা চালাতে পারবে না।'

॥ বার ॥

পত্র পাওয়া মাত্রই বিন কাসিম সিন্ধু নদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কোন্ স্থান দিয়ে পার হওয়া যায়। উদ্দেশ্য ছিল সেটাই। উপ-সালারগণও তাঁর সাথে। দু'এক জন উপ-সালার বললেন, রাজা বিশ্বনাথ আমাদের অনুগত। তাকে ডাকা হোক। তিনি বলতে পারবেন, কোন্ স্থানটিতে শত্রুর ঘাঁটি নেই। এদের পরামর্শমত বিন কাসিম লোক মারফত বিশ্বনাথকে ডেকে পাঠালেন।

বিশ্বনাথ ওই সময় বীট কেল্লায় ছিলেন। তার শহর থেকে যা বেশ দূরে। স্থানটি নদীর ওপারে, বিন কাসিমের লোক নদী পার হওয়ার সময় দু'লোক তাকে গ্রেফতার করে। তার কাছে পরিচয় ও গন্তব্য জানতে চায়। লোকটা মূল পরিচয় ও গন্তব্য গোপন করে কিন্তু তাকে মুসলিম শিবিরের দিক থেকে আসতে দেখায় সরাসরি তাকে আরোড় নিয়ে যায়। ওখানে তার কাছ থেকে ওরা সঠিক পরিচয় ও গন্তব্য আবিষ্কার করে।

রাজা দাহির তার পুত্র জয় সিংহকে বিশ্বনাথের এলাকাবর্তী সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, বিশ্বনাথ, রাসেল ও মুকু কিছুতেই যেন বিন কাসিমকে নদী পারাপারে সাহায্য করতে না পারে।

দাহির জানতে পারেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম আরোড় সীমান্তে পা দিয়েছে। খুব সম্ভব সিন্ধু নদের ওপারেই অবস্থান নিয়েছে। তিনি তৎক্ষণাত হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে ওই এলাকায় যান। গিয়ে পৌঁছেন নদী তীরে। যেখান থেকে মুজাহিদ বাহিনীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

ওই সময় বিন কাসিম একেবারে নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন।

'রাজা দাহির এসে গেছে।' জনৈক মাঝি চিৎকার দিয়ে বললো, ওই যে হস্তিপৃষ্ঠে। সকলেই আচমকা সেদিকে তাকাল। একটি হাতিপৃষ্ঠে চমকদার রেশমী কাপড় ঝকমক করছিল। শাহী হাওদায় তিনি বসা। আশেপাশে সকলকে শাহী খান্দানের মনে হচ্ছিল।

শামী চিৎকার দিয়ে বরলেন, 'ওই বেটা দাহিরই আমাদের জাহাজ লুণ্ঠন করেছিল। আমার মা ও এক বোন সেই জাহাজে ছিলেন। সে তাদেরও কয়েদ করেছিল।' বলে তিনি ঘোড়ায় পদাঘাত করলেন। গিয়ে পৌঁছুলেন নদীর কিনারে। কিন্তু পানির সামনে গিয়ে ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। সকলে মনে করল, দাহিরকে দেখে শামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিন কাসিম বললেন, 'তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

দু'সওয়ার শামীকে ধরতে গেলেন। ওদিকে শামীর ঘোড়া পানিতে নামার স্থলে পিছু হটছিল। শামী ধনুকে তীর সংযোজন করে দাহিরকে টার্গেট করতে যাবেন– ঠিক ওই মুহূর্তে দাহির ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে দেহরক্ষীর হাত থেকে ধনুক নিয়ে তীর ছুঁড়লেন। তীরটি শামীর কন্ঠনালীতে গেঁথে গেল। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লেন। ঘোড় সওয়ার এসে তাকে উদ্ধার করতে করতে তিনি শাহাদাতের দরজায় পৌঁছে গেলেন।

দাহির হত্যার দায়িত্ব সাথীদের কাছে সোপর্দ করে তিনি জান্নাতে চলে গেলেন।

দাহিরের এটা কি কোন চালবাজির অন্তর্ভুক্ত, নাকি তিনি সৈন্য পুরোপুরি সংগ্রহ করতে পারেননি যে, বিনা সৈন্যেই সিন্ধু নদের তীরে এলেন। বোধহয় তিনি হামলার স্থল ও পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছিলেন। এই ছাউনিতে বিন কাসিম প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। এ সময়কালে তিনি যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

মুসলিম বাহিনীর ঘোড়ার খাদ্যের জন্য শুষ্ক খড়কুটোর পর্যাপ্ত মজুদ ছিল। জনৈক উপ-সেনাধ্যক্ষ তাঁকে পরামর্শ দিলেন, অত্র এলাকায় বেশ সবুজ ঘাস আছে। মজুদ খড়কুটো সাশ্রয় করতে ওগুলো খাওয়ানো যেতে পারে।

সালারে মুহতারাম তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতির-ই বা দরকার কি! যেখানে সবুজ ঘাস থাকে সেখানে তারা ঘোড়াকে তাজা ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকতেন। কিন্তু দু'তিন দিন পর সকলের টনক নড়ল। সকলের ঘোড়া যেন কেমন ঝিমুচ্ছে। বেশ কিছু ঘোড়া ভূলতলশায়ী। এক রাতেই বেশ কিছু ঘোড়া মারা গেল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘাবড়ানোর মত সালার নন। তাঁর যৌবনদৃপ্ত চেহারায় এ ব্যাপারটি তেমন কোন দাগ কাটতে পারল না। তিনি বললেন, সওয়াররা কি পদাতিক হামলা করতে পারবে না? আমি এখান থেকে পিছু হটতে চাই না। আমাদের ঘোড়ার মড়ক লাগছে জানলে রাজা দাহির হামলা করে বসবে। সওয়ারদের বলো, তোমাদের পদাতিক যুদ্ধ করতে হবে।'

'না ইবনে কাসিম!' জনৈক বৃদ্ধ উপ-সেনাধ্যক্ষ বললেন, 'তুমি কি জানো না, দাহির ময়দানে হাতি নিয়ে নামবে? আমাদের সওয়াররা পদাতিক হামলা করতে অস্বীকৃতি জানাবে না ঠিকই, কিন্তু একটু ভেবে দেখ কাসিম পুত্র! আমরা কি পদাতিক হাতি ও দুশমনের ঘোড়ার সামনে টিকতে পারব? না। তোমার বাহিনীকে আত্মহত্যার পথে ডেকো না। একবার আমরা পরাস্ত হলে এর ধকল কাটিয়ে ওঠতে পারবো না। ভাবতে থাকো। কোন রাস্তা বেরিয়ে আসবে।

'কিন্তু আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে জানি না।'

মুহাম্মদ বিন কাসিম সেজদায় লুটে পড়লেন। পুরো রাত আয়াতুল কুরসী পড়ে কাটালেন। চোখে দেখা দিল আঁসু। আল্লাহর কাছে তিনি মদদ চাইলেন। দুশমন জেনে গেছে তাদের নদী পারাপারের স্থান।

সকাল বেলা সিন্ধুর ওপার থেকে একটি নৌকা আসতে দেখা গেল। এর যাত্রী শাহী খান্দানের সওয়ারের মত দেখতে। নৌকারোহী দাহিরের ফৌজ অফিসার। সে

মুসলিম শিবিরে এলো। রাজা দাহিরের দূত বলে পরিচয় দিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে সে দেখা করতে চায়।

বিন কাসিমের ছাউনিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ইসলামী ইতিহাসের কম বয়স্ক সালার তখন জায়নামাযে মোনাজাতরত। তিনি মোনাজাত শেষ করে দূতের সাথে মত বিনিময়ে বসলেন। বললেন, 'রাজা দাহির আমার জন্য কোন সংবাদ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ সালারে আরব! দাহির বলেছেন, আপনি আমাদের জন্য এবং আপনার নিজের জন্য বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছেন। নিজের অবস্থাটাই দেখুন। এখানে এসে শোনলাম আপনার ঘোড়াগুলোর মড়ক লেগেছে। ঘোড়া ছাড়া আপনি কি করে যুদ্ধ করবেন। যে অভিপ্রায়ে আপনার আগমন শেষ পর্যন্ত সেটা দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ে পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই আমরা এই শর্তের ওপর সন্ধি করতে রাজি যে, আপনি এখান থেকেই ফিরে যাবেন। আমরা আপনার পুরো বাহিনীকে রসদ সামগ্রী যোগান দেব যাতে আপনার কোন ফৌজ না খেয়ে মারা না যায়। আর যেহেতু আপনার বাহিনীতে এমন কোন বাহাদুর নেই যে, আমার ফৌজের মোকাবিলা করে। তাই আপনাকে চিন্তার মওকা দিলাম। যদি ধ্বংস হতে না চান তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরী হোন।' বললেন দূত।

রাজা দাহির এই পয়গাম দ্বারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভেতরটা টোকা মেরে দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতে বিন কাসিম না বিচলিত হলেন, না হলেন হতাশ। তিনি বললেন,

'তোমাদের রাজাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলো, আমি সেই ধরনের সালার নই, যারা সামান্য মসিবতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আপনি আমার আনুগত্য কবুল করেননি। এ এক ধরনের দর্প, যা আমি অচিরেই চূর্ণ করব। যদি সন্ধি করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনার সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় সমস্ত সম্পদাদি আমাদের খেলাফতে দিয়ে দিন এবং খেলাফতে ইসলামিয়ার আনুগত্য স্বীকার করুন। এতে সম্মতি না জানালে জেনে নিন— আপনার মোকাবিলায় এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনই ভালবাসে যেমন ভালবাস আপনি মদ ও নারীকে। আমি ফিরে যাব। তবে খালি হাতে নয়, যাব তোমার মাথা নিয়েই।'

দূত ফিরে যাবার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম বিস্তারিত লেখে জনৈক সওয়ারকে হাজ্জাজের কাছে পাঠালেন। বললেন, বিদ্যুৎ বেগে যাবে বিদ্যুৎ বেগে ফিরবে।

বিন কাসিম দাহিরের দেহে এসিড নিক্ষেপ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুমূর্ষু ঘোড়াগুলোর দিকে তাকালে তাঁর হাত আসমানে উঠে যেত।

দাহির তুমি কৈ!

॥ এক ॥

শুধু ঘোড়ার মড়ক নয়, আরেকটি মহা মসিবতের খবর তাঁর কানে এলো। শীষম আবার দুশমনের কব্জায় চলে গেছে বলে তিনি সংবাদ পেলেন।

শীষমে খুব শান্তি নিরাপত্তা বজায় ছিল। অর্থনেতিক দৃষ্টিকোণে শীষম বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয়েছিল।

একদিন জটাজুটধারী জনৈক হিন্দু ঋষি কেল্লায় প্রবেশ করল। হাতে তার ত্রিশূল। মাথায় তিনটা টিকি। সাথে পাঁচ'ছ জন চেলা। চেলারাও ওস্তাদের মত ঋষি।

এরা ধর্মীয় মুখপাত্র বলে কেল্লা ফটকে চেক করা হয়নি। শহরে প্রবেশ করেই সে ত্রিশূল উঁচিয়ে বলল, 'শহরের চেহারা পাল্টে যাবে। যমীন বদলে যাবে। বদলে যাবে আসমানও। আমি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। মুসলমান রহমদিল বাদশাহ।'

শীযমের রহস্যজনক রাত। কেল্লার দরোজা রুদ্ধ। সান্ত্রীরা নিশ্চিন্তে বুরুজে ঝিমুচ্ছে। তাদের মনে তেমন কোন ভীতি নেই, সিস্তানও মুসলিম দখলে। বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। তাদের সর্দার বাজী রায় নিহত হয়েছে।

শহরে নিস্তব্ধতা। জনগণ নিজ নিজ বাড়ীতে সুপ্ত, অবচেতন। এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই একটি তুফান আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠছিল। সেই তুফান শীষমের খামোশ রজনীর তিমিরে মারাত্মক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করছিল। ওটা ফুঁসে ওঠছে কিন্তু বিরান করতে। ধ্বংস করতে। এই তুফানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হিন্দু মন্দির।

ওই রাতে মন্দিরে দশ/বারো জন লোক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসে ছিল। তন্মধ্যে মধ্যমণি ছিলেন মন্দিরের বড় পন্ডিত। তার শ্মশ্রু যেমন দীর্ঘ নয়, তেমনি লম্বা নয় জটাজুট। মাথায় নেই টিকিও। চেহারার রং তার বিবর্ণ।

সাথে পাঁচ ছ' জন চেলা। এ হচ্ছে সিস্তানের ঠাকুর। যে রাম চাঁদ হালার সাথে ষড়যন্ত্রে মেতেছিল। সন্ধ্যা নামতেই এক দু'জন করে মন্দিরে আগমন করতে থাকল। ওদের সংখ্যা চল্লিশ/পঞ্চাশের মত। রাজা দাহিরের ফৌজের সেনা এরা। এরা ব্যবসায়ী কাফেলার কর্মকর্তা, দেহরক্ষী ও উষ্ট্রচালকের ছদ্মাবরণে এসেছিল।

এদের সময় নির্ধারিত ছিল। স্থানীয় হিন্দুদের বাড়ীতে যারা আত্মগোপন করেছিল তারাও একে একে প্রবেশ করছিল। এরা সবাই দাহিরের ফৌজ।

মুসলিম হাকেম ওদিকে তখন সুখ নিন্দ্রায় বিভোর। তাঁর বিশ্বাস, শহরে শান্তি নিরাপত্তা বিরাজমান। শহরে শান্তি না থাকলেও বাইরের হামলার কোন সম্ভাবনা আঁচ করেননি তিনি। তিনি কল্পনাও করেননি যে, শহরের ভেতরেই ষড়যন্ত্রের তুফান উপচে ওঠছে। কেল্লা প্রাচীরে যে সব সৈনিক ছিল তারা সংখ্যায় যেমন কম তেমনি চৌকসও নয়।

মন্দির তখন জঙ্গ অপারেশন থিয়েটারে রূপ নিয়েছে। রাম চাঁদ হালা দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। হিন্দু ফৌজ বর্শা ও তীর বল্লমে সজ্জিত।

এটি রাম চাঁদ হালার রহস্যময় ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে সে বড় পন্ডিতের আশ্রয় নিয়েছে। অতঃপর ছদ্মাবরণে শীষমে প্রবেশ করেছে। নিজ চোখে দেখে নিয়েছে কেল্লার মুসলিম সেপাই এবং তাদের অবস্থান। পন্ডিতকে সে পরিকল্পনাও বাতলেছে। পন্ডিতের সাথে পরামর্শক্রমে সে বাহিনীকে হিন্দুদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে।

হিন্দু ফৌজ মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো। তারা দু'তিন জন করে শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এক এক করে কেল্লার সেপাইকে কুপোকাত করা তেমন কোন কঠিন ছিল না। মুসলিম সেনা সংখ্যায় ছিল নগণ্য।

শীষমের দু'মুসলিম গভর্ণর আবদুল মালিক ও হামিদ বিন ওয়াফার বাহিনী এদের ষড়যন্ত্র রুখতে ব্যর্থ হলেন।

সকাল বেলা কেল্লা থেকে মুসলিম পতাকা অপসারিত করা হোল। দাহিরের গেরুয়া ঝান্ডা সেখানে ওড়তে লাগল। মুসলিম সেপাইরা বন্দী হোল।

॥ দুই ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরোড়ের ছাউনি থেকে জানতে পারলেন শীষম দুশমনের হাতে চলে গেছে। শহরের ভেতর থেকেই এই ষড়যন্ত্র হয়েছে– তাও জানানো হলো তাঁকে।

তিনি মুসআব বিন মুহাম্মদকে এই ষড়যন্ত্রকারীদের সাজা দিতে প্রেরণ করলেন। সাথে দিলেন এক হাজার সওয়ার ও দু'হাজার পদাতিক। তাদের বলে দিলেন, কোথাও যাত্রাবিরতি না করে সরাসরি শীষমে যাবে এবং কেল্লা কব্জা করে নেবে।

'কসম খোদার! ইবনে মুহাম্মদ, আমি শুনতে চাই না, তুমি ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছ। বুঝতেই পারছ, কি তাড়াতাড়ি তোমাকে ফিরতে হবে।' বিদায়ী নসীহত করেন সালার।

'ইবনে কাসিম! আল্লাহর ফজলে ভালো খবর-ই শুনবেন।' তিনি বললেন।

দু'দিনের সফরে মুসআব বাহিনী শীষমে পৌঁছে গেলেন এবং কেল্লা অবরোধ করলেন।

'রাম চাঁদ!' মুসআব চিৎকার দিয়ে বললেন, 'কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে এসো। নইলে অগ্নিতীর দ্বারা তোমাদের শহরে আগুন লাগিয়ে দেব। কাউকেই জিন্দা ছাড়ব না।'

এর জবাবে হিন্দুরা তীর ছুঁড়তে লাগল। ওরা সংখ্যায় ছিল খুবই কম। এছাড়া শহরবাসী রাম চাঁদের কোন সহায়তা করল না। শহরের কেউই তার সাথে ছিল না। হিন্দুরাও এই মসিবতকালে তাকে সঙ্গ দিল না। যদিও তারা তার বাহিনীকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল।

বৌদ্ধরা ভেতর থেকেও রাম চাঁদকে ঘেরাও করে নিল। শহরের বেশ কিছু হিন্দুও রাম চাঁদকে বাধ্য করল কেল্লার দরোজা খুলে দিতে। রাম চাঁদ গোসসায় আক্ষেপ করে বলল, 'কেন? তোমরা কি এদেশে বিধর্মীদের ঠাঁই দিতে চাও?'

'আমরা কাউকে ঠাঁই দিতে চাই না। আমরা অধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত পছন্দ করি না। কেল্লার দরোজা খুলে দাও।' জনগণ বলল।

শহরবাসীদের হট্টগোলের সামনে নিজেকে অসহায় প্রমাণিত করল সে, তার সৈন্যও খুব কম। সে শীষমের পন্ডিতদের ওপর ভরসা করেছিল। তার বিশ্বাস, গোটা শহরবাসী তার মদদ করবে।

রাম চাঁদ হালা শহরবাসীর মারমুখী ভূমিকায় ভয় পেয়ে গেল। লোকজন এগিয়ে জবরদস্তিমূলক শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দিল।

মুসআব তাঁর বাহিনীসহ শহরে প্রবেশ করলেন শহরবাসী তাঁকে স্বাগত জানাল। মুসআব রাম চাঁদকে ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।

জনগণ রাম চাঁদকে খুজে পেল না। তালাশ শুরু হলে কেউ বলল, সে মন্দিরেই আত্মগোপন করে আছে। অবশেষে মন্দির থেকেই তাকে পাকড়াও করা হোল। তার ছদ্মবেশী গোটা বাহিনীকে ধরা হোল। যারা ইতঃপূর্বে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল এক্ষণে কেউ তাদের ঠাঁই দিল না।

কিছুক্ষণ পর রাম চাঁদের হাতে মারা পড়া শহীদ মুজাহিদবৃন্দের লাশ একত্রিত করা হোল। একদিকে রাম চাঁদ হালা অপর দিকে মন্দিরের কয়েকজন পন্ডিত দন্ডায়মান।

কমান্ডারদের সাথে মুসআব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। এই ঘোড়া শহীদানের লাশের নিকট দাঁড়ান। শহরবাসী বৃত্তাকারে ভীড় করে দাঁড়ানো। ঘরের ছাদে মহিলাদের ভীড়। গোটা সমাবেশে পিনপতন নিস্তব্ধতা। সকলেই শ্বাসরুদ্ধ। এটা মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। সকলের ধারণা, মৃত্যু তার ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছে। পন্ডিতবর্গ যারা দেবদূত হিসাবে শহরবাসীর শ্রদ্ধার নযরে ছিলেন, তারা এখন অপরাধীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান।

'শহরবাসী! ওই লোকদের অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী তোমরা, আমরা বিজেতা। এই অপরাধে আমরা চাইলে এই শহরের হিন্দুদের বেছে বেছে পাইকারী হত্যা করতে পারি। এরাই তো এই ষড়যন্ত্রকারীদের নিজ বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছিল, কিন্ত আমরা শরীর নয়, মনের বিজয় করে থাকি। এই পাপাত্মারা যাদের হত্যা করেছে তারাও তোমাদের সামনে। আমার তলোয়ার কোষের মধ্যে তড়পাচ্ছে-আমি এদের হত্যার প্রতিশোধে শহরবাসীকে এখনও কেন জিন্দা রেখেছি। কিন্তু তোমরা কেল্লার দরোজা খুলে দিয়ে যে অভাবনীয় স্বাগত দান করেছ—এর প্রতিদান আমি অবশ্যই দেব। রাম চাঁদ হালা, পন্ডিতবর্গ এবং তাদের আশ্রয়দাতাদের আমি মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করছি।' মুসআবের ফরমান শোনার পর শহরবাসীর সামনে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সকলেই বিড়বিড় করতে লাগল। ছাদে দাঁড়ানো নারীরা ক্রন্দন শুরু করে দিল।

'ফয়সালা যা শোনানোর শুনিয়ে দিয়েছি। কিন্তু শহরবাসীকে বলছি, তোমরাই এর ফয়সালা অন্য কিছু করার থাকলে বলো। তবে রাম চাঁদ হালা, পন্ডিত ও সেপাইদের আমি ক্ষমা করব না কিছুতেই।'

শহরের দু'তিন লোক মুসআবের সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন,

'হে সালারে আরব! আমরা আপনার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমাদের হাতে ফয়সালা ন্যস্ত করেছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যার ব্যাপারে আমরাও একমত। পন্ডিত মহারাজদের সকলে দেবদূত মনে করে। তারা ভয় দেখিয়ে শহরের লোকদের বাড়ীতে ওদের আশ্রয় দিয়েছে। ধর্মের নামে ওই কুলাঙ্গার পন্ডিতেরা ওই কাজ করেছে। সুতরাং আমরা অসহায়। হত্যার দায়ে হত্যার যোগ্য এই রাম চাঁদ ও তার দোসররা।'

শীষমের গভর্নরদ্বয়ও তাঁর সামনে ছিলেন। এ রায়ের সমর্থনে তাঁরা মাথা হেলালেন।

এরপরই রাম চাঁদ হালা, চার পন্ডিত ও ষড়যন্ত্রকারী সেপাইদের মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খেল। ষড়যন্ত্রের তুফান এভাবেই খতম করলেন মুসআব।

তিনি সহসাই দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মাধ্যমে এ সংবাদ বিন কাসিমের কাছে পাঠালেন। বিন কাসিমও তাড়াতাড়ি একটা পয়গাম মুসআবের নামে প্রেরণ করেন।

'সালারে আলা মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে আরব নেতা মুসআবের কাছে। খোদা আমাদের মদদ করেছেন। তোমরা শীষমের দেখভালের দায়িত্ব এমন লোকের হাতে ন্যস্ত করো যারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নযরে আস্থাশীল। হিন্দুদের প্রতি তিলমাত্র ভরসা করো না। এ পয়গাম যেমনি তোমার জন্য তেমনি গভর্নরদ্বয়ের জন্যও। এক্ষণে আরেকটি কামিয়াবীর জন্য তোমার কাছে অনুরোধ করছি, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন কমপক্ষে চার হাজার স্থানীয় সেপাই নিয়ে আসবে, যারা যুদ্ধংদেহী। ওখানকার ভিক্ষুরা এদের জিম্মাদার থাকতে হবে।'

এরা কোন্ কওমের ছিল জানা যায় না। মুসআব যখন এলেন তখন তাঁর সাথে চার হাজার নতুন সেপাই এলো। তবে এরা যে নবদীক্ষিত চেন্নাই কওম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ তিন ॥

শীষমের বিদ্রোহ দমন হতে হতে ঘোড়ার মড়ক আরো বিস্তার লাভ করল। ঘোড়ার কমতি দেখা দিল। হাজ্জাজকে পয়গাম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিয়ে এত সহজে ঘোড়া প্রেরণ সম্ভব নয়। ওদিকে রাজা দাহিরের হামলার সম্ভাবনা ছিল।

বিন কাসিম সিন্ধু নদের তীরে ভ্রাম্যমাণ তীরন্দায বাহিনী মোতায়েন করলেন। বললেন, দাহিরের বাহিনী নযরে পড়তেই তীরাঘাতে শেষ করে দেবে।

মুসলিম বাহিনীর কাছে অগ্নিগোলা ছিল। এই তীর যেখানে পড়ত সেখানে আগুন লেগে যেত। বিন কাসিম এদের বলেছিলেন, দাহির বাহিনী নৌকায় চেপে এপার আসতে চাইলে মাঝ নদীতে থাকতেই তোমরা হাজার হাজার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করবে।

ওদিকে দাহিরের প্রাসাদে তখন অন্য এক বচসা। তারা তর্কে লিপ্ত বিন কাসিমকে নদী পার হতে দেয়া হবে, নাকি আমরাই নদী পার হয়ে হামলা করব। তাদের সমরবিশারদ কমান্ডাররা বলল, এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারে না। দুশমন ঘোড়া হারিয়ে এখন দিশেহারা। তাদেরকে ঘোড়া সংগ্রহের অবকাশ দেয়া যাবে না।

সর্দার হারেস আলাফী দাহিরের পাশে বসা ছিলেন। দাহির ক'দিন পূর্বে তাকে ডেকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কৌশলে মদদের আহবান জানিয়ে ছিলেন।

'তুমি কি আমাদের বিরুদ্ধেই লড়বে, নাকি আমাদের সামান্য পরামর্শটুকু দেবে না? ভালো পরামর্শটুকু অন্ততঃ তোমার থেকে কি পেতে পারি না?' দাহির বলেছিলেন।

'হ্যাঁ! আরবদের বিরুদ্ধে না লড়লেও পরামর্শ আপনাকে দিতে পারি।' দাহির বললেন, 'আমাদের দোস্ত আলাফী হাযির। দেখা যাক তিনি আমাদের কি পরামর্শ দেন।'

হারেস বললেন, 'মহারাজ! আপনার তামাম ফৌজি কমান্ডারদের সহ একত্রে হামলা করা প্রয়োজন। আরেকটি পরামর্শ দিলে বোধহয় আপনিও পছন্দ করবেন না।'

সকলে তার পরামর্শ মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করল। হারেস বললেন,

'আমি এক আরব। আরবদের আপনি লড়তে দেখেছেন। তাদের অগ্রাভিযান ও যুদ্ধবিদ্যা অবলোকন করেছেন। আপনার লোকেরা কেবল রাম ধোলাই খেয়েছে প্রতিটি রণাঙ্গনে। তাদের একটি কামান চুরি করা ছাড়া তেমন কোন সফলতা এ যাবত অর্জন করতে পারেননি আপনারা। মনে করেছেন, আরবদের তামাম সফল কৌশল আপনি রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু আমি বলব, আপনি কিছুই জানতে পারেননি। আমি যা জানি আপনি তা জানেন না।'

'আরবরা ঘোড়াবিহীন লড়তে পারবে— এ কথা বলতে চাও কি? আরব জাতি পদাতিক আমাদের হাতির মোকাবিলা করবে কি করে?'

'তাই করবে মহারাজ! ওরা সেই জাতি, যারা এই সিন্ধুর হাতির বিরুদ্ধেই সীসাঢালা প্রাচীরের মত লড়াই করেছিল। ওই হাতির মাহুত ছিল এই সিন্ধুর লোকই। হাতিগুলোর মুখে লোহার মুখোশ ছিল। সেই যুদ্ধ হয়েছিল কাদেসিয়া প্রান্তরে। আপনার কি জানা নেই, সেই হাতিগুলোকে আরব জাতি কিভাবে ময়দান ছাড়া করেছিল? আমাদের পদাতিকরাই হাতির শুঁড় কেটে দিয়েছিল। মহারাজ! আরব ইতিহাস বলে, শুরুর দিকে এরা ঘোড়া ছাড়াই যুদ্ধ করেছে। কিন্তু কোন্ সে যুদ্ধ যাতে তারা পরাজয় বরণ করেছে? সুতরাং তাদের কাছে ঘোড়া নেই— এই যুক্তিতে তাদেরকে দুর্বল ভাবার মত বোকামি দেখাতে যাবেন না।'

'তুমি আরব না হলে আরবদের এত প্রশংসা কীর্তন করতে না।' এক ফৌজি কমান্ডার বলল।

'তোমরা আমাদের রসম-রেওয়াজ জানো না। দুশমনী মানুষের মাঝে থাকে। কিন্তু মাতৃভূমির সাথে দুশমনী থাকে না। আমি সরাসরি বলতে চাই, কাসিমের ওপর হামলা করে নিজেদের পতন ডেকে এনো না। তোমরা নদী পার হয়ে হামলা করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমরা ওপার যেতে তো পারবেই না। গেলেও একটি প্রাণীও জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। ওদের কাছে কামান আছে। আছে অগ্নিবাণ। যা মারলে নৌকা ডুববে আগুন জ্বলতে জ্বলতে।'

রাজা দাহির আনাড়ি ছিলেন না। দূরদর্শী তিনিও। তিনি মুসলমানদের হাতে মার খেতে খেতে বেশ সতর্ক হয়েছিলেন। তিনি আলাফীর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের ওপর হামলা না করার ফয়সালা করলেন। বরঞ্চ বিন কাসিমকেই নদী পার হবার সুযোগ দেয়ার পক্ষপাতী হলেন।

'আমি তোমাদের আরেকবার বলছি। আরবরা এপার এলে হাতি নিয়ে হিমালয়ের মত সটান হয়ে তোমরা দাঁড়াবে। ওদের পেছনে খরস্রোতা সিন্ধু। হয় আমাদের হাতে ওরা কচুকাটা হবে, না হয় খরস্রোতা সিন্দুতে সলীল সমাধি হবে।'

এদিকে বিন কাসিমের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তিনি ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুর তীরে টহল দিতেন। তিনি সালারদের বারংবার বলতেন, রাজা দাহির এত বোকা নয় যে, আমাদের দুর্বলতা জেনেও হামলা করতে বিলম্ব করবে।

গভীর রাত। চার পাঁচ জন তীরন্দায সিন্ধুর তীরে টহল দিচ্ছিলেন। খরস্রোতা সিন্ধুর বিশাল পানিরাশিতে তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। পানির তোড়ে সামান্য আওয়াজ হতেই তারা সতর্ক হতেন, অনুসন্ধান নিতেন।

হঠাৎ টহলদার তীরন্দায বাহিনী থমকে দাঁড়াল। তাঁদের দাঁড়ানোর কারণ নৌকা থেকে দু'আগন্তুকের অবতরণ। তারা এদের ঘিরে ফেলল। দু'জনকেই আরবী মনে হলো এবং তারা খাঁটি আরবী ভাষায়ই কথা বলল। বাচনভঙ্গি আরবী হলেও তারা নিশ্চিত ছিল না যে, এরা দোস্ত না দুশমন। তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে দেখা করতে চাইল। তীরন্দাযরা এদের গ্রেফতার করল। সন্দেহজনক লোকদের মত তাদের খীমায় নিয়ে এলো। ওখানকার পাহারাদারদের হাতে এদের তুলে দিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে এলো।

এদেরকে শাবান ছাকাফীর দপ্তরে নিয়ে আসা হোল। আগন্তুকরা হারেস আলাফীর প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিল। শাবানের সাথে আলাফীর গোপন যোগাযোগ ছিল। তিনি এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই তাদের বিন কাসিমের কাছে নিয়ে গেলেন।

'কি সংবাদ?' বিন কাসিমের প্রশ্ন।

'আমাদের সর্দার আপনার নামে পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাজা দাহিরকে তিনি হামলা থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়েছেন।'

'তিনি কি রাজা দাহিরের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন?'

'না সালারে আলা!' সর্দার বুঝিয়েছেন, বিন কাসিমের ছাউনিতে হামলা করলে লাভের চেয়ে তার লোকসানই বেশী হবে।'

আগন্তুকদ্বয় দাহিরের সাথে আলাফীর সমস্ত কপোপকথন ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলেন।

'সালারে মুহতারাম! সর্দার বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব আপনি ঘোড়ার ইন্তেযাম করুন। সময় যত বেহুদা খরচা হবে ততই তা দুশমনের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

তিনি আফসোস করে বলেছেন, হায়! এক্ষণে আমি ঘোড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারছি না। কেননা দাহির তা জেনে গেলে এখন যে উপকারটুকু করছি— তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষণে আপনি দাহিরের ভেতর বাইরের খবর পেতে থাকবেন প্রতিনিয়ত।'

'হারেস কি রাজা দাহিরের সাথেই থাকেন?'

'হ্যাঁ সালারে আলা! রাজা দাহিরের ভেতরের কথা জানার জন্য এটা তাঁর এক কৌশল মাত্র। আমরা জনাচারেক লোক সর্দারের দেহরক্ষী হিসাবে ওখানে থাকছি। আজ আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। একটি চোরাই নৌকা করে এসেছি। লোকচক্ষুর আড়ালেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

'হারেসকে বলো, আল্লাহই তাঁর এ মহান কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।'

প্রতিনিধিরা চলে গেলেন।

॥ চার ॥

বসরায় বসে হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঘোড়ার মড়ক সংবাদ শুনে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হলেও হাল ছেড়ে দেয়ার মত নন এই লৌহ মানবটি। তিনি বসরার সৈন্যবাহিনীর সমস্ত ঘোড়া জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই দু'হাজার ঘোড়া জমায়েত হোল।

তিনি মসজিদে মসজিদে খতমে খাজেগান পড়ে মুজাহিদ বাহিনীর জন্য দোয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ওলামা ও ইমামবৃন্দকে বললেন, 'সিন্ধুতে আমাদের ঘোড়াগুলো এমন এক রহস্যজনক রোগে আক্রান্ত হয়েছে যার কোন চিকিৎসা নেই। ঘোড়ার মড়ক লেগেছে। এক্ষণে একটু ভেবে দেখুন। আমাদের তরুণ সেনাপতি কি মসিবতের সম্মুখীন। এ অবস্থায় দুশমন হামলা করে বসলে কি পরিণতি দাঁড়াবে। দুশমন হামলা করবে অতি অবশ্যই। এক্ষণে আপনাদের ঐকান্তিক দোয়া ও জিকিরই পারে তাঁকে এই মহামসিবত থেকে উদ্ধার করতে।

অতঃপর তিনি কয়েক মণ তুলা ও সিরকা যোগাড় করলেন। এগুলো ঘোড়ার পিঠে করে সিন্ধু রওয়ানা করিয়ে দেন। তাইয়্যার নামক এক লোকের তত্ত্বাবধানে এই ঘোড়া পাঠানো হয়। তিনি ঘোড়া রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি বিন কাসিমকে লিখিত ফরমানে জানালেন, সিন্ধুর খাদ্য গ্রহণ করায় ঘোড়ার বদহজম হয়েছে। সিরকায় তুলা চুবিয়ে পাঠালাম। ভেজা তুলা পানিতে ছেড়ে সিরকা বানিয়ে ঘোড়ার মুখে দেবে। খলীফাতুল মুসলিমীনকে তোমার এই হালত জানানো হয়েছে। খলীফা ওয়ালিদ প্রতি জুমুআয় মুসলিম জাহানের মসজিদে মসজিদে বিন কাসিমের জন্য দোয়া করার নির্দেশ জারি করেছেন।

আল্লাহ্ পাক সকলের দোয়া কবুল করলেন। সময়মত দু'হাজার তাজাদম ঘোড়া রণাঙ্গনে পৌঁছে যায়। হাজ্জাজ প্রেরিত ঘোড়া পৌঁছার পূর্বে দাহির হামলা করে বসলে অবস্থা খারাপ হত। দু'হাজার ঘোড়ার পাশাপাশি ঘোড়া রোগ বিশেষজ্ঞও এলেন। তাঁর চিকিৎসায় অনেক ঘোড়া আরোগ্য লাভ করল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দীর্ঘ দিন অবস্থান করলেন সিন্ধুর তীরে। এদিকে হাজ্জাজের ধারণা ছিল, এতদিন সিন্ধু পাড়ি দিয়ে সে হামলা করে বসেছে। হাজ্জাজ গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন, বিন কাসিম কালক্ষেপণ করছেন। জানলেন, শীষমে বিদ্রোহ হয়েছিল, সে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। এসব কথা সামনে রেখে হাজ্জাজ একটি ফরমান লেখেন ঃ

'আশ্চর্য, তুমি এখনও সেই আগের জায়গায় বসে রয়েছ! এখনও নদী পার হওনি তুমি কি দুশমনের প্রতি করুণা করতে চাও? তোমার এই পদক্ষেপ আমি মেনে নিতে পারছি না। দুশমনকে তুমি ক্ষমা করে দেবে–তা হয় না। শত্রুতা যারা পয়দা করে তারা ক্ষমার অযোগ্য। তুমি অপরাধী ও নিষ্পাপকে একই পাল্লায় মেপো না। তোমার উদারতাকে দুশমন দুর্বলতা ভাববে। খোদা তোমাকে যে মেধা দিয়েছেন তা সকলের নেই। সেই মেধাবলে তুমি কাজ করছ না কেন? এখন হামলা না করে তুমি দুশমনের তলোয়ারে শাণ দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছ। তোমার সমর উপদেষ্টারা কি ঘুমুচ্ছে? আমার ফরমান তাদেরও শুনিও।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুশমনকে ধোঁকা দেয়া যায়। তুমি যুদ্ধ করতে দেরী করলে এর স্থায়িত্ব বেড়ে যাবে। হুকুমত ও হেকমতের দিকে নযর দাও। বাহিনীকে বীর ও নির্ভীক করো। অকুতোভয় হিসাবে সকলকে সজাগ কর। সত্য, সততা ও সত্যবাদীকে শ্রদ্ধা করো। খোদার রাহে ইস্পাত কঠিন থেকো।

আমি এখানে বসেই খরস্রোতা সিন্ধুকে দেখছি। গভীর নদীর উত্তাল তরঙ্গ অনুভব করছি। অপেক্ষাকৃত সরু স্থান দিয়ে নদী পার হও। নৌকার পুল বানাও। স্থানীয় লোকদের এ কাজে খাটাও। ওরাই তোমাকে নৌকার যোগান দেবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করো।'

এই ফরমানের পাশাপাশি খলীফার নির্দেশনামাও পাঠানো হলো, যাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে তিনি সিন্ধুর গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন। হাজ্জাজ এ প্রসঙ্গে লেখলেন, তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, চাচার পীড়াপীড়িতে নয়, বীরত্ববলেই তুমি এই ঈর্ষণীয় পদ লাভ করেছ।

এদিকে বিন কাসিম কেন দেরী করছিলেন তা তিনি ভাল করে অবগত ছিলেন। গোটা আরোড়ে তিনি জালের মত গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিদ্রোহী আলাফী তাঁকে এ ব্যাপারে মদদ করে যাচ্ছিলেন। দাহিরের বাহিনী ওপারে। ওরা হাতির সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, এবারের লড়াই চূড়ান্ত লড়াই। ইসলাম ও মুসলমানদের দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার লড়াই।

সতর্ক হয়েই বিন কাসিম অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হাজ্জাজের 'তুমি এখনও বসে কেন?' কথাটি তাঁর তরুণ মনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তিনি উপ-সালারদের কাছে অগ্রসর হবার পরামর্শ চান। অনেক আলোচনার পর নদী পারাপারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে বিশ্বনাথ পুত্র মুকুকে তলব করার সিদ্ধান্ত হয়। মুকু পূব হতেই তার বাবা-ভায়ের বিরোধী ছিল। বিন কাসিমের তলব শুনে তিনি বললেন, আমি সালারের কথা ভুলে যাইনি বা অকৃতজ্ঞও নই। আমি জানি, তাঁদের নদী পাড়ি

দিতে হবে। নৌকা প্রস্তুত। বীটল-এ নৌকা নোঙর করা। ওখানকার নদী অপেক্ষাকৃত সরু।

যথাসময়ে খোদার পথের সৈনিকেরা সিন্ধু নদ পাড়ি দিলেন। নৌকার পুল করে পাড়ির ব্যবস্থা সহজ হলো। রাতভর পারাপারের কাজ হলো। বিন কাসিম ও কিছু গোয়েন্দা অফিসার তখনও রয়ে গেলেন। সকাল হয়ে গেছে। সালার নৌকাপুলে চাপলেন। বিসমিল্লাহ বলে রওয়ানা হলেন। ঘোড়া তাঁর খুব সাবধানে পা ফেলছিল। নদী খুবই বিক্ষুব্ধ। বিন কাসিম পেছনে তাকালেন। উপ-সালারদের ঘোড়াও ততক্ষণে নৌকায় উঠে গেছে। বিন কাসিমের ঘোড়ার দেখাদেখি তাদের ঘোড়াগুলোও স্বচ্ছন্দে নদী পার হয়ে যায়।

ওপারে যেয়ে বিন কাসিম কোচ করার নির্দেশ দেন। ওখান থেকে সামান্য দূরেই একটি কেল্লা ছিল। ওখানে দাহিরের কিছু অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছিল। দাহিরের আরেক পুত্র গোপী ওই কেল্লার প্রধান।

বিন কাসিম সুলায়মান বিন কুশাইরকে ছ'শ মুজাহিদ নিয়ে ওই কেল্লার সামনে চলে যেতে বললেন। তাঁকে নির্দেশ প্রদান করে বললেন, 'সর্বদা প্রস্তুত থেকো। গোপী রাজা দাহিরের কাছে সেনা তলব করতে পারে। ওরা কেল্লা থেকে বেরুতেই তীর মেরে ঘায়েল করে ফেলবে। বাহিনী এলে তাদের রুখে রেখো। দরকার মত আগে বাড়বে, পিছু হটবে এবং যুৎসই অবস্থান থেকে হামলা শাণাবে।'

এছাড়া যে পথে দাহিরের বাহিনী ওই কেল্লায় আসতে পারত সে পথে তাগলেবী নামী এক কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে পাঁচ'শ মুজাহিদ মোতায়েন করেন। এদের কাছে কোন রসদ ছিল না, তাই নিরূনের এক বৌদ্ধ ব্যবসায়ীকে এদের রসদ পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হলো।

এ সময় জনৈক সেনা কমান্ডার ওই এলাকার লোকদেরকে মুসলিম বাহিনীতে ভর্তি করতে অর্থভান্ডার খুলে দেন। ১৫০০ লোক ফৌজে ভর্তি হয়। এরা সকলে জাঠ। এরা ছাড়াও কিছু হিন্দু ঠাকুরও যোগ দেয়। যোগ দেন মুকুও। বিন কাসিম এদের লক্ষ্য করে বলেন–

'তোমরা সবে আমাদের ফৌজে ভর্তি হয়েছ। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাদের স্বাগত জানাই। তোমরা ভাড়াটে বাহিনী নও। আরব সেপাইরা যে অনুদান পায় তোমরাও তা পাবে। তোমরা নিজেদেরকে আমাদের গোলাম মনে করো না। ইসলাম কাউকে গোলাম বানানোর অনুমতি দেয় না। তবে একটা কথা তোমাদের বলব, ধর্ম বদল কর চাই না করো, ওফাদারী বদল করো না। মনে রেখো, স্বজাতির বিরুদ্ধে তোমাদের লড়তে হবে। এটা মেনে নিতে না পারলে এখনি চলে যাও। আমাদের সাথে থাকলে সমৃদ্ধ জীবনের গ্যারান্টি পাবে তোমরা।'

সকলে বুলন্দ আওয়াজে বললো, আমরা ইসলামী ফৌজের সাথে গাদ্দারী করব না।

॥ পাঁচ ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম মুসআবকে এ বাহিনীর সালার বানিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'ইবনে মুসআব! তুমি জানো, অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব কতখানি। দুশমন তোমাদের ওপর হামলা করলে দূতদের বের করে দেয়ার চেষ্টা করো। জরুরী কোন খবর থাকলে স্থানীয় নয়, আরব কাউকে প্রেরণ করো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের কাছে সিন্ধু নদ পার হবার সংবাদ প্রেরণ করলেন। দূত নিজ চোখে দেখল নৌকার পুল ও পারাপারের হালচিত্র। তিনি দূত মারফত বলে দিলেন, তোমার ভাতিজা সিন্ধুর গভর্ণর হবার লোভে নয়, খোদার সন্তুষ্টির জন্যই সিন্ধু পাড়ি দিয়েছে। কালক্ষেপণটাও সেজন্যে হয়েছে। ভাতিজা তোমার ফিরে যেতে আসেনি। যতদিন তার দেহে প্রাণ আছে ততদিন সে ভারতবর্ষের অন্ধকারপুরীতে ইসলামের আলো পৌঁছাতেই থাকবে।

নদী পার হয়ে বিন কাসিম এক উঁচু টিবিতে দাঁড়ালেন। গোটা বাহিনী তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন—

'শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার! নদীর ওপারের হালচিত্র আর এ পারের হালচিত্র ভিন্ন। তোমরা সেই প্রবল শক্তিধরের মোকাবিলায় নামছ এবার, যার অর্ধেক এলাকায় ইতোমধ্যে আমরা বিজয়ী নিশান উড়িয়েছি। এ হচ্ছে রাজা দাহির। যে চরম মুসলিম বিদ্বেষী। শ'পাঁচেক আরব বিদ্রোহীকে এদেশে আশ্রয় দিয়ে সে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছিল। এক্ষণে আমাদেরকে চিরতরে খতম করে দিতে সে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। আমরা এই দূরপাল্লার পথে সফর করতে করতে ক্লান্ত হলে সে হামলা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাকে কি এই ধারণা দেবে যে, তোমরা ক্লান্ত?'

'না না!' বাহিনীর সকলে বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠল, 'আমরা ক্লান্ত নই।'

'খোশ হোক তোমাদের ঘোষণা! দৈহিকভাবে তোমরা ক্লান্ত হলেও তোমাদের ঈমান তাজাদম। মনে রেখো, এবারের যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ। ইসলামের এই ঘোরতর দুশমন পাগলা হাতি নিয়ে মাঠে নামছে। এই হাতি ইসলামী বাহিনীর অগ্রাভিযান রুখবে বলে সে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। কিন্তু না। তার ঐ ভ্রান্তি বিলাস আমরা বাস্তবায়িত হতে দেব না। কাদেসিয়ার দিকে তাকাও। অগ্নিপূজারীরাও ময়দানে হাতি এনেছিল। তোমাদের গর্বিত বাপ-দাদারা সেই হাতির শুঁড় কেটে দিয়েছিল। সেই হাতিরও যোগান দেয়া হয়েছিল এদেশ থেকে। এই দাহিরের বাপ-দাদারা দিয়েছিল সেই হাতি। ঈমানী অজেয় চেতনা নিয়ে এই নব্য আবরাহা বাহিনীর সামনে সীসাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়াতে হবে। আরেকটি কাদেসিয়া রচিত হতে যাচ্ছে। আবরাহার প্রেতাত্মা আবারো ফুঁসে ওঠছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আমি দেখছি আবাবিলের উত্থান ও সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসের প্রেরণা। খালেদী উদ্দীপনা। দাহিরের প্রাসাদে তোমাদের ধেয়ে যেতে হবে টর্নেডোর মত। কম্পন সৃষ্টি করতে হবে ভূমিকম্পের মত, বিস্ফোরিত হতে হবে বারুদের মত

তোমাদের বর্শার ডগার চেয়ে হাতির চোখ বড় নয়। তোমাদের কৌশলের সামনে হাতির চিৎকার খুব একটা জোরালো নয়। দাহিরকে বুঝিয়ে দাও। হাতি থাকে জঙ্গলে, কাপুরুষরাই তাকে ময়দানে আনে। জঙ্গলী পশুকে অন্ততঃ মুসলিম জাতি ভয় পায় না। তোমাদের তলোয়ারগুলো হাতির শুঁড় না কাটার মত ভোঁতা নয়।

বিপ্লবী বন্ধুরা আমার! তোমাদের পেছনে খরস্রোতা সিন্ধু। সামনে সুবিশাল আজদাহা। দুশমন বলবে, হাতির সামনে এসো, তোমাদের পিষে ফেলি। তোমরা সর্বদা আল্লাহ নাম জপবে। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করো যেন দুশমনের হাতি দুশমনকেই পদদলিত করে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! তাই হবে সালারে আলা!' বলল মুসলিম বাহিনী।

'সংগ্রামী সাথীরা আমার! তোমাদের ভাবনার অবকাশ দিচ্ছি। ময়দানে যারা পিছপা হতে চাও তারা এখনি কেটে পড়। এসো, সকলে অঙ্গীকার করি, দাহিরের লাশ মাড়িয়ে আমরা আরোড় প্রাসাদে ইসলামের হেলালী নিশান ওড়াব।'

এ সময় তিন জন সেপাই বেরিয়ে এলো। বিন কাসিম এদের সাথে গম্ভীরভাবে আলাপ করলেন। বললেন, 'তোমরা কাপুরুষ প্রমাণ করলে নিজেদেরকে?'

'না সালারে আলা! কাপুরুষ হলে আমরা বাড়ী থেকে বেরই হতাম না। বিগত কোন ময়দানে আমরা তা প্রমাণও করিনি। আমার মা মরা একটি মেয়ে আছে। এক বন্ধুর বাড়ীতে তাকে রেখে এসেছি। সে এখন যুবতী। তার লালন ও সৎপাত্র তালাশ করা কি আমার ওপর ফরয নয়?'

'হ্যাঁ! সর্বপ্রথম যুবতী মেয়ের দেখভালই তোমার জিম্মায় ফরয। যাও তুমি।' আর তুমি? দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। সে বলল, 'আমার মা বৃদ্ধা। এমন কোন আত্মীয় নেই যে তাঁর দেখাশোনা করবে। ভয় পাচ্ছি, সেই অসহায় মায়ের করুণ মুখ আমাকে না আবার আসন্ন যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে সহায়তা করে।'

'জি হ্যাঁ! তাঁর দেখভাল ফরয। আজই চলে যাও।'

'আর আমি ঋণগ্রস্ত মাননীয় সালার।' তৃতীয় জন বললো, 'ভয় পাচ্ছি, মারা গেলে কে আমার ঋণ শোধ করবে?'

'তুমি কি ঋণ শোধ করার যোগ্য হয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ সালারে আলা। ঋণ পরিমাণ অর্থ যোগাড় করেছি।'

'যাও। প্রথমে তোমাদের ফরয আদায় করো।'

ওই তিন জন চলে গেল।

॥ ছয় ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর ফৌজকে সুশৃঙ্খল করছিলেন। খুব সতর্কভাবেই তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। কেননা সম্মুখসমরে প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রথম তিনি নামছেন। রাজা দাহির এই যুদ্ধের পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। পরাজয়ের পর পরাজয়ের তিলক তার কপালে এঁটে ছিল। এরপরও তিনি সম্মুখসমরে নামেননি।

অগ্রগামী বাহিনীর গুপ্তচররা এসে খবর জানাল, সামনে জিওর নামক একটা স্থান রয়েছে। ওটি কেল্লা না হলেও প্রাচীর বেষ্টিত জনপদ। ঘাঁটি বানানোর জন্য এমন একটি জায়গা বিন কাসিমের প্রয়োজন ছিল।

বিন কাসিম অগ্রসর হলেন। ওখানকার ফৌজি সালার জানতে পারল, তুফান গতিতে ধেয়ে আসছে মুসলিম সেনাদল। এখান থেকে না পালালে জানে রক্ষা পাবে না। দাহির বাহিনী পলায়ন করল। জনপদে বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল। গুপ্তচররা জনপদবাসীদের শান্ত করার কোশেশ করল। তারা বলল, মুসলমানরা বেসামরিক লোকদের ওপর হাত ওঠায় না। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ক্ষতি করে না। জনপদবাসী শান্ত হলো কিন্তু তাদের অতি উৎকণ্ঠা গেল না।

এক লোক দাহিরের দরবারে গিয়ে বললো, 'মহারাজের জয় হোক। আরব বাহিনী এসে গেছে। দরিয়া পার হয়েছে। জিওরে তারা অবস্থান নিয়েছে। আমাদের ফৌজ পলায়ন করেছে! ওরা এখন জিওর দখল করে নিয়েছে।'

'পলায়ন করেই আমাদের ফৌজ ঠিক কাজটি করেছে। এ নগণ্য বাহিনী বিশাল এ বাহিনীর মোকাবিলা করবে কি করে? এখন থেকে পলায়নের পালা মুসলমানদের। ওদের কেউ পালাতে পারলে সেটা সৌভাগ্যই বলতে হবে ওদের। আমার জালে বাছাধনেরা এবার পা দিয়েছে। বেশ কিছু কেল্লা দখল করে বেটাদের দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ওরা জানতে পারেনি, চুনোপুঁটির লড়াই আর তিমির লড়াই এক নয়।

ইতিহাস বলছে, রাজা দাহিরের মুখমণ্ডলে আনন্দের হিন্দোল। তিনি নিশ্চিত। এবারের যুদ্ধে তিনি উপদেষ্টাদেরও এড়িয়ে গেছেন। বয়সের ভারে নোয়ার পাত্র নয় এই দাহির। তিনি ফৌজি সালার ঋষিকেষকে ডেকে পাঠান।

'ঋষিকেষ! এ কথা বলতে পার না যে, তোমার চেহারার রঙ বিবর্ণ। আরবদের ভয়ে এত ভীত কেন তুমি?' ঋষিকেষের চিবুকে হাত দিয়ে বলেন দাহির।

'না মহারাজ! ভয় কিসের! লড়াইয়ের পূর্বে চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়েই থাকে। আমার জন্য কি হুকুম মহারাজ?'

'শিকার জালে এসে গেছে। খোদ নিজে ময়দানে গিয়ে ওদের ধন্য করব না। ওরা আমাকে রণাঙ্গনে খুঁজে ফিরবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে পাবে না, ওদের সাথে ক্রীড়া কৌতুক করব। মাথায় লাঠি ঘোরাব। জিওরের ঝিলের তীরে হাজার তিনেক ফৌজ নিয়ে তুমি অগ্রসর হয়ে দুশমনের গতিবিধির ওপর নজর রেখে। আমি তোমার পিছে থাকছি।'

ঋষিকেষ তিন হাজার ফৌজ নিয়ে জিওর ঝিলের তীরে উপনীত হলো।

বিন কাসিম এ খবর পেয়ে মেহরাজ বিন সাবেতকে দু'হাজার সওয়ার দিয়ে পাঠালেন। তিনি বলে দিলেন, 'ইবনে সাবিত! ঝিলের তীরে দুশমন ছাউনি ফেলেছে। তুমি ঠিক এর বিপরীতে ছাউনি ফেলবে। সর্বদা থাকবে সচেতন সতর্ক। দুশমন যেন তোমার কাঁধে সওয়ার হতে না পারে।'

ঠিক এ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গাম পেলেন, যাতে তিনি সর্বদা নামায-কালাম ও দোয়া-দরূদের নির্দেশ দেন। বললেন, এবার

তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখা যাবে। খোদার প্রতি অবিচল আস্থা রেখো। খোদাকে সন্তুষ্ট রাখলে বিজয় তোমার পদচুম্বন করবেই।

উভয় বাহিনীই যুদ্ধের জন্য তৈরী। রাজা দাহিরও সম্মুখসমরে এলেন। তিনি জয় সিংহকে কাছে ডাকলেন। ওই সময় সে এমন এক স্থানে খীমা গেড়েছিল যেখানে বসে বিশ্বনাথের পথ আগলানো যায় এবং বিন কাসিমেরও কোন দিক থেকে সাহায্য আসতে না পারে। রাজা দাহির তাকে ডেকে নিলেন। বললেন, 'বাহাদুর পুত্র আমার! এক্ষণে আমাদের বিক্ষিপ্ত থাকলে চলবে না। দুশমন আমাদের নাকের ডগায়। মওকামত তাদের পেয়েছি। তোমার কিছু অজানা নয়। কিছু বলার প্রয়োজনও নেই। এ যমীন এদেশ তোমাদের। এক সাথে সমগ্র বাহিনী দুশমনের সামনে খাড়া করার প্রয়োজন বোধ করছি না আমি। আমি আরবের তরুণ সেনাপতিকে বলেছি, তোমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব।'

'পিতাজী মহারাজ! আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের দায়িত্ব আমাকে দিতে পারেন। ওই আনাড়ি সালারকে দেখে নেব।'

'এ জন্যই তোমাকে ডেকেছি বেটা। আমি এখনও জানি না, আরবের এ বাহিনী কতটা যুদ্ধপটু। আমি বলতে চাই, তুমি সতর্ক হয়ে হামলা করো এবং এদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে অবগত হও। হামলা ওরা আগে করবে। বিন কাসিম সর্বাগ্রে তোমার মোকাবিলায় আসতে পারে। তুমি হস্তিপৃষ্ঠে সওয়ার থাকবে এবং দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত থাকবে। বিন কাসিম রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে তার থেকে দূরে থাকবে। নিজে না গিয়ে তোমার বাহিনী দিয়ে তাকে মারতে কিংবা জিন্দা পাকড়াও করতে চেষ্টা করবে।

॥ সাত ॥

৯৩ হিজরীর রমযান মাসের কিছু দিন পূর্বে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। রাজা দাহির আলাফী সর্দার হারেসকে আরেকবার ডেকে বললেন, তোমার লোকদের এক একজন করে সওয়ার সিন্ধু বাহিনীতে শামিল করে দাও।

আলাফী এ প্রস্তাবের জবাবে বললেন, 'সারা জীবন আপনি এ প্রস্তাব রাখলেও আমার জবাব ঠিক ওটাই হবে, যেটা আমি ইতঃপূর্বে দিয়েছি। আজ সেই ধমকেরও জবাব দেব, যা আপনি ইতঃপূর্বে দিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রয় দেয়ার খোঁটা মেরেছিলেন সেদিন আপনি। বলেছিলেন, আমাদের সিন্ধু থেকে বের করে দেবেন। শুনে নিন, ওই ধরনের কোন পদক্ষেপ নিলে আপনার বিরুদ্ধে আরবের এই বাহিনীই যথেষ্ট। মুহাম্মদ বিন কাসিম জেনে গেছেন আমরা তাঁর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়ব না। তিনি আমাদেরকে ভাই মনে করেন। আমরা মসিবতে পড়লে তিনি অতি অবশ্যই পাশে এসে দাঁড়াবেন। এটা আরবীদের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য ইসলামের।'

'আরবদের ঐতিহ্য কি এটাই, যেটা উপকারের বিনিময় আমাদের তুমি দিচ্ছ? আমার মন বলছে, তুমি আমাদের সাথে প্রতারণা করছ।'

'না না! আপনি আমাদের পরামর্শের জন্য রাজমহলে ডেকেছেন। দেখবেন আমি কোন গলদ পরামর্শ দেব না।' থামলেন তিনি। খানিক দম নিয়ে বললেন, 'উপকারের বিনিময় চাইলে এতটুকু আমি করতে পারি জয় সিংহের মোকাবিলায় বিন কাসিম আসে কি না, সে খবর এনে দেব। আপনি আরো কিছু জানতে চাইলে বলুন, সে তথ্যও এনে দেব। আমি মুসলিম শিবিরে যাব। ইসলাম ও বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে তাদের সাথে মিশব। আপনার হয়ে গোয়েন্দাগিরি করব।'

এ কথা শুনে রাজা দাহির খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, তুমি গোয়েন্দাগিরি করলে সেটাকেই আমি উত্তম প্রতিদান ধরে নেব। হারেস ওই দিনই মুসলিম শিবিরে গিয়ে বললেন, 'বিন কাসিম! আমি রাজা দাহিরের গোয়েন্দা হিসাবে এসেছি। দাহির আমাকে প্রতিনিয়ত আলাফীদেরকে তার বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তবে আমার কর্মকাণ্ড সবই তোমার নখদর্পণে। পরামর্শ করার জন্য সে আমাকে উপদেষ্টা কমিটিতে রেখেছে। তার ভেতর বাইরের কোন পরিকল্পনা আমার কাছে গোপন রাখবে না বলে সে আমাকে ওয়াদা করেছে।'

'হ্যাঁ হারেস! তুমি আমাদের জন্য যা করছ তা এক এবাদত। তুমি কিভাবে এলে?'

'দাহিরের গোয়েন্দা হয়ে। গোয়েন্দাগিরির প্রস্তাব স্বেচ্ছায় তার কাছে রাখলে আহাম্মকটা তা মেনে নেয়। প্রথম লড়াইতে তার পুত্র জয় সিংহ নেতৃত্ব দেবে। আমি জানতে এসেছি আসন্ন লড়াইতে তুমি অংশ গ্রহণ করছ কিনা। দাহির কিন্তু এ লড়াইতে অংশ নেবে না। জয় সিংহ তার বাহিনী বেষ্টিত থাকবে। তোমার পোড়খাওয়া বাহিনীকেই সামনে অগ্রসর করো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লড়াইতে দাহির তোমাকে কমযোর করতে চাইছে। জয় সিংহের বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দেয়া চাই। স্রেফ জিতেই ক্ষান্ত হবে না। পলায়নপর হিন্দু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনও করবে। ময়দান তোমার হাতে থাকলে দুশমনকে কচুকাটা করবে। এতে দাহিরের অবশিষ্ট বাহিনীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি হবে। আগামী লড়াইতে তা তোমাকে বেশী উপকার দেবে।'

'এমনটাই হবে আলাফী। সিন্ধু বিজয় হলে তোমার দেহ থেকে বিদ্রোহের ছাপ আমি মুছে দেব।'

'আমার জাতীয় দায়িত্ব পালন করছি আমি কাসিমের বেটা। আমি তোমার হাজ্জাজ ও খলীফার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় কিছু করছি না। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আমার মিশন। আমি যাবার পর তুমি বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা করতে পার আমি রাজা দাহিরের গুপ্তচর হয়ে এসেছি। তোমার লোকদের বলবে, আমাকে যেন ধাক্কিয়ে শত্রু শিবিরে ফেলে আসে।'

'ও কাজ আমার দ্বারা হবে না আলাফী! তুমি আমার দ্বারা ওই গোনাহ কেন করাতে চাচ্ছ?'

'এর মধ্যে কল্যাণ দেখছি তাই। তোমার দুশমন দেখছে সবকিছু। ওরা সন্দেহ করে বসলে মহাফাঁপরে পড়ে যাব আমি। আমি দেখাতে চাই, তোমরা আমার প্রতি রেগে গেছ। এর দ্বারা বোঝা যাবে, তোমরা আমার প্রকৃতি জেনে গেছ।'

হারেস আলাফীর কথামত কাজ করা হোল। বিন কাসিম বাহিনী জানতে পারেনি এ এক সাজানো নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে। তারা সত্যিই মনে করল, আলাফী দরদী শত্রু সেজে মুসলিম শিবিরে চর হয়ে এসেছিলেন।

মুসলিম বাহিনী আলাফীকে ধিক্কার তিরস্কার করতে করতে শত্রু শিবিরে নিয়ে চলল। হিন্দু বাহিনীর খীমার কাছে এসে তারা উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'নাও তোমাদের টিকটিকি। ও মুসলমান নয়, তোমাদের মত শত্রু হয়ে গেছে।'

হারেসের ওই নাটক খুব কাজে আসল। তিনি ঘাম মুছতে মুছতে দাহিরের দরবারে পৌঁছুলেন। বললেন, 'মহারাজ! আপনি আরবদের মেধা ও বিবেকের তলা খুঁজে পাননি। আপনার কাজের কথা বিন কাসিম থেকে জেনে এসেছি। অবশ্য আমি ধরাও খেয়ে গেছি। তার বহিনীতে শাবান সাকাফী নামে এক গোয়েন্দা অফিসার ছিল। সে আমাকে ধরে ফেলল। শুধুমাত্র আরব হবার সুবাদে ওরা আমাকে জানে রক্ষা দিয়েছে। ওরা আমার চরম অবমাননা করেছে। গলা ধাক্কিয়ে বের করে দিয়েছে।'

'তা আমি কি করতে পারি? বিন কাসিম স্বয়ং এ যুদ্ধে আসবে কি?'

'সে তার এরাদা বদলও করে ফেলতে পারে। নিশ্চিত বলতে পারি না। এ যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করবে কি-না। আমার যা ধারণা, সে খুব সতকর্তার সাথে পদক্ষেপ নেবে।'

আলোচ্য বাপারটি শুধু মুসলিম শিবিরে নয়, বরং ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি করেছে, হারেস আলাফী সত্যিই কি রাজা দাহিরকে ধোঁকা দিয়েছিল, না বিন কাসিমের সাথে প্রতারণা করেছিল? ফুতুহুল বুলদানে আল্লামা বালাজুরির মতে, রাজা দাহিরকে ধোঁকা দিতেই মুসলিম শিবিরে এসেছিলেন মহামতি আলাফী। তাই তো রাজা দাহির তার পুরো বাহিনী জয় সিংহের হাতে দিয়েছিলেন।

॥ আট ॥

রমযানের কিছু পূর্বে বিন কাসিম জানতে পারলেন, জিওর ঝিলের কিনারস্থ বাহিনী রাজা দাহির উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। গুপ্তচররা এসে খবর দিল, ঝিলের দেড়/দু' মাইলের মত দূরে তারা সৈন্য কাতার সাজাচ্ছে। খুব সম্ভব তারা লড়াইতে নামতে চাইছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম শত্রু সৈন্যের পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ করলেন।

শাবান তার গোয়েন্দাদের মাধ্যমে দাহিরের পুরো যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর নিলেন। আলাফীর মাধ্যমে বিন কাসিম পূর্ব থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, আসন্ন যুদ্ধের নেতৃত্বভার দাহির পুত্র জয় সিংহের কাঁধেই চাপছে।

জয় সিংহের বাহিনী মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা দ্বিগুণ। তার হাতিগুলো যেভাবে মুখ ভেংচি মারছে তাতে বোঝা যায়, এগুলোকে কিছু খাইয়ে পাগল করা হয়েছে।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। ওদের হাতিগুলো বিকট চিৎকার মারছে। বাবার নির্দেশমত মুসলমানদের সর্বাগ্রে হামলার সুযোগ দিতে চাইলেন জয় সিংহ। বিন

কাসিমও তার উপ-সালারদের নির্দেশ দিয়ে রাখলেন। আরব্য সমর নীতি মোতাবেক বিন কাসিম তার বাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করলেন। ডান, বাম, মধ্য ও পেছনের বাহিনী। রিজার্ভ বাহিনীও ছিল একটা। যারা কোন অংশে অভাব পড়তেই অংশ নিয়ে থাকত।

মেহরাজ ইবনে সাবেত মধ্য বাহিনীতে ছিলেন। দাহির-পুত্র জয় সিংহ ছিল মধ্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হস্তিপৃষ্ঠে। আরব সমর নীতি মোতাবেক মেহরাজ দু'বাহিনীর মাঝে গিয়ে বললেন, 'আমার সাথে লড়তে তোমাদের কার সাহস আছে এসো!'

শত্রু সৈন্য নিশ্চুপ। কোথাও কোন সাড়া নেই।

'দাহির-পুত্র জয় সিংহ কি ময়দানে নেই? হাতি থেকে নেমে আয় কাপুরুষের বাচ্চা।' আবার সেই নিরুপদ্রব ভাব। মেহরাজ নাঙ্গা তলোয়ার উঁচিয়ে আহ্বানের পর আহ্বান করে যেতে থাকেন।

সিন্ধুর সমর রীতিতে দ্বৈত যুদ্ধের বিধান নেই। আরব রীতি মোতাবেক সম্মিলিত যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে দ্বৈত যুদ্ধ হত। এতে কেউ মারা না যাওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত লড়াই শুরু হত না। যা হোক, মেহরাজ তাঁর স্বস্থানে ফিরে এলেন এবং সম্মিলিত আক্রমণের হুকুম দিলেন। অশ্বারোহীরা দ্রুত অগ্রসর হলেন। শুরু হোল ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির পাশাপাশি অসির ঝনঝনানি। মুসলিম বাহিনী খানিক যুদ্ধ করে আচমকা পিছু হটল। হিন্দুদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে এই পিছু হটা– তাদের এমন ধারণা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ফাঁদে পা দিতে এ কৌশল। এই ফাঁদে ধরা দিয়ে হিন্দুরা মুসলিম রণব্যূহে ঢুকে পড়ল। মুসলমানদের ডান-বাম বাহিনী এবার বীরবীক্রমে সাঁড়াশি আক্রমণ করল। যারা পিছু হটেছিল তারা এবার তাদের পদাতিক ফৌজ অগ্রসর করে দিল। মুসলমানদের তাজাদম বাহিনীর হামলা ছিল খুবই ক্ষিপ্র। এবার হিন্দুরা পড়ে গেল গ্যাড়াকলে। বাধ্য হলো পিছু হটতে।

সামনে হাতির প্রাচীর। হস্তির হাওদায় বসা লোকজন তীর-বর্শা নিক্ষেপ করছিল। মুসলিম তীরন্দাযরা মাহুত ও হাওদায় বসা বাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল। কিন্তু চলন্ত হাতি টার্গেট করে তীরের নিশানা খুবই মারাত্মক। হাতিগুলো বিকট আওয়াজ করে রণাঙ্গন কাঁপিয়ে তুলছিল। হাতি এগুতেই মুসলমানরা পথ ছেড়ে দাঁড়াত।

দু'তিন মুজাহিদ কমান্ডার এবার বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'হাতিকে ভয় করো না। এগুলো কাদেসিয়ার হাতি। ওগুলোর শুঁড় কেটে দাও।'

এ আওয়াজ শুনে মুজাহিদবৃন্দের মনে জোশ সৃষ্টি হল। তারা হাতির দিকে তেড়ে গেল। হাওদায় থেকে এ সময় ভেসে এলো পশ্‌লা পশ্‌লা তীর। আগুয়ান মুজাহিদদের অনেকে সেই তীরে যখমী হলো। শেষ পর্যন্ত আবু ইসহাক নাসিরীর এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপে মুজাহিদবৃন্দের ভয় দূরীভূত হলো।

তিনি একটি হাতি লক্ষ্য করে তেড়ে গেলেন। ওই সময় হাওদাওয়ালাদের দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। কিন্তু তিনি কাছে এলে মাহুত তাঁকে দেখে ফেলে। সে হাওদা থেকে একটি তীর মারে যা আবু ইসহাকের বাঁ কাঁধে গেঁথে যায়। নাসিরী বেপরোয়া

হয়েই অগ্রসর হন। হাতি বিকট চিৎকার মারে। পাগলা হাতি আক্রমণোদ্যত হয়ে শুঁড় উঁচায়। নাসিরী একযোগে প্রচন্ড শক্তিতে তলোয়ার চালান। শুঁড়ের অর্ধেক কেটে মাটিতে ছিটকে পড়ে।

বজ্রনিনাদে হাতি এগিয়ে আসে। দিকভ্রান্ত হয়ে দৌড়ানো শুরু করে ওটি। আব ইসহাক আরেকটি জোরালো আক্রমণ হানেন। এতে হাতির পা অর্ধেক কেটে যায়। হাতি স্থির থাকতে না পারায় মাহুত ভূতলে আছড়ে পড়ে। নাসিরী এদের একজনকে যমালয়ে পাঠান। অন্যরা পালাতে থাকে। মুজাহিদরা এদের কচুকাটা করে।

হাতি চিৎকার দিয়ে দৌড় শুরু করে। সেটির কর্তিত শুঁড় থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরতে থাকে।

আবু ইসহাক মারাত্মক যখমী হন। তিনি যুদ্ধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বুঝিয়ে দিলেন, মুসলিম জাতির সামনে হাতি কোন ভয়ানক কিছু নয়, বরং আরবী ঘোড়াই ওদের জন্য মারাত্মক। নাসিরী তাঁর দু'সাথীকে পেছনে রেখে এসেছিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর জয় সিংহের ফৌজের জন্য কিয়ামতের বিভীষিকা নেমে এলো। ওরা তীর-বল্লমে ঘায়েল হয়ে এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালাল। মুসলিম বাহিনী এদের রণব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল।

জয় সিংহ তখনো পেছনে। মুসলমানরা এবার চূড়ান্ত আঘাত হানল। দশ/বারো জন সৈন্য জয় সিংহকে তালাশ করছিল। কিন্তু মধ্য বাহিনীতে নিশ্ছিদ্র প্রহরায় ছিল তার অবস্থান। লড়াই চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল। আরব বাহিনী পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা করছিল। এজন্য খুঁজছিল সুবর্ণ সুযোগ। তারা নির্ধারিত বাহিনীকে ডানে-বামে ছড়িয়ে দিলেন। এমনকি রিজার্ভ বাহিনীরও অর্ধেকের মত মুজাহিদ ময়দানে নামানোর মত ঝুঁকি নিলেন। জয় সিংহের দৃষ্টি তখন পরবর্তী মুসলিম হামলা ও পাল্টা হামলার দিকে। তার হাতিগুলো তাকেই মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছিল। তার অসংখ্য মাহুত তীরাঘাতে শেষ। এসময় আচমকা অগ্নিবাণে তাদের হাওদায় আগুন লেগে গেল। তবে এতে তেমন একটা ক্ষতি হলো না। কেননা মোটা কাঠের ওই হাওদা। হাওদার পিঠে বর্শাধারীরা ওই আগুন সহজেই নেভাল। কিন্ত মাহুতবিহীন হাতির এলোপাতাড়ি ছোটাছুটিতে হিন্দু সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

আরবী ফৌজ দূর-বহু দূরে হিন্দু বাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে মেহরাজ ওদের উল্টা দিক থেকে হামলা করার নির্দেশ দেন। হিন্দুদের কাছে এ হামলা অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক মনে হল। এবার জয় সিংহের বাহিনী কচুকাটা হতে লাগল। মুহাজিদ বাহিনী তাদের চারপাশ দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বিন কাসিম ঈষৎ হাসিমুখে দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি এক দেহরক্ষীকে বলেন, মেহরাজকে বল আমাদের জঙ্গী কয়েদীর দরকার নেই, সকলকে মেরে লাশ বানাতে।

দাহির বাহিনীকে দিশেহারা ও অন্তঃসারশূন্য করতে তিনি এ নির্দেশ জারি করলেন। কেননা, এরপর চূড়ান্ত লড়াইয়ের আরো বাকি ছিল। দাহিরের সাথে হবে তাঁর প্রকৃত যুদ্ধ।

॥ নয় ॥

জয় সিংহ এবার পালানোর পাঁয়তারা করছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর দু'বাহুর মাঝে আটকা এরা। হিন্দু বাহিনীর মাঝে চরম হতাশা। হিন্দুদের এক্ষণের লড়াই জীবন বাঁচানোর লড়াই। ঋষিকেশ অনেক আগেই ময়দানে মরে পড়ে আছে।

জয় সিংহের খোঁজে মুজাহিদবৃন্দ তখন মরিয়া। ভয়াবহ অবস্থা তখন সিন্ধ অববাহিকায়। ঘোড়া, লাশ ও আহতদের চিৎকারে মাঠের অবস্থা সকরুণ। হাতির চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে আসমান যেন কাঁপছে। বিশাল বালুঝড় আসমান অদৃশ্য করে দিয়েছে। হক ও বাতিলের লড়াই চূড়ান্ত গন্ডিতে প্রবেশ করল।

জয় সিংহ হাওদায় মাথা লুকিয়ে ছিল। কেউ বলল, হাতি পালাচ্ছে। সবগুলো হাতিই কমবেশী যখমী। কারো পিঠে মাহুত আছে, আর নেই কারো পিঠে। কোন কোনটার পিঠে লাশ।

ওদিকে রাজা দাহির রণাঙ্গনের খবর শোনার আশায় উদগ্রীব। সূর্য ডুবে ডুবে ভাব। কিন্তু কোন দিকের কোন খবর নেই।

'জয় সিংহ বোধহয় দুশমনকে পশ্চাদ্ধাবন করছে। সে মুসলমানদের বুঝি রামধোলাই দিচ্ছে।' উপদেষ্টাদের বলে নিজেকে যেন প্রবোধ দিচ্ছিলেন দাহির।

'দুশমন বেটারা যাবে কৈ? সিন্ধু নদে সলীল সমাধি ছাড়া গতি নেই। খুব সম্ভব ডুবেও গেছে এতক্ষণে।' বললেন জনৈক উপদেষ্টা।

'আমার যদ্দূর বিশ্বাস, মুসলমানরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। জয় সিংহ কাউকে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়।' বললেন দাহির। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দূর থেকে একটি হাতি আসতে দেখা গেল।

'ওই যে খবর এসে গেছে। জয় সিংহ খবর পাঠিয়েছে।' দাহিরের কণ্ঠে আশার সুর।

হাতি এগিয়ে আসছিল শম্বুক গতিতে। দাহির রেগে বললেন, মাহুতকে দ্রুত এগিয়ে আসতে বলো। দাহির দেরী সহ্য করতে না পেরে ঘোড়ায় চেপে হাতি পর্যন্ত পৌঁছুলেন।

'মহারাজের জয় হোক।' দেহরক্ষী বললো, 'হাতিটা যখমী। ওর পেছনের দু'পা কাটা। মাহুতও যখমী। তার কাঁধে তীর লেগেছে। হাওদা খালি।'

হাতি খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাহুতের মাথা একদিকে কাত। ওঠতে গিয়ে সে পড়ে গেল। হাতিও দুর্বল। ওটি বসে গেল। হাওদায় দাহিরের দু'সেপাই মরা। মাহুতের মুখে পানি ছিটানো হলো। তার নড়াচড়ার ক্ষমতাও ছিল না।

'যুদ্ধের খবর কি?' দাহির মনের ধুকধুকুনি প্রকাশ করলেন প্রশ্নে।

'আমাদের সব হাতি আহত।' বলে সে বেহুশ হয়ে গেল।

ততক্ষণে পেছনের হাতিগুলো পৌঁছুতে লাগল। একটি হাতির মাহুত যখমী ছিল না। তার পাশে আর কেউই ছিল না। সে ময়দানের পুরো ঘটনা খুলে বলল।

'একটা হাতিও সুস্থ নেই। আমার হাওদায় জনাচারেক তীরন্দায ছিল। তারা মারা গেছে। বড্ড কষ্ট করে হাতিটি বাঁচিয়ে এনেছি।'

'জয় সিংহ কোথায়?' প্রশ্ন দাহিরের।

'তিনি লাপাত্তা মহারাজ। কারো হুঁশ নেই। নিজে কি করেছে, তাও জানা নেই আমাদের বাহিনীর।'

'মুসলমান পলায়ন করেনি?'

'না মহারাজ! তারা তো ভাগেইনি, উপরন্তু আমাদের কাউকেই পালানোর সুযোগ দেয়নি। আপনার কোন সৈন্য বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। আরব বাহিনী হাতির ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে হাতির মুখ ঘুরিয়ে দেয়। গোস্তাখী মাফ করবেন মহারাজ। ঋষিকেশ মারা গেছে। খোদ আমিই তাকে তলোয়ারের কোপে দু'টুকরা হতে দেখেছি।' মাহুত বলল।

'কিন্তু জয় সিংহ দু'টুকরা হতে পারে না। বিড়বিড় করে উন্মাদের মত উচ্চারণ করেন দাহির। আমার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে না। অশ্বারোহীরা কৈ? আমার সিংহকে তালাশ করে নিয়ে এসো।'

ইতোমধ্যে আরো দু'টি হাতি এগিয়ে এলো। ওদের দেহ থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে। একটির পিঠে মাহুত ছিল, আরেকটির পিঠে নেই।

অশ্বারোহীদের একদল হাযির হলো। তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, লড়াইতে শামিল না হয়ে জয় সিংহকে তালাশ করে আনো।'

॥ দশ ॥

রাজা দাহির যেভাবে জয় সিংহকে তালাশ করছিলেন সেভাবে মুজাহিদবৃন্দও জয় সিংহকে তালাশ করে ফিরছিলেন। বিন কাসিম জয়সিংহকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তুমুল লড়াই কালে সে যেন আত্মগোপন করেছিল। একদল মুজাহিদ জয় সিংহকে তালাশ করতে গিয়ে তাকে দেখে ফেলল। সে একটি সফেদ হাতিতে সওয়ার। আশেপাশে জনাপাঁচেক তীরন্দায। এই হাতিটা অন্যান্য হাতি থেকে ভিন্নতর। সুস্থ সবল ও তাগড়া। হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত দেখে জয় সিংহের মাথা ঘোরা শুরু করে। এক্ষণে সে পলায়ন করার ফিকির করতে থাকে।

আচমকা সে পতাকা নামিয়ে ফেলল, যাতে মুসলমানরা তাকে দেখতে না পায়। মুজাহিদবৃন্দ হাতিকে ঘিরে নিলেন। তারা হাতিটাকে যখমী করার কোশেশ সত্ত্বেও সেটি নিরাপদে বেরিয়ে গেল।

সূর্য ডুবেছে বহুক্ষণ। সন্ধ্যার আঁধার পরিবেশের গায়ে কালো পর্দা ফেলেছে। রাজা দাহির খুব পেরেশান অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বারবার আসমানের দিকে নযর করছিলেন। এ সময় পুত্রকে আসতে দেখে সজোরে তাকে বুকে চেপে ধরলেন।

জয় সিংহ বাবা। 'ভগ্নোৎসাহ হয়ো না রাজকুমার! আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি যা কাটিয়ে ওঠতে পারব না। আরবদেরকে আরোড়ের ময়দানেই আমরা জীবন্ত সমাধি দেব। নতুন চাঁদ ওঠতে যাচ্ছে। সামনে রমযান মাস। মুসলমানরা রোযা রাখবে। এ সময় তারা জলপান করবে না। ওই মাসে ওদেরকে লড়াইয়ের আহ্বান জানাব।' পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মূলত নিজকেই সান্ত্বনা দিলেন পরাজিত রাজা দাহির।

জয় সিংহের গোটা বাহিনী মারা পড়েছে। একজনও ফেরেনি। রাজা দাহিরের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

দাহির বধ

॥ এক ॥

৯৩ হিজরীর শাবান মাসের এক নিকষ কালো রাত।

ওই রাতটা সিন্ধুর ইতিহাসে রক্ত আর লাশের দুর্গন্ধে ভরা।

মশালে মশালে রণাঙ্গন সাক্ষাৎ দিনে পরিণত। যখমীদের প্রাণফাটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। বিজেতা মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত দাহির বাহিনীর যুদ্ধলব্ধ মাল জমায়েত করছিলেন। মুসলিম নারীরা আহতদের যখমে এলাজ দিচ্ছিলেন। এরা মুজাহিদবৃন্দের কারো স্ত্রী, বোন বা কারো মেয়ে।

অশ্বারোহী মুজাহিদবৃন্দ আহত দাহির সৈন্য ও নিহতের ঘোড়া কব্জা করছিলেন।

বিন কাসিম মালে গনীমতের প্রতি তেমন একটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁর ভাবনা–এরা দাহিরের মূল বাহিনী নয়। এখনো বিশাল এক তাজাদম বাহিনী রাজধানীতে অবস্থান করছে। তিনি সতর্কতাবশতঃ টহলদার অশ্বারোহীদের রণাঙ্গনের দূর-সুদূরে ছড়িয়ে দিলেন। যে কোন সময় গেরিলা হামলা হতে পারে এজন্যই ছিল এ টহল।

বিন কাসিম স্বয়ং এই যুদ্ধে শরীক হননি। তাই তিনি আঁধার রাতে ঘোড়ায় চেপে ময়দানে ঘুরে দেখছিলেন। সাথে মশালধারী দেহরক্ষী। তাঁরা পুরো ময়দান ঘুরে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি উপ-সালারদের বললেন, 'বন্ধুরা আমার! লড়াই সবে শুরু। এটা চূড়ান্ত লড়াই নয়। স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের বিজয় নসীব করেছেন। রাজা দাহির পুত্রকে লড়িয়ে আমাদের সমরবিদ্যা পরখ করলেন মাত্র। আসন্ন যুদ্ধে আমাদের আরো সতর্ক হয়ে লড়তে হবে।'

'ইবনে কাসিম! চিন্তা করো না। যেদিন দাহিরের মাথা তোমার পায়ে আছড়ে ফেলব, সেদিনই সিন্ধু বিজয় হয়েছে বলে দাবী করব ইনশাআল্লাহ। এর আগে নয়। ইসলামী প্রান্তর কন্টকমুক্ত করে আমরা বলব, এ সেই অভিপ্রায়, যার জন্য এই দূরপাল্লার পথে আমাদের আসা।' বললেন বয়োবৃদ্ধ এক উপ-সালার।

'কাসিমের বেটা! এটা আমাদের চূড়ান্ত লড়াই নয়। কিন্তু একে তুমি মামুলি বিজয় বলতে পার না। আমাদের মুজাহিদবৃন্দ হাতিকে অসার প্রমাণিত করে দিয়েছে।'

'বেশক, বেশক! আমি মুজাহিদবৃন্দকে সিন্ধু হাতির শুঁড় কাটতে দেখেছি।'

এরপর বিন কাসিম যখমী শিবিরে যান। ঘাস ও ত্রিপলে তাদের শুইয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। প্রতিটি খীমায় গেলেন। একটি খীমায় দেখলেন জনৈকা বৃদ্ধা যখমীদের পানি পান করাচ্ছিলেন। এর পূর্বে ওই বৃদ্ধা ও যখমীর মাঝে কিছু কথাও হয়।

যখমীর ক্ষতে পট্টি বাঁধা। বৃদ্ধার চোখেমুখে বার্ধক্যের বক্ররেখা। বৃদ্ধাকে যখমী বলেন,

'তুমি কার মা?'

'এক্ষণে আমি গোটা যখমীদেরই মা, যারা আরবের সম্ভ্রম বাঁচাতে এদেশে এসেছে। তুমি কার মা— এ প্রশ্ন তুললে কেন?

'তুমি আমারও মা। আমার মা কাছে থাকলে এভাবেই পানি পান করাতেন। এই বুড়ো বয়সে তোমার খেদমত দেখেই আমার প্রশ্ন।'

'কোন্ কবিলার তুমি?'

'আলাফী কবিলার।'

'আলাফী!' যখমী আশ্চর্য হয়ে বললো, 'আমাদের বাহিনীতে কোন আলাফী থাকতে পারে? তাদের অন্তর তো আমাদের প্রতি ঘৃণায় ভরা। তুমি এখানে এলে কি করে? আলাফীরা তো বিদ্রোহী।'

'আমি একাকিনী নই। আরো চার নারী এসেছে। আমরা তোমাদের সাথে আরব থেকে আসিনি। মাকরানেই আমাদের বাস।'

'এই নদী তোমরা কি করে পার হলে?'

'নৌকার পুল কি বানানো হয়নি? ওই পুল পেরিয়ে। কেউ আমাদের বারণ করেনি।'

ইতোমধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিম খীমায় প্রবেশ করেন। যখমী বৃদ্ধাকে বলেন, সিপাহসালার বিন কাসিম এসেছে। তিনি যেন জানতে না পারেন তুমি আলাফী। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দুই হাতে সালারের মাথা ধরে চুমো খেলেন। বললেন,

'কাসেমের বেটা! তোমাদের বাপ-চাচা বনু ছাকীফের ছিল সে কথা কি ভুলে গেছ? বনী উমাইয়ার নেমক তোমার খুনে এতটা প্রভাব ফেলেছে যে, সৈন্যদের মাঝে তুমি আলাফী দুশমনি ছড়িয়েছ? যদ্দরুন এই যখমীরা আমার হাতের পানি পান করতে কুণ্ঠাবোধ করছে? বিন কাসিম! তুমি জানো না, আলাফী নারীরা কিভাবে তোমার বিজয়ের জন্য দোয়া করেছে। একটু চিন্তা করে দেখ, এই পড়ন্ত বয়সে আমি কিভাবে এখানে পৌঁছেছি। তোমাকে দেখার বড় শখ ছিল মনে। তোমার চোখে আমি খালেদের বীরত্ব, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাসের গভীরতা ও আবু ওবায়দা ইবনুল জাররার মমত্ব দেখতে পাচ্ছি। তোমার যখমীদের মুখে আমি বিষ নয়, পানি দিতে এসেছি বাবা।'

বিন কাসিম সকলের দিকে ইশারা করতেই সকলে বৃদ্ধার প্রতি তৃষ্ণাতুর দৃষ্টিতে তাকাল। তিনি একে একে সকলকে পানি পান করালেন। বিন কাসিম এর পর বললেন, 'আমি আলাফীদের শত্রু নই, বন্ধু মনে করি। এই যখমীরা জানে না আলাফীরা আমাদের কি অশ্রুত পূর্ব সাহায্য করেছে। ওদের হয়ে আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি বুড়ী মা!'

'কবিলা কবিলায় দুশমনী থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামী রিশ্‌তাকে কেউ দুশমন সাব্যস্ত করতে পারে না। যেদিন এই বন্ধন টুটে যাবে সেদিন ইসলামও বিলীন হয়ে যাবে।'

॥ দুই ॥

আঁধার কেটে আলোর রেখা ফুটে উঠতেই ময়দানের চারদিকে দাহির বাহিনীর শব মিছিল দেখা গেল। এই বাহিনীর যখমীদের কেউ ওঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। মুসলিম শহীদানকে এক স্থানে জড়ো করা হোল। মুজাহিদবৃন্দ এদের কবর দিচ্ছিলেন। সকলকে জানাযা দিয়ে সিন্ধুর বালু প্রান্তরে চিরতরে শুইয়ে দেয়া হলো।

বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই যুদ্ধের বিজয় কাহিনী লিখে জানালেন। সাত দিনের মধ্যেই হাজ্জাজের জওয়াবী পত্র এসে গেল। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে মোবারকবাদ জানালেন। পত্রে তিনি সরাসরি দাহিরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিলেন। উপসংহারে হাজ্জাজ লেখেছেন, 'খোদার মর্জি ব্যতিরেকে শান-শওকত ও জয়-পরাজয় হয় না। আল্লাহ ভরসা করো।'

একদিন সমস্ত সৈন্য আসমানের দিকে তাকিয়ে খুশীর নারা দিয়ে ওঠলেন। তাদের দৃষ্টির সামনে রমযানের চাঁদ ভেসে ওঠল।

রাজা দাহিরও রমযানের চাঁদ দেখে খুশী হলেন। তিনি যেন এই চাঁদের অপেক্ষাই করছিলেন। ওই দিন শেষ রাতে শাবানের গুপ্তচর এসে জানাল, দাহির রাওড় ময়দানে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা কি ওখানেই খীমা গেড়ে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাবে, নাকি অন্য কোথাও কোচ করবে, তা জানা যায়নি। তবে গুপ্তচরের কথা দ্বারা এতটুকু জানা গেল, দাহির যুদ্ধ প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন।

শাবান ছাকাফীর যা বোঝার বোঝা হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ সালার আর উপ-সালারদের কাছে গেলেন। বললেন, দুশমন এই চাঁদের অপেক্ষাতেই ছিল।

রাজা দাহিরের যুদ্ধ প্রস্তুতি ছিল রাজকীয়। তিনি মদ খাইয়ে সব হাতিকে মাতাল বানালেন। দাহিরের হাতিতে সব সময় দু'টি খুবসুরত যুবতী থাকত। এরা দাহিরকে যুদ্ধকালীন সময়ে মদ ও পান সুপারী খাওয়াত।

॥ তিন ॥

রাজা দাহির হাতিপৃষ্ঠে চড়তে গেলে মায়ারাণী তার মাথায় আংগুল রেখে গন্ডে চুমো খেলেন। মায়া তার বোন ও স্ত্রী। বড়ো পন্ডিত দাহিরের গলায় যুদ্ধ প্রতীক পরালেন, পন্ডিতদের এক সারি দূরে ভজন গাচ্ছিল।

দাহিরের হস্তিপৃষ্ঠে চড়া একটি রাজকীয় অনুষ্ঠান যেন। তিনি হাতির পিঠে চড়ে ওই দু'যুবতীর কাঁধে ভর করে দাঁড়ালেন। দাহিরের ইশারায় হাতি চলা শুরু করল। পাগলা হাতি চিৎকার মেরে শুঁড় উঁচিয়ে আবার পেছনে এলো। 'মহারাজের জয় হোক' বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতি আবারও চিৎকার করল। সে চলতে চাচ্ছে না যেন। যেন মাহুতের আদেশ সে অস্বীকার করছে।

হাতি চিৎকার করতে করতে ছাউনির দিকে এগিয়ে চলল। ফৌজের সামনে শত হাতির সারি। প্রতিটি হাওদায় তিন চার জন করে তীরন্দায। এদের পেছনে দশ সহস্র সওয়ার। এদের মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ। গায়ে বর্ম। ১৫ হাজার পদাতিক ডানে আর ১৫ হাজার বাঁয়ে। দাহিরের নির্দেশে হিন্দু বাহিনী রণসাজে সজ্জিত হলো। দাহির এদের উদ্দেশে আগুনঝরা বক্তৃতা করলেন।

'ভারত মাতার সন্তানেরা! ভারত মাতা তোমাদের খুন চাইছে। কর্তিত মস্তক ভিক্ষা চাচ্ছে। মাথা কেটে ধরণীর কাছে সমর্পণ করে দাও। আমি সঙ্গে আছি তোমাদের। তোমাদের সাথে আমিও আমার মাথা কাটব। তবে এর আগে দুশমনের একশত মাথা কেটে নিতে হবে। দেব-দেবীর ইশারা পেয়েছি, আমার মাথা কেউ কাটতে পারবে না। এমনকি আমার দেহ আরব পর্যন্ত যাবে। আরবেও আমি হিন্দ ধর্ম নিয়ে যাব। আরব তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিজয়ের ধ্বনি করতে করতে তোমরা আরব যাবে। ইসলাম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছে। ইসলামের মস্তক চূর্ণ করতে হবে। আরবের আযানের কণ্ঠ আমরা চিরদিনের তরে স্তব্ধ করে দেব। ওখানে শঙ্খ ও কাস্ ধ্বনি হবে।'

'ধরিত্রী মাতা কি জয়!'

'জয় মহারাজ দাহির।'

রাজা দাহিরের চারপাশে কেবল এই শ্লোগান। তিনি আবেগপ্লুত কণ্ঠে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলা শুরু করেন-'মন থেকে মুসলিম বীর-ভীতি দূর কর। রাজকুমার জয় সিংহের পরাজয় ভুলে যাও। ওরা আমাদের অসংখ্য শহর ও কেল্লা দখল করেছে-ভুলে যাও এসব। এই বিজয় ওরা বৌদ্ধ কুলাংগারদের মদদে করেছে। ওই নৌকায়-ই ওরা খরস্রোতা সিন্ধু পাড়ি দিয়েছে। এবার ওদের পরাজয়ের পালা। ওদেরকে আমি এ পর্যন্ত আসতে দিয়েছি। জান নিয়ে ওরা সিন্ধু পেরোতে পারবে না। পার হতে দেব না। এখন আমরা সিন্ধুর তীরে যাব। এরপর ওদের জাহাজে চড়েই নৌবিহার করব।'

'তোমরা জানবাজি না রাখলে তোমাদের জোয়ান বেটিরা ওদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হবে। তোমাদের বিবিরা ওদের বাঁদী হবে। আর তোমরা মুসলিম

জাতির বলির পাঁঠা হবে। তোমাদের মাল সম্পদ কুক্ষিগত করা হবে। ওদের হাতে তোমাদের গো-মাতা হত্যা হবে। তোমরা গো-মাতার লাঞ্ছনা সহ্য করবে কি?'

'না! না!' ফৌজরা চিৎকার করে ওঠল, গো-মাতার লাঞ্ছনা হতে দেব না।

দাহির তার বাহিনীর রক্তে আগুন ধরালেন। দেবতার ভয়ে সকলকে তটস্থ করলেন। দেব-দেবীদের সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের লোভ দেখালেন।

রাজা দাহির তার বাহিনীকে খন্ডাকারে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার আশা, এই খন্ড বাহিনীর সাথে যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবহর দুর্বল হলে বাদবাকী বাহিনী নিয়ে স্বয়ং তিনি হামলা করবেন।

'ওদেরকে বিক্ষিপ্তাবস্থায় পিষে পিষে মারব। আরবরা পরিশ্রান্ত হওয়া মাত্রই সাঁড়াশির হামলা চালাব। ওদের বাহিনীর সিংহভাগই যখমী। রমযানের চাঁদ ওঠেছে। এ মুহূর্তে আমাদের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমার জীবদ্দশায় ইসলাম সিন্ধুতে থাকতে পারবে না। ইসলামকে না রুখতে পারলে এর প্রভাব আমাদের পরবর্তী বংশধরের মাঝেও জেঁকে বসবে। আর আমরা মারা গেলে শিয়াল কুকুরের বেশে আগামী জন্মে আমরা ওঠব।'—বলে দাহির তার বক্তব্যের ছেদ টানলেন।

॥ চার ॥

দাহিরের খন্ড দল এগিয়ে চলছিল। তিনি হাতি পৃষ্ঠে আবারো চাপলেন। এমন সময় জনৈক উষ্ট্রারোহীকে তার কাছে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে নিকটে এসে বলল, 'মহারাজ! আরব বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। এখান থেকে সামান্য দূরে ওদের থামতে দেখেছি।' লোকটা ছিল দাহিরের টিকটিকি।

বিন কাসিম দাহিরের পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য আলাফীর মাধ্যমে অবগত হচ্ছিলেন। তিনি ইসলামী সমরনীতি মোতাবেক দুশমনকে ঘর গোছানোর আগেভাগেই কামড় দিতে চাইলেন। তাঁর অগ্রযাত্রা ছিল খুবই ক্ষিপ্র গতির। সামান্য সময়েই তিনি সসৈন্যে রাওয়েড় চার মাইল দূরে এসে খীমা গাড়লেন।

এর ফলে দাহিরের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। এরপরও হতোদ্যম হবার পাত্র নয় ওই দাহির। তিনি তার বাহিনীকে যথাসম্ভব দূর দরাজ থেকে ডেকে সম্ভাব্য মুসলিম হামলাস্থলে মোতায়েন করলেন। দাহিরের প্রতিটি পদক্ষেপই বিন কাসিম সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। এর ফলে দাহিরের বাহিনী যেদিকেই রওয়ানা করত সেদিকেই দেখা যেত মুজাহিদ বাহিনীর কোন না কোন দল তাদের প্রতিরোধ করত।

রাজা দাহিরকে যারা বিদায় জানাতে এসেছিলেন তাদের অনেকেই ফিরে গেলেন। তন্মধ্যে পন্ডিত, দরবারী, উপদেষ্টা, দাহিরের স্ত্রীরা এবং দাসীরা ছিলেন। মায়ারাণী ও আলাফী ছিল তাদের সাথে। মুহাম্মদ বিন কাসিম দাহিরের ফাঁদে পা দিতে রাজি ছিলেন না। এজন্যই তিনি তাঁর ফৌজকে রাওড় থেকে চার মাইল দূরে যাত্রাবিরতি করিয়েছিলেন। ওখানে বসে তিনি গুপ্তচরদের মাধ্যমে পরিস্থিতির প্রতি নযর বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। বিন কাসিমের সৈন্য মাত্র ১২ হাজার। জয় সিংহকে পরাজিত করে তিনি বেশ কিছু ঘোড়া পেয়েছিলেন। এর দ্বারা পদাতিক বাহিনীও অশ পেয়ে অশ্বারোহী হয়ে গেল। আরবদের পদাতিকরা সকলেই ছিল স্থানীয়। মুসলমানদের চমৎকার ব্যবহারে তারা মুগ্ধ হয়ে বাহিনীতে নাম লেখায়। এরা সংখ্যাও কম করে হলেও হাজার পাঁচেক। ওদিকে দাহিরের পদাতিক বাহিনী-ই ছিল ত্রিশ হাজার। মুজাহিদ বাহিনীর তীরন্দায মাত্র এক হাজার।

বিন কাসিম তাঁর মধ্য বাহিনীর সালার নিয়োগ করলেন মেহরাজ ইবনে সাবেতকে। দক্ষিণ বাহিনীর সালার জুহাম ইবনে জুহার, বাম বাহিনীর সালার যাকওয়ান ইবনে ওলওয়ান, অগ্রগামী বাহিনীর সালার আতা ইবনে মালেক। বিন কাসিম খন্ড বাহিনীর সালার নিয়োগপূর্বক বললেন, 'মুজাহিদবৃন্দ! আমি শহীদ হলে মেহরাজ তোমাদের সিপাহসালার। সেও মারা গেলে সাঈদ নেবে সে দায়িত্ব।'

দাহিরের খন্ড বাহিনীকে গোটা এলাকায় জালের মত ছড়ানো দেখেও বিন কাসিম তাঁর বাহিনীকে ছড়ালেন না। কামান মধ্য বাহিনীতে রাখলেন। জানতে চেষ্টা করলেন দাহিরের মূল বাহিনীর অবস্থান। দাহির চিন্তা করছিলেন, মুসলমানরা বোধহয় চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতি নেয়নি।

যা হোক বিন কাসিম অগ্রগামী বাহিনীর সালার আতা ইবনে মালেককে দুশমনের মূল বাহিনীর ওপর হামলা করতে নির্দেশ দিলেন।

তার হামলা বড় ক্ষিপ্র ও প্রচন্ড গতির ছিল। হিন্দুদের আশা ছিল, তারা ময়দানে মুসলমানদেরকে খড়কুটার মত উড়িয়ে দেবে, কিন্তু আতা ইবনে মালেকের আচমকা আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করল তারা। মূল বাহিনীতে দাহির ছিল না। এদের আশা দাহির বিপদের সময় মদদ করবেন। কিন্ত বিন কাসিম এমনভাবে সৈন্য মার্চ করলেন যাতে দাহির এদের মদদ করার অবকাশই পেলেন না।

দাহিরের এই বাহিনী চোখে সর্ষে ফুল দেখতে পেল। পলায়নই এদের এক্ষণে জীবন বাঁচানোর উপায় ছিল। ওরা পিছপা হতে লাগল। বিন কাসিম এদের পিছু নিতে নিষেধ করলেন।

এই বাহিনীর সাথে হাতি ছিল। কিন্তু হাতির বিভীষিকা বিগত যুদ্ধেই মুসলিম মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। সালারের নির্দেশে এরা হাতি লক্ষ্য করে অগ্নিতীর ছোঁড়েন। তাও আবার হাওদা লক্ষ্য করে নয়, হাতির ক্ষুদ্র চোখ নিশানা করে। চলন্ত হাতির চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ খুবই মুশকিল। তাই তারা অনবরত তীর মারেন। এতেই হাতি চিৎকার মেরে পলায়ন করে।

॥ পাঁচ ॥

পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখেও দাহির তার ছড়ানো বাহিনী একত্রিত করলেন না। আবার নিজেও সম্মুখ সমরে নামলেন না। বিন কাসিমও এই পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি ক্ষুদ্র বাহিনী আগে বাড়িয়ে নিজে পেছনে থাকতেন।

দাহির খন্ড দল পাঠিয়ে মনে করছিলেন বিন কাসিমও এই কাজ করবে, কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের এই তরুণ সালার সে কথা খুব ভালো করে রপ্ত করেছিলেন। একে তো তাঁর ঝুলিভর্তি সমর অভিজ্ঞতা, অপর দিকে দাহিরের সব পরিকল্পনার উপর ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। এ দুয়ে তিনি ছিলেন খুবই হুশিয়ার। সপ্তাহ্খানেক অপেক্ষা করার পর দাহির তার উপ-সালারদের বললেন, 'না! না! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। দুশমন আমাদের পরিকল্পনা ধরে ফেলেছে। খামোখাই আমরা সময় নষ্ট করে চলেছি। নষ্ট করে চলেছি ফৌজ। এবার সরাসরি আমাকে ময়দানে নামতে হবে।'

'এখন সম্মুখ সমরে নামার সময় এসেছে মহারাজ! মুসলমানরা শ্রান্ত।' বললেন জনৈক সালার।

'না! তোমাদের দোষ কেবল ওটাই যে, তোমরা চিন্তা করে কিছু বলো না। চোখে কি তোমাদের ঠুলি আঁটা? তোমাদের দুশমন যেমন কমযোর নয়, তেমনি নয় শ্রান্তও। ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। আমাদের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে না। গোটা বাহিনীকে একত্রিত হতে বলো।'

ওই রাতেরই ঘটনা। খীমায় বসে বাঁদীদের পরিবেশিত মদ গিলছিলেন দাহির। ইতঃপুর্বে তিনি চূড়ান্ত লড়াইয়ের কথা বলেছেন সালারদের। আচমকা মদ্যপ দাহিরের কানে দু'টি চলন্ত ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে ওঠল। দারোয়ানকে ডেকে দাহির বললেন, কোত্থেকে আসছে ওই ধ্বনি? ইতোমধ্যে দুটি ঘোড়া এসে তার খীমার কাছে থমকে দাঁড়ায়। দারোয়ান বাইরে আসতেই মায়ারাণী ভেতরে প্রবেশ করেন। তার চেহারায় পেরেশানীর ছাপ। তিনি যে ক্ষিপ্রতার সাথে প্রবেশ করছিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছিল, নিশ্চয় কোন গুরুতর সংবাদ আছে এর পেছনে।

কি হোল রাণী! এ সময় তুমি এখানে?' দাহির ওঠতে ওঠতে প্রশ্ন করেন। রাণী খীমার মাঝখানে এলেন। বাঁদীদের দিকে ইশারা করতেই তারা বেরিয়ে গেল। প্রহরী পূর্ব থেকেই বাইরে ছিল। রাণী দাহিরের কাছে গিয়ে হাতে হাত মেলালেন। বললেন, 'মহারাজ! আপনি লড়াইয়ে অংশ নেবেন না। পেছনে থেকেই কমান্ড করবেন।'

'কি বলছ তুমি!' দাহিরের কণ্ঠে বিস্ময়।

'স্রেফ আপনার স্ত্রী হলে এ কথা বলতাম না। আমি আপনার সহোদরা বোনও। বোন তার ভাইকে---, না, না-- এমনটি হয় না। হতে পারে না।'

'ওহ্ রাণী! তুমি কোন ভয়ানক খাব দেখে এসেছো।' তিনি শরাবের পেয়ালা উঠিয়ে বললেন,

'নাও! গলাটা ভিজিয়ে নাও। দিল মন শক্ত কর।'

মায়ারাণী পেয়ালা নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন, 'শরাব আমার প্রসঙ্গচ্যুতি করতে পারবে না। আপনি যুদ্ধে শামিল হবেন না। আমি বড্ড খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। আপনি জলে ডুবে যাচ্ছেন। দেখলাম, আমি অগ্রসর হয়ে আপনাকে বাঁচাতে গেলে আমাদের লোকেরাই আপনার দেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে যাচ্ছে।'

থামলেন মায়া। খানিক শূন্যে তাকিয়ে দু'হাতে দাহিরের পা ধরে বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, না মহারাজ! যুদ্ধে যাবেন না।'

'আমি না গেলে আমার ফৌজ ভগ্নোৎসাহ হয়ে যাবে। মুসলমানরা আমার অনুপস্থিতি দেখলে কাপুরুষতার টিপ্পনী কাটবে। দেখছ না, পঙ্গপালের গতিতে ওরা ধেয়ে আসছে। পন্ডিতবর্গ বলেছেন, সিন্ধুর মাটিতে ওদের জীবন্ত সমাধি ঘটাতে হবে। দেবতাগণ ওই দায়িত্ব আমার কাঁধে সমর্পণ করেছেন।

'ওই পন্ডিতরাই আমাকে বলেছেন, সর্বাগ্রে মহারাজকে জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও। আরো বলেছেন, কাউকে পানিতে ডুবতে দেখা ভালো স্বপ্ন নয়।'

দাহির মায়ারাণীকে খীমার থেকে বাইরে নিয়ে গেলেন। মায়ারাণীর উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। দাহির তাকে ঘোড়ায় চাপালেন। দু'দেহরক্ষীসহ তাকে কেল্লায় অন্তরীণ করতে বললেন।

॥ ছয় ॥

৯ই রমযান, ৯৩ হিজরী (৭১১-১২ খ্রীঃ)।

রাজা দাহির যুদ্ধ সাজে রণাঙ্গনে।

সামনে একশ' জঙ্গী হাতির সারি। এর পেছনে দাহির দৈত্যাকৃতির এক হাতির হাওদায় উপবিষ্ট। জয় সিংহ নিকটেই একটি খুবসুরত ঘোড়াপৃষ্ঠে সওয়ার। হাতিগুলোর সবই উন্মত্ত। চিৎকার, তেড়ে মেরে লম্ফন—কুর্দনরত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, হাতিগুলোও মুসলমানদেরকে দুশমন জ্ঞান করছে। প্রতিটি হাওদায় নেযা ও বর্শা উঁচানো তীরন্দায।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর বাহিনীকে দাহিরের সামনে দাঁড় করালেন। তিনি আব মাহের হামদানীকে হাতির সামনে রাখলেন। এই বাহিনীর ঝুলিতে ছিল অভিজ্ঞতা ও রণনিপুণতার ছাপ।

মাখারেক ইবনে কা'ব, মাসুদ শোরা কালবী, সালমান এজদী এবং যেয়াদ ইবনে জুনায়দী ছিলেন মধ্য বাহিনীতে।

বিন কাসিম প্রতিটি দলের সালারদের উদ্দেশে বললেন, বন্ধুরা আমার! তোমাদের ওপর এমন একটি দায়িত্ব সঁপেছি, যার বিনিময় কেবল আল্লাহ-ই দিতে পারেন। এজন্য তোমাদের রক্ত নদী সাঁতার দিতে হবে।

'বলো কি সে দায়িত্ব ইবনে কাসিম! কসম খোদার, আমরা কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই সে দায়িত্ব পালন করে যাব।'

'রাজা দাহির তোমাদের শিকার। তোমার সাথে কিছু লোক নিতে পার। তার হাতিকে এমনভাবে আক্রমণ করো যাতে ওটা যখম হওয়ায় সে আছড়ে পড়ে। তাকে জীবিত হাযির করতে পারলে ভাল। জীবিত ধরতে না পারলে মাথা কেটে হাযির করো। বে-গোনাহ মুসাফিরদের সে অবৈধভাবে আটকে রেখেছিল। তন্মধ্যে নারী শিশুও ছিল। আমি তাকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করি।'

'এমনটাই হবে সিপাহসালার, এমনটাই হবে।' বললেন উপ-সালার। মুহাম্মদ বিন কাসিম ফের এলান করলেন, হে আরববাসী! আমি শহীদ হলে আমার স্থলে মেহরাজ বিন ছাবেত সালার হবেন। সে-ও শহীদ হলে তোমরা সাঈদকে সালার বানিও।

॥ সাত ॥

লড়াই শুরুর পূর্বেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনী হাতির মুখোমুখি হল। হাতি গোটা বাহিনীকে ক্রমশ যেন পেছনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে পেছনে হটতে হটতে তারা অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে নিজেদের আবার সংহত করে নিল। এরপর বিন কাসিম মেহরাজকে কমান্ড করেন, 'আগে বাড়ো। আল্লাহর নাম নিয়ে হামলা করো।'

মেহরাজ নির্দেশ পেয়েই সসৈন্যে ঘোড়ায় পদাঘাত করেন। তুমুল লড়াই শুরু হোল। জানবাযী লড়াই করে মেহরাজ শাহাদাত বরণ করলেন। দুশমনের পাগলা হাতির হামলার সম্ভাবনা ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম হাতি লক্ষ্য করে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে বললেন। এদিকে দাহির বিপদ আঁচ করে হাতিগুলো পেছনে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

মেহরাজের অনুগত বাহিনীকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। এবার সিংহশার্দূল সাঈদ তাঁর বাহিনী নিয়ে হামলা চালালেন। আবারও শুরু হলো রক্তক্ষয়ী লড়াই। রাজা দাহির দক্ষতার সাথে তার বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। সাঈদ তাঁর বাহিনীসহ হামলা করতেই বিন কাসিম আতা ইবনে মালেককেও আগে বাড়ালেন। তাঁর ক্ষিপ গতির হামলার সম্মুখে দাহিরের বাহিনী সাঈদের আশেপাশে ঘেঁষতে পারল না।

দাহিরের মন হতাশায় ছেয়ে গেল। তিনি মুসলিম বাহিনীর মাঝে কোন প্রকার ক্লান্তি অনুভব করলেন না। এমনকি তার এই প্রচন্ড ভৌতিক হস্তিবাহিনীও তাদেরকে এতটুকু তটস্থ করতে পারেনি। দেখে তিনি মুষড়ে পড়েন। মুসলমানরা প্রতিটি হামলার শুরুতে নারায়ে তাকবীর দিতেন। এতে দাহিরের বাহিনীর মাঝে যেন ভূ–কম্পন শুরু হত।

দাহিরের বাহিনী পিছু হটছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম একে ধোকা মনে করে তার বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন করতে বারণ করলেন। ময়দানে সাময়িক বিরতি নেমে এল। তবে একেবারে খালি হল না। লাশে ভরপুর পুরো ময়দান। যখমীরা কাতরাচ্ছে। এদের কেউ ওঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। উভয়পক্ষের সৈন্য তাদের স্ব-স্ব যখমীকে তুলে নিচ্ছে। বিন কাসিম যখমীদের সেবা ও পানি পান করানোর জন্য এক দল লোক আলাদা করে রেখেছিলেন। যখমীদের সেবা করাই ছিল তাদের কর্তব্য। সেবকদের একজনকে পানি পান করাতে দেখে তাঁর সন্দেহ হলো। কারণ, তাকে পুরুষ মনে হচ্ছিল না। বিন কাসিম ঘোড়ার থেকে ঝুঁকে তার কানের কাছে মুখ রেখে বলেন, 'আমার চোখ প্রতারণা করে না থাকলে বোধহয় তুমি পুরুষ নও।'

'আহলে ছাকাফীদের চোখ প্রতারিত হয় না। আমি এক নারী। তবে একাকিনী নই। আমার সাথে আছেন আরো ক'জনা। সকলের হাতে মশ্‌ক।'

'স্বামীর সাথে এসেছ? তোমার ভাই-ও এসেছে বুঝি?'

'ইবনে কাসিম! ওরা সবাই আমার ভাই। স্বামীর সাথেই এসেছি।'

পানি স্রেফ যখমীরা পান করত। রমযান মাসের দরুন সুস্থ মুজাহিদবৃন্দ পানি পান করতেন না।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নারীদের ময়দানে রাখবেন, নাকি যখমীদের শুশ্রূষায় পেছনে পাঠাবেন–সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ পেলেন না। কেননা, আচমকা দাহির আবার হস্তিবাহিনীসহ এগিয়ে এলো। এগুলোর পিঠে বর্শা উঁচানো বাহিনী।

বিন কাসিম ফওরান সাঈদ ও আতাকে দুটি দলসহ ময়দানে প্রেরণ করলেন। প্রতিটি দলের সদস্যের ওপর এক একটা হাতিকে আক্রমণ করার দায়িত্ব দিলেন। এগুলোর ওপর মুহুর্মুহু অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে বললেন।

দু'তিনটা অগ্নিবাণ বর্শাধারীদের গায়ে লাগল। সাথে সাথে এদের কাপড়ে আগুন ধরে গেল। হাওদায় তারা বাঁদর নাচ শুরু করে দিল। এরা লাফিয়ে হাতির পিঠ থেকে নামলে মুজাহিদরা সকলকে যমালয়ে পাঠান।

সূর্য ডুবন্তপ্রায়। মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধ নেশা তখন চরমে। এদিকে হস্তিবাহিনী বাধ্য হল পিছু হটতে। সন্ধ্যা নামতেই লড়াই স্থগিত করা হল। ততক্ষণে তিন/চারটা হাতি যখমী হয়ে পড়েছে।

॥ আট ॥

৯৩ হিজরীর ১০ই রমযানুল মুবারক।

এদিনটি ইসলাম ও হিন্দুস্থানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন হক ও বাতিলের চূড়ান্ত লড়াই হয়েছিল।

গত রাতে মুজাহিদ বাহিনী সামান্য বিশ্রামের অবকাশও পাননি। আগামীকাল মরণ কামড় দেয়ার জন্য রাতভর তারা সলাপরামর্শ ও পরিকল্পনা আঁটেন। বিন কাসিম কমান্ডারদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা দেখছ না, দূরে হস্তিপৃষ্ঠে দাহির

দর্শকের ভূমিকায় থাকছে? সে দেখছে, আমাদের লড়াইয়ের ধরন কিরূপ। আমাদের যোগ্যতা কতটা। সুযোগের আশায় প্রহর গুনছিল সে। শেষ পর্যন্ত হাতি দ্বারা হামলা চালালো। সে পর্যবেক্ষণ করল, আমরা এর মোকাবিলা কি করে করি। বুঝে শুনে ঠান্ডা মাথায় সে রমযানে যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আমাদের সিয়াম সাধনার দৌর্বল্য তাকে এই সিদ্ধান্তে মদদ যুগিয়েছে। কিন্তু কালকের সূর্য ভিন্ন এক দৃশ্য অবলোকন করবে ইনশাআল্লাহ।

সেহরীর সময় মুজাহিদবৃন্দ খানা খেয়ে নিলেন। ময়দানে তারা কোন যখমীকে রাখতেন না। সকলকে জড়ো করে শুশ্রূষা শিবিরে পাঠাতেন। বিন কাসিম দুশমনের প্রতিটি পদক্ষেপ জেনে যাচ্ছিলেন। এদিকে দাহির তার কমান্ডারদের চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, আগামীকাল হতে পারে বিন কাসিমের জীবনের শেষ দিন। হতে পারে তাঁর জীবিত বাহিনীকে আজীবন দাহিরের গোলামী করতে হবে। অবশ্য এই গোলামী অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় এবং খুবই যন্ত্রণাদায়ক। তিনি আরো বলছিলেন,–

'যে বিন কাসিমের মাথা হাজির করতে পারবে তার চেয়ে খোশ কিসমত সিন্ধুতে আর কেউ হবে না। সেই বীরকে আমার রাজনৈতিক উপদেষ্টা বানাব এবং বিশাল জায়গীর দিয়ে দেব।'

রাতে মায়ারাণী এলেন। দাহির সৈন্য বাহিনীর পেছনে থাকায় তিনি মহাখুশী। তিনি আগামীকালও তাকে পেছনে থাকার অনুরোধ জানালেন। দাহির তাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, না আগে বাড়ব না।'

পরদিন সকাল।

সিন্ধুর রণাঙ্গনের চিত্র ভিন্ন।

দাহির তার গোটা বাহিনীসহ ময়দানে হাযির। সৈন্য বাহিনীর মাঝবিন্দুতে শাহী হাতিতে সওয়ার রাজা দাহির। পাশে বীর পুত্র জয় সিংহ। এদিন তার রণসজ্জা আর দাপটই আলাদা গোছের। তার আগে-পিছে হাজারো বর্মাচ্ছাদিত বাহিনী। দশ হাজার ঘোড়ার অশ্বারোহী বাহিনী। উপরন্তু হাতির তর্জন-গর্জন ও তার দাম্ভিকতার শক্তিস্বরূপ ৩০ হাজার পদাতিক। দাহির দাম্ভিক হবে না কেন।

দুশমনের প্রতি তীর্যক দৃষ্টি ফেলে বিন কাসিম তাঁর সিদ্ধান্তে কিছু রদবদল ঘটালেন। গোটা বাহিনীকে তিন ভাগ করলেন। প্রতিটি ভাগেই তুখোড় তীরন্দায দল। এবার তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে বাহিনীর সামনে এলেন। তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন।

'হে আহলে আরব! বাতিলের লশকর তোমরা সামনে দেখছ। ওরা কেবল তোমাদের পথ রুদ্ধ করতেই আসেনি, এসেছে মিসমার করতে। ওরা সীসাঢালা প্রাচীরের মত দন্ডায়মান। ওরা লড়তে আসেনি, এসেছে বিত্ত-বৈভব ও জৌলুস প্রকাশ করতে। পার্থিব দাপটে বলীয়ান ওরা। মরণ কামড় দিতে এগিয়ে এসেছে। এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়। তোমাদের ঈমান পাহাড়ের মত অটল করতে হবে। মূর্ত হিমালয়ের মত সিনা টান করে

দাঁড়াতে হবে। রাহে লিল্লায় শাহাদতের তামান্না নিয়ে বেরোলে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আল্লাহর বাহিনী তোমাদের মদদে নামবে। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করো। ভয় ও পেরেশানী শব্দ দুটি মন থেকে মুছে ফেল। আমাদের তলোয়ার কুফরের রক্ত পিপাসায় বে-কারার। ওরা আমাদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হবেই।

যদি তোমরা আল্লাহর পরাক্রমকে সামনে রাখো তাহলে তিনি তোমাদের মদদ করবেন অতি অবশ্যই। যাকে যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে সে যেন ওখান থেকে না নড়ে। বামব্যূহের সৈন্য যেন ডান ব্যূহে প্রবেশ না করে। কেবল মদদের প্রয়োজন পড়লে তোমাদের স্থানচ্যুতির অনুমতি রইল।

মনে রেখো, 'নেককার ও পরহেযগার লোকেরাই বিজয় অর্জন করে। নেক নিয়তের লোকেরাই কেবল খোদার কাছে প্রিয়পাত্র। লড়াইকালে কোরআনের আয়াত এবং লা-হাওলা উচ্চারণ কর।'

বিন কাসিমের বক্তব্য শেষ হলে দু'লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন,

'কসম খোদার। নিশ্চয় তোমরা কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছ।

'আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন। আমরা সর্বাগ্রে আমাদের জীবন কুরবানীর জন্য নজরানা পেশ করতে এসেছি। কাফের বাহিনীকে দেখ। ওরা মসিবতের বিভীষিকা নিয়ে এসেছে। হাতিয়ার উঁচানো ওদের হাতি-ঘোড়ার দিকে তাকাও।' আগন্তুকের একজন বললেন।

॥ নয় ॥

ঘোড়ায় পদাঘাত করে উভয় বাহিনীর মাঝে এসে দাঁড়ালেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। বুলন্দ আওয়াজে বলে ওঠলেন, 'সুলায়মান ইবনে নুবহান, আবু ফেজ্জা কুশায়রী! স্ব-স্ব বাহিনীর চল্লিশ জন সহকারে সামনে এসে দাঁড়াও এবং দুশমনকে লক্ষ্য করে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাও।'

এটা ওই যুগের রণনীতি। সম্মিলিত আক্রমণের পূর্বে সামান্য কিছু ফৌজ আগেভাগে প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানাত। কুশায়রী ইতঃপূর্বে গোলাম ছিলেন। সামান্য দিন হয় তিনি আযাদ হয়েছেন। এ খন্ড দল ময়দানে এসে দুশমনকে আহ্বান করলেন।

রাজা দাহির তার ঠাকুরদের একদল এদের মোকাবেলায় আগে বাড়ালেন। দাহিরের বাহিনী বেরুচ্ছে দেখে নুবহান সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে কুশায়রী অভিনব কায়দায় এদের পেছনে গিয়ে আক্রমণ হানেন। দাহিরের যে কয়জন এগিয়ে এলো, সকলেই এদের তলোয়ারের শিকার হলো। মুজাহিদবৃন্দের

সমরনীতির সামনে দাহিরের কৌশল মুখ থুবড়ে পড়ল। নুবহান ঘোড়া দাবড়ে দুশমনকে আহ্বান করছিলেন। দাহির ঠাকুরের আরেকটি দল প্রেরণ করলেন। কুশায়রী বজ্রাঘাত হানলেন। তিনি হিন্দুদের সামালের সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর আক্রমণাত্মক ভঙ্গির সামনে দুশমন ছিল অসহায়।

দাহিরের এ বাহিনীও পূর্বেকার বাহিনীর মত মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেল। এবার রাজা দাহির তৃতীয় একদল প্রেরণ করেন। অবশ্য পূর্বেকার চেয়ে এদের দল ভারী ছিল। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে এদের কেউ মারা পড়ে আর কেউ পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

মুসলিম রণব্যূহে নারা ও বিজয়োল্লাস। এটা বজ্রাঘাতের সুফল। মুজাহিদবৃন্দের গগনবিদারী শ্লোগান আর তাদের তিনটি বাহিনীর পরিণতি দুশমন শিবিরে খুবই প্রভাব ফেলে। কুশায়রী ঘোড়া দাবড়ে দুশমনের কাতারের সামনে গিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললেন—

'আগে এসো মূর্তিপূজকের দল। তোমাদের মৃতদের লাশ উঠিয়ে নিতে এসো। এসো যদি হিম্মত থাকে। নিয়ে নাও ওদের ঘোড়াগুলো।'

দাহিরের বাহিনীর যখমী ঘোড়া আর যখমী বাহিনী ময়দানে কাতরাচ্ছিল। বিন কাসিম কিছু বাহিনী দ্বারা ঘোড়াগুলো নিয়ে নিলেন। এখানে বেশ কিছু ঘোড়া তারা কব্জা করলেন।

রাজা দাহিরের চোখে বিদঘুটে আঁধার। তিনি উন্মাদপ্রায়। চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ধরিত্রী মাতার সন্তানেরা এ মুসলমানদের ডান-বাম থেকে ঘিরে কচুকাটা করো। আমি ওদের মাথার খুপড়ি নিয়ে খেলব।'

দাহিরের কাছে বিপুল পরিমাণ সৈন্য থাকায় তিনি গোটা এলাকায় তাদের জালের মত ছড়িয়ে দিতে পারতেন। এক্ষণে করলেনও তাই তবে রাজা দাহিরের বাহিনীতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। নিছক সংখ্যাধিক্যেই তিনি জয়লাভ করতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু বিন কাসিম ছিলেন বুদ্ধি ও কৌশলের প্রতীক। তিনি ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন একে একে। সৈন্য বাহিনীর শোরগোলের মাঝে তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, 'কুফর শ্রেণী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। ওদের কোন সঠিক লক্ষ্য নেই। বেছে বেছে তোমরা ওদের কচুকাটা করো।'

সালারের এই জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে মুজাহিদ বাহিনীর মনে নব জোয়ার দেখা দিল। তারা নিজেদের রণব্যূহে বিশৃঙ্খলার রেশ টানতে দিলেন না। মুসলিম সেনানায়করা দুশমনের বিশৃঙ্খলার পুরোপুরি ফায়দা ওঠালেন। আচমকা তারা প্রচন্ড গতিতে হামলা করলেন। দুশমনের কাছে এ হামলা অপ্রত্যাশিত ছিল।

রাজা দাহির দূরদর্শী হয়েও তার বাহিনী এমন বিশৃঙ্খল হলো কেন– এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হয়েছে ইতিহাস। তার বাহিনী কোন অংশেই তদানীন্তন রোম-ইরানের বাহিনীর চেয়ে কম যুদ্ধবাজ ছিল না। এমনকি হস্তিবাহিনীও তার অনর্থক প্রমাণিত হয়েছিল সেদিন।

পরিণতিতে যা হবার হোল। দাহির বাহিনী পিছপা হতে লাগল। এ দৃশ্য দাহিরের কাছে ছিল বেদনাদায়ক। তিনি সর্বপেছনে রিজার্ভ বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিলেন। এ বাহিনীও সংখ্যায় দু'হাজারের ওপরে। তিনি এর মধ্যে থেকে চারশ' সেপাইকে নির্বাচন করে ময়দানে চলে এলেন। সকলেই বর্মাচ্ছাদিত। তলোয়ার ছাড়াও বর্শা তাদের হাতে। কারো কারো কাছে ঢালও ছিল। রাজা দাহির হাতির পিঠে। রং সাদা। দাহিরের হাতে সুতীক্ষ্ণ ত্রিফলা। তদ্দ্বারা তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে আঘাত করে যাচ্ছিলেন।

এ দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাতি মোকাবেলায় পৃথক বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। তিনি দাহিরকে ঘেরাও করে যমালয়ে পাঠানোর জন্যও চার জানবায নিয়োগ করেছিলেন। এই চার মুজাহিদ আত্মগোপন করে ছিলেন। চারশ' সওয়ার পরিবেষ্টিত অবস্থায় দাহির যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। রাজা তাদের পাশে থাকায় সবাই লড়ে যাচ্ছিল। মুজাহিদবৃন্দের বেশ ক্ষতি হলো এ সময়।

ময়দানের চার দিকেই একটা ঘোষণা শোনা গেল, মহারাজ স্বয়ং রণাঙ্গণে হাযির। মহারাজ আরব বাহিনীকে কচুকাটা করছেন। হিন্দুরা রাজাকে রণাঙ্গনে লড়তে দেখল। এতে তাদের কিছুটা সাহস হল। মুজাহিদবৃন্দ প্রচণ্ড হামলার সম্মুখীন হলো। এ সময় মুসলিম বীর শুজা হাবশী ঘোড়া দাবড়ে বিন কাসিমের কাছে এসে বললেন, 'সালারে মুহতারাম! দাহির ও তার হাতিকে যখমী না করা পর্যন্ত আমার ওপর খানাপিনা ও নিদ্রা হারাম। আমি দাহিরের মাথা কেটে আনব না হয় শহীদ হব।'

তিনি সালারের কোন পরবর্তী নির্দেশনার অপেক্ষা না করে যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই চলে গেলেন এবং হাজার সৈন্যের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বিন কাসিমের সওয়াররা দাহিরের চারশ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন পুরোদস্তুর। শুজা হাবশী দাহিরের হস্তি পর্যন্ত পৌঁছার মওকা পেয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর ঘোড়া হাতির উগ্রমূর্তি দর্শন করে কুর্দন শুরু করে দিল। ঘোড়ার মোড় পরিবর্তন করলেন তিনি। আবার হাতির দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু এবারও তাঁর ঘোড়া পূর্ববৎ দে-দৌড়।

দাহির বাহিনী মুজাহিদ বাহিনীর ওপর মরণ কামড় বসানোর নেশায় রাজার দেহরক্ষার দিকে তেমন একটা নযর দিতে পারছিল না। শুজার মাথায় পাগড়ী ছিল। তিনি পাগড়ী খুলে ফেললেন। ঘোড়ার লাগাম কষলেন । দ্রুত পাগড়ী দ্বারা ঘোড়ার চোখ বেঁধে ফেললেন। এবার ঘোড়া লাগামের নিয়ন্ত্রণে চলতে লাগল।

তিনি হাতির পেছন দিক দিয়ে ঘোড়া নিয়ে গেলেন। এরপর আচমকা হাতির মাথার দিকে এসে দাহিরের হাতির শুঁড় কেটে ফেললেন। শুঁড় পুরো না কাটলেও বেশ ক্ষতের সৃষ্টি হল। দাহির তার ধনুক বাঁকালেন। একটি তীর এই অকুতোভয় মুজাহিদের গরদানে গেঁথে গেল। এই তীর-ই তাঁকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। আল্লাহর বান্দা তৎক্ষণাৎ জান্নাতে চলে গেলেন।

আচমকা যুদ্ধের মোড় বদলে গেল। খুব সম্ভব এটা রাজা দাহিরের আহ্বান কিংবা তার কমাণ্ডারদের মুসলমানদের থেকে আত্মরক্ষায় সর্বশেষ হামলার কারণে হল। মুসলমানরা নয় দিন লাগাতার লড়াই করছে। রিজার্ভ বাহিনীতে দাহিরের বেশ কিছু তাজাদম ফৌজ ছিল। এবার দাহির শেষ কামড় দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হিন্দুদের এই আচমকা হামলায় মুসলমানদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে গেল। তাদের রণব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হাতি তাদের জন্য বিভীষিকার রূপ ধারণ করল। দাহির তার নিজস্ব ধনুকে বারংবার ছিলা টেনে যাচ্ছিলেন। মৃত্যু অবধারিত জেনেই দাহিরের এই তীর নিক্ষেপ। এক্ষণে তিনি অধীনস্থ সালারদের পরামর্শেরও পরওয়া করলেন না।

বিন কাসিম পরিস্থিতির প্রতি গভীর নযর বুলিয়ে বজ্র কঠোর স্বরে বললেন, 'মুজাহিদীনে ইসলাম! আমি তোমাদের সিপাহ সালার মুহাম্মদ বিন কাসিম এখনো জীবিত। আছি তোমাদের সাথেই। লড়ে যাচ্ছি। খবরদার! তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। মনে ভয়ডর রেখো না।'

ঠিক এ সময় বিশ্বনাথের পুত্র মুকু তার লোকজন নিয়ে বিন কাসিমের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মুকু জানতেন, বিন কাসিম পরাজিত হলে দাহির তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে ফেলবে। মুসলমানদের বিজয়-ই এক্ষণে তার বাঁচার উপায়।

মুকুকে দেখে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। তিনি আরেকবার সৈনিকবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'খুররম ইবনে মাদানী কোথায়? কোথায় মুসআব? কোথায় আমার জানবায সাথীরা? আমার দেহরক্ষী, তীরন্দায তোমরা কৈ? তোমরা ইসলামের মুহাফেয। সকলে প্রাণ দিয়ে লড়।'

এই জ্বালাময়ী ভাষণ সৈন্যদের মনে জাগরণ আনল। মুজাহিদবৃন্দ ময়দানে কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। মুকুর তাজাদম বাহিনী ওই শূন্যস্থান পূরণ করল। উপ-সেনাপতিরা স্ব স্ব বাহিনীকে জড়ো করলেন। মুকুর ফৌজ ও মুজাহিদবৃন্দ আবার নব উদ্যমে সম্মিলিত হামলা চালালেন।

হিন্দুরা এবার পড়ে গেল গ্যাড়াকলে। তুমুল রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হল। বিন কাসিম সৈন্যদের সতর্ক করে বললেন, হিন্দুরা পালালে বিশাল ভারতবর্ষে তারা আশ্রয় ও মদদ পাবে। কিন্তু আমরা পালালে মৃত্যু আলিঙ্গন ছাড়া গতি নেই। এ দেশ কাফেরদের। সুতরাং মুসলমানদের এবারের হামলা জীবন মৃত্যুর।

এক্ষণে বিন কাসিম হাতিয়ার পরিবর্তন করলেন। কামান প্রস্তুত করা হল। ওইগুলো এবার সিন্ধুর এই রণাঙ্গণে হুংকার মেরে ওঠল।

কামানের ছোঁড়া পাথরে হাতিগুলো মারাত্মক যখমী হলো। এগুলোর শক্তি শেষ। এর ওপর বিন কাসিম অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। এতে বেশ কিছু হাতির হাওদায় আগুন লেগে গেল। বিন কাসিম বাহিনী মাহুতবিহীন হাতিগুলো তীর বর্শায় ঝাঁঝরা করে দিল। তারা হাতি পাকড়াও করার চেষ্টা করলেন না। কেননা, এগুলো তাদের কোন কাজে আসার মত বস্তু নয়।

॥ দশ ॥

বাঁচার জন্য আত্মরক্ষায় লেগে গেল দাহির বাহিনী। কিন্তু আত্মরক্ষার মওকা হল না। কচুকাটা হতে লাগল হিন্দু বাহিনী। দাহিরের সামনে শুধু মৃত্যু বিভীষিকা। তিনি মাহুতকে মুসলিম রণব্যূহে ঢুকে পড়তে বললেন। তীর-বর্ষা হাতে নিয়ে সমানে আক্রমণ চালাতে থাকেন। তিনি বদ্ধ উন্মাদ বনে গেছেন। হাওদার উপর তার দেহ বারবার লাফিয়ে ওঠছে। তার হাওদায় যে দু'যুবতী মদ পরিবেশন করত, হাতিতে তারা স্থির থাকতে পারল না।

বিন কাসিমের তীরন্দায বাহিনীর টার্গেট ছিল দাহিরের সাদা হাতি। অকস্মাৎ একটা অগ্নিবাণ তার হাওদায় এসে পড়ল। মুহূর্তে হাওদায় আগুন লেগে গেল। হাতিটার দেহে রেশমী ঝালর। দাউ দাউ করে আগুন লাগল তাতে। মাহুত হাতি থেকে লাফ মারল। কিন্তু দাহির হাওদায় বসা তখনও। মনে হচ্ছে জীবন্ত জ্বলে যেতে চাচ্ছেন তিনি।

উভয় যুবতী আর্তনাদ করছিল। দাহির এদেরকে হাওদার থেকে নীচে ফেলে দিলেন। চলন্ত ঘোড়ার মুজাহিদ বৃন্দ এ দু'যুবতীকে উঠিয়ে নারী শিবিরে পাঠাল।

আগুনে হাতির চামড়া ঝলসে যায়। নিকটেই ঝিল। হাতিটি দ্রুত ওই ঝিল লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে। মুজাহিদ বৃন্দের তীর বৃষ্টির মাঝেই হাতিটি ছুটে যাচ্ছিল। ঝিলের পানিতে সে শুঁড় নামিয়ে শান্তি পেতে চেষ্টা করে। শুঁড় দিয়ে পানি দেহে ছিটায়।

সূর্য ডুবেছে তখন। হাতি গিয়ে উপনীত হলো ঝিলের ওপারে। ক'জন মুজাহিদ হাতিটি ঘিরে নিল। দাহির তলোয়ার বের করেন। একাই সকলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত জনৈক মুজাহিদের তরবারির একটি কোপ তার গর্দানে পড়ে। আঘাতের তীব্রতায় তার মাথা দেহ থেকে ছিটকে পড়ে। ইবনে কালবী নামী তমীমের এক মুজাহিদ দাহিরকে বধ করেন বলে ফতুহুল বুলদান প্রণেতা মত ব্যক্ত করেন।

॥ এগার ॥

রাতের আঁধার ছেয়ে যায় ময়দানে।

যুদ্ধের তীব্রতায় উত্থিত ধুলো সেই আঁধার আরো জমকালো করে তোলে। দাহিরের সমরশক্তি তখন শেষ। তার অবশিষ্ট ফৌজ রাওড় কেল্লাপানে ছুটল। দু'তিন সালারকে বিন কাসিম এই কেল্লায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেন। তিনি এদেরকে কেল্লায় প্রবেশের সুযোগ দিয়ে আরেকটা লড়াই করতে রাজি নন।

বিন কাসিমের একদল রাওড় কেল্লায় উপনীত হন। কেল্লার ফটক খোলা। কেননা, পরাজিত হিন্দু বাহিনী তখনও রণাঙ্গন থেকে আসছে।

এদিকে দাহির বধের খবর পেয়ে শাবান ছাকাফী লাশের সন্ধানে গেলেন। কিন্তু লাশ নেই। এক সেপাই সেখানে একজন পুরোহিত এসেছিল বলে জানাল। সন্ধান করে সেই পুরোহিতকে ধরে আনা হল। তাকে জিজ্ঞাসার পর সে বলল—

'আমরা আপনাদের অনেক মহানুভবতার কাহিনী শুনেছি। আমি মিথ্যা বলব না। তবে একটা শর্তে। তাহল, আমার বউ-বাচ্চাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে।'

'মেনে নিলাম এ শর্ত। বলুন।' শাবান বললেন।

'সন্ধ্যার দিকে জেনেছি দাহির মারা গেছেন। আমাকে বলা হয়েছে, দাহিরকে কোথায় কিভাবে চিতায় পোড়ানো হবে। আপনারা হয়ত জানেন, আমরা মৃতদের পুড়িয়ে থাকি। আর এ তো মহারাজ দাহিরের লাশ। সাধারণ লাশের মত কি পোড়ানো যায়? আপনাদের ফৌজ ওখানে ছিল। লাশকে আমি এখানে কাদামাটির মধ্যে পুঁতে ফেলতে বলি। মুসলমান জাতি এখান থেকে চলে গেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পরামর্শ দেই। চলুন! স্থানটি দেখবেন।'

শাবান ছাকাফী বিন কাসিমকে খবর দিলে তিনি এসে পড়েন। কাদামাটি থেকে লাশ উত্তোলন করা হোল। যখমে দাহিরের চেহারা জর্জরিত। দাহিরের মাথা মাঝখান দিয়ে চেরা।

দাহিরের হাওদার দু'যুবতীকেও লাশ দেখানো হলো। তারা এ লাশ দাহিরের বলে সত্যায়ন করল।

'ওর মাথাটা নিয়ে নাও।' বিন কাসিম বললেন, এ মাথা হাজ্জাজের কাছে পাঠানো হবে। ওর পুত্র জয় সিংহ কোথায়?'

'পূর্বেই সে ভেগেছে। ব্রাহ্মণাবাদ গেছে।' বললেন পণ্ডিত মশাই।

ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতান জয়

॥ এক ॥

'মুহাম্মদ বিন কাসিম' এ নাম শুনলেই অত্যাচারী হিন্দু রাজাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। তিনি আসছেন শুনতেই দুর্ভেদ্য কেল্লার প্রহরীদেরও দম রুদ্ধ হয়ে যেত। কেল্লাবাসীরা কোন প্রকার মোকাবিলার চিন্তাও করতে পারত না। সংশ্লিষ্ট শহরবাসীদেরও জানা হয়ে গিয়েছিল তা। এই বিভীষিকার শুরুটা পশ্চিম সিন্ধু উপকূলবর্তী তামাম কেল্লা দখলের পরই হয়েছে।

হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বিন কাসিমের চরিত্রে এই বলে কালিমা লেপন করেছেন যে, তিনি কারো প্রাণভিক্ষা দিতেন না। অত্যাচারী জালিমের বেলায় এটা মিথ্যা নয়। তবে নিরপরাধ লোককে তিনি কোন দিনও হত্যা করেননি। বিদ্রোহী ও জালিমদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কঠোর। বেসামরিক লোক ও বিজিত শহরের লোকদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতেন তিনি। দেবল, নিরূন, সিস্তান এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

রাজা দাহিরের মাথা নিয়ে রাওড় কেল্লায় প্রবেশ করার পর তিনি গোয়েন্দাদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট নেন। ওই রিপোর্টে প্রকাশ, বেশ কিছু হিন্দু অফিসার জয় সিংহকে ব্রাহ্মণাবাদ যেতে পরামর্শ দেন। ওখান থেকে কিছু ঠাকুরও রাওড় এসেছিলেন।

এদিকে জয় সিংহ রাওড় থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণাবাদের বড় মন্দিরে উপস্থিত হলে পন্ডিত, পুরোহিতগণ তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ায়। জয় সিংহ এদের কাছে জানতে চান,

'তোমরাই না মহারাজকে লড়াইয়ের শুভ মুহূর্তটির কথা বাতলে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, রাজকুমার!' জনৈক পন্ডিত উত্তর দেন।

'তোমরা এও বলেছিলে, রাজা মহাশয়ের জয় অনিবার্য।'

'বলেছিলাম রাজকুমার!' বড় পন্ডিতদের উত্তর।

'তোমরা কি শোননি, মহারাজের কেবল পরাজয়ই হয়নি; বরং তিনি মারা গেছেন? এক্ষণে তোমরা বেঁচে থাকার আশা করতে পার কি? তোমরা মিথ্যা বলেছিলে। মহারাজকে ধোঁকা দিয়েছিলে।

'রাজকুমার, অভিপ্রায় এমনটা হলে আমরা আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। কিন্ত মহামান্য রাজকুমার, তলোয়ার আমাদের গর্দানে ওঠানোর পূর্বে জেনে নিন,

মহারাজের প্রতি দেবতাদের ক্রোধ আপতিত হয়েছে, সেই ক্রোধের শিকার আমরাও। আজ আমাদের শহর ও কেল্লাসমূহে মুসলিম সেনার অশ্ব বাঁধা।'

'কেমন ক্রোধ?'

'যে নারী-পুরুষ একই মায়ের উদর থেকে জন্মগ্রহণ করে তারা স্বামী-স্ত্রী হতে পারে না। মহারাজ তার আপন বোনকে বিবাহ করেছিলেন।'

'কিন্তু তারা স্বামী-স্ত্রীর মত ব্যবহার করতেন না।'

বড় পন্ডিত কিছু বলার পূর্বেই নেপথ্যে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে ওঠল। সেই কণ্ঠে ঝংকৃত হলো, 'হ্যাঁ! আমরা স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতাম না।'

সকলে পেছনে ফিরে তাকাল। নারীমূর্তি দেয়াল ও খামের আড়ালে লুকানো ছিলেন। এক সময় সামনে এলেন। বললেন, 'হ্যাঁ! আমরা অন্য স্বামী-স্ত্রীর মত এক বিছানায় শুইনি কোন দিনও। তবে আমার ভাই আমার যৌবনকে নিজ হাতে খুন করেছে। তার ভয় ছিল আমার বিবাহ অন্য কারো সাথে হলে তিনি রাজত্ব হারাবেন এবং বনবাসে যাবেন। কিন্তু ভাই আমার সেদিন যদি মন্দিরে আমার বলিদান করে হরেকৃষ্ণের পা ধোয়াতেন সেটাই ভাল হত। কিন্তু তা না করে বিষাক্ত ধারালো ছোরা দ্বারা আমার যৌবনকে তিনি কেটেছেন। তোমরা যারা ধর্মের ঠিকাদার তারা মহারাজকে ওই অধর্ম থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করোনি। রাজত্ব বাঁচাতে গিয়ে মহারাজ আমার যৌবন জলাঞ্জলি দিয়েও আপনার রাজত্ব বাঁচাতে তো পারেন-ই নি, উপরন্ত নিজেও মরেছেন।'

'হ্যাঁ!' বড় পন্ডিত বললেন, 'আমরা রাজকুমারের সাথে একথা-ই আলোচনা করছিলাম। ওই ক্রোধ সিন্ধুতে পড়েছে। যদ্দরুন আজ সর্বত্র রক্তের বন্যা।'

'এখন কি করা? নতুন কোন যুবতীকে বলিদান করতে হবে কি? বলুন তাহলে ব্রাহ্মণাবাদের সমস্ত যুবতীদের মন্দিরে হাজির করি।' রাজকুমার বললেন।

মায়ারাণী বললেন, 'না। এগুলো সব ভাওতাবাজি। অসংখ্য নিষ্পাপ যুবতী খুন করা হয়েছে। আজ থেকে সিন্ধুতে কোন কুমারীর বলিদান হবে না।'

'রাণী!' জয় সিংহ গর্জে ওঠলেন, 'লড়াই ও মৃত্যু আমাদের কাজ। তুমি স্রেফ অবলা নারী। তোমার হুকুম এখানে চলবে না।'

'এখন থেকে কারো হুকুমই চলবে না। মহারাজের মৃত্যুর পর আমিই সিন্ধুর রাণী।' মায়ারাণী বললেন।

'এর পূর্বে আমার তলোয়ার তোমার মাথাকে স্ব-স্থানে রাখবে না। আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।' জয় সিংহ রাণীকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে বললেন। দু'তিন জন সেপাই মায়ারাণীকে টেনে নিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

রাজকুমার যখন মায়ারাণীকে ধমকি-হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের মাথা কেটে যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশসহ দরবারে খেলাফতে প্রেরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে বিন কাসিম হাজ্জাজের কাছে লেখা পত্রে বলেন–

'আল্লাহর অপার করুণা ও আপনার দিক নির্দেশনার বদৌলতে সিন্ধু সর্পের উদ্যত ফণা চূর্ণ করেছি। ইসলাম পথের সবচে' প্রধান বাধা ও আরব বিজয়ের স্বপ্নদ্রষ্টার কর্তিত মাথা প্রেরণ করলাম। আপনি এজাযত দিলে আমি ব্রাহ্মণাবাদে কোচ করব। জয় সিংহ ওখানে আত্মগোপন করে আছে এবং আমার বিরুদ্ধে সৈন্য যোগাড় করছে। ওখানে বেশ কিছু কেল্লা আছে যা খুবই দুর্ভেদ্য। ওগুলো কব্জা করা আমার জন্য খুবই জরুরী।

যাকেই আপনি এ সুসংবাদ শোনাবেন তাকেই আমার আগামী অভিযানগুলোর জন্য দোয়া করতে বলবেন।

যথাসময়ে কাব ইবনে মাখারেক এই পত্র ও মালে গনীমতমহ কুফায় প্রবেশ করেন। হাজ্জাজ কুফায় ছিলেন। যদিও এগুলো কুফায় না এসে দিমাশ্‌কে যাওয়ার কথা। কেননা দিমাশ্‌কই তদানীন্তন মুসলিম খেলাফতের রাজধানী। কিন্তু হাজ্জাজের খুব দাপট প্রভাব ছিল। খলীফা এই প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

গভর্ণর হাউজের বাইরে জনতার শোরগোল শুনে হাজ্জাজ বেরোলেন। তাকে বলা হয়, সিন্ধু থেকে মালে গনীমত এসেছে। তিনি দৌড়ে কাবকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হাজ্জাজ কুফাবাসীকে বড় মসজিদ চত্বরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। যোহরের নামাযের সময় কুফা মসজিদ চত্বরে মানুষের ঠাঁসা ভীড়। নামাযের পর দাহিরের মাথা বর্শা ফলকে গেঁথে উঁচিয়ে ধরলেন। বললেন, 'কুফাবাসী! এ সেই মহাপাপীর মাথা যে আমাদের বধূ-কন্যাদের দেবলে বন্দী করে রেখেছিল। সরন্দ্বীপের জাহাজের যাবতীয় মালামাল ও মুসাফিরদের আটকে রেখেছিল। আত্মগর্ব ও অহমিকাবোধ তাকে আমাদের কথা মানবার সুযোগ দেয়নি। এ বিজয় তোমাদের দোয়ার সুফল। এই দোয়া তোমরা চালিয়ে গেলে আগামী দিনেও বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। তোমাদের সেনাপতির বাহিনী কমে গেছে, এখন তাজাদম সেপাই দরকার। তোমরা কি ওই মহান অভিযানে শরীক হতে চাও? সিন্ধুতে যখমী মুজাহিদবৃন্দ তোমাদের পথ চেয়ে। তোমরা না গেলে মুজাহিদবৃন্দের মন ভেঙ্গে যাবে। তোমরা কি চাও সংখ্যাল্পতার দরুন আমাদের বাহিনী পরাজিত হোক?'

হাজ্জাজের কথার মাঝখানেই সমবেত শ্রোতা বলে ওঠল, 'লাব্বাইক, লাব্বাইক, আমরা রাজি, আমরা যাব।'

হাজ্জাজ মালে গনীমত খলীফা ওয়ালিদের কাছে প্রেরণ করলেন।

খলীফার কাছে দেয়াপত্রে লেখলেন, সিন্ধু অভিযান আপনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু আপনার পছন্দ অপছন্দের ধার না ধেরে নিজস্ব দায়–দায়িত্বে আমি বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। আপনার ভুলে যাবার কথা নয়, আমি ওয়াদা করেছিলাম– যে ব্যয়ভার এতে হবে এর দ্বিগুণ আদায় করব। এই অঢেল মাল-সম্পদ আমার ওয়াদা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আমার সবচে' কম বয়স্ক ভাতিজা ইসলামের সবচে' বড় দুশমনের দম্ভমস্তক চূর্ণ করে ছেড়েছে। সেই জালিম শাহীর মাথা সে আপনার পদতলে বিসর্জন দিয়েছে। এ সেই পাপাত্মা যে খোদার একত্ব ও নবী মুহাম্মদের রেসালত গ্রহণ না করে তাদের সাথে দুশমনী করেছে।'

তিনি বিন কাসিমের জয়ের ফিরিস্তি ও সম্ভাব্য অভিযানেরও বিস্তারিত তাঁকে জানালেন।

দিমাশ্‌কের মানুষ বিন কাসিমকে বাহ্‌বা দিল। তারা তরুণ সেনাপতির বিজয় আন্তরিকভাবে মেনে নিল। গোটা দিমাশ্‌কে কেবল বিন কাসিমের স্তুতিগান।

কেবল একটি মাত্র লোক এই বিজয়ে খুশী–অখুশী প্রকাশ করলেন না। তার চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ। এই গাম্ভীর্য গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। বিন কাসিমের বিজয় সাফল্যে তার গোমরা মুখ দেখে মনে হত, এই বিজয়োল্লাস তার কলিজায় ছুরিকাঘাত করছে।

খলীফা ওয়ালিদের ছোট ভাই এই লোক। সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক তার নাম।

বর্শা ফলকে দাহিরের মাথা গেঁথে পুরো দিমাশ্‌কে ঘোরানো হল। এরপর সিন্ধ সম্পর্কে খলীফার মনে আর কোন সংশয় থাকে না। তিনি এই অভিযানে পুরো দস্তুর সাহায্য করতে থাকেন।

॥ তিন ॥

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ ঘেরাও করলেন। বেশ ক'মাস ধরে অবরোধ চললেও কেল্লা থেকে কোন প্রকার হামলা কিংবা সন্ধি প্রস্তাব এলো না। মনে হচ্ছিল, এই অবরোধ তাদের মাঝে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। আচমকা একদিন অপরাহ্নে কেল্লার দরোজা থেকে পঙ্গপালের মত ফৌজ বেরিয়ে এলো। এদের সামনে দশ বার জন লোক ঢোল পেটাচ্ছিল। অতি দ্রুত বিভিন দরোজা থেকে বেরিয়ে এরা জঙ্গী কাতার করল এবং মুহূর্তেই মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে মুজাহিদ বাহিনী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এই নির্ভীক হামলা তাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত।

বিন কাসিম বুদ্ধিমত্তার সাথে এদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করলেন। কিন্তু সন্ধ্যা আঁধারীতে ঢোলবাদ্যের অনবরত আওয়াজে দুশমনের যে যুদ্ধক্ষুধা তা নিবারণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল তাকে। শেষ পর্যন্ত দুশমন পিছু হটে কেল্লায় চলে গেল। মুসলমানরা এদের পিছু ধাওয়া করলে কেল্লা থেকে নেমে এল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। তারা বাধ্য হলো ছাউনিতে ফিরে যেতে।

রাতে মুহাম্মদ বিন কাসিম সালারদের সাথে বৈঠকে বসে দুশমনের এই নয়া রণকৌশলের ব্যাপারে মত বিনিময় করলেন। তিনি বললেন, 'হিন্দুরা চাচ্ছে আমরা যেন কেল্লা অবরোধ উঠিয়ে নেই। ওরা ময়দানে লড়তে চায়। ওদের এ খায়েশ আমরা অপূর্ণ রাখব না। আপনাদের বয়স ও অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশী। আমি সকলের পরামর্শের শ্রদ্ধা করছি। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের বাহিনী খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত হলেও তাদের জেহাদী প্রেরণা ক্লান্ত নয়। অবশ্য রক্ত-মাংসের দেহ, একদিন না একদিন ভেঙ্গে পড়বেই। আর দুশমনের এই কেল্লা থেকে অবরোধ ওঠানো যাবে না। অবরোধ ওঠানোর অর্থ হলো, আমরা তাদের রসদ ও বাহিনী যোগাড়ের পথ খুলে দিচ্ছি। জয় সিংহ কেল্লায় নেই। খুব সম্ভব প্রতিবেশী, রাজা, জমিদার ও রাজপুত্রদের কাছে সে মদদ চেয়ে বেড়াচ্ছে। এবার সে একাকী আসবে না-ফৌজ নিয়ে তবে আসবে। দেখলেন এই বাহিনীর যুদ্ধশখ কতটা তীব্র।'

'ইবনে কাসিম!' বিন কাসিমের বাপের বয়সী বয়োবৃদ্ধ এক সালার বললেন, 'এ ধরনের যুদ্ধ প্রেরণা খুব জলদি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। কাজেই তুমি এতে পেরেশান হয়ে থাকলেও ভগ্নোৎসাহ হতে যেও না। আল্লাহ আমাদের অপেক্ষা তোমাকে অধিক অভিজ্ঞতা দান করেছেন।'

'রাতে কামানের পাথর ও অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলে কেমন হয়?' বললেন আরেক জন। 'না। এটা বড় শহর। এ জনবহুল শহরকে বিরান বসতিতে পরিণত করতে চাই না। এতে বহু নারী-শিশু মারা পড়বে। পাথর ও অগ্নিবাণ নিক্ষেপ সেখানেই চলে যেখানে অবরোধ দীর্ঘ হয় এবং দুশমন আমাদের ক্ষতি সাধন করে। এখানে সে পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি হয়নি। দেখা যাক দুশমন কতদিন জমে লড়তে পারে।

পরদিনও ব্রাহ্মণাবাদের বাহিনী ওই একই কায়দায় হামলা চালায়। প্রথম সারিতে ঢোলকদের একদল আর পেছনে সশস্ত্র বাহিনী। দুশমন কেল্লা প্রাচীরের কাছে থেকেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বেশী দূর এগুত না তারা। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক পদাতিক বাহিনীকে এদের মোকাবেলায় আগে বাড়ালেন। যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করলে তিনি পদাতিক বাহিনীকে ইচ্ছাকৃত এভাবে পেছনে টেনে আনলেন যেন মনে হয় তারা দুশমনের আক্রমণের ধকল সহ্য করতে পারছে না। ওদিকে দুশমন এই কৌশলে ধরা দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তারা কেল্লা থেকে যে দূরে চলে আসছে তা ঠাহরও করতে পারেনি। বিন কাসিম দুশমনকে ফাঁদে ফেলেই সওয়ারদের দিকে ইশারা করলেন। এবার শুরু হলো মুসলমানদের চিরুনি অভিযান। হিন্দুরা কচুকাটা হতে লাগলো। পালানোর জায়গা নেই। মুসলমানরা

চারদিক থেকেই তাদের ঘিরে নিয়েছে। এ সময় কেল্লা থেকে একশ' সওয়ার বের হয়ে কোনক্রমে তাদের অবরুদ্ধ বাহিনীর অবশিষ্টদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু এর আগেই লাশে ভরপুর হয়ে যায় যমীন। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত এ লড়াই চলে। মুসলমানরা শহীদদের লাশ দাফন ও যখমীদের চিকিৎসা শিবিরে পাঠায়।

॥ চার ॥

এ সময় আচমকা রাতের বেলা মুসলিম শিবিরে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে এসে জনাচারেক হিন্দু সেপাই ধরা পড়ল। এদের কাছ থেকে জানা গেল, জয় সিংহ ব্রাক্ষণাবাদের-ই কোন এক অঞ্চলে লুকিয়ে আছে। পরদিন সকালে মুকু ও ক'জন সালারের নেতৃত্বে একদল ফৌজ পাঠালেন বিন কাসিম। এদের সাথে ওই চার কয়েদীকে দেয়া হলো। এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল।

সূর্যাস্তের পর পরই এরা রওয়ানা হল। ব্রাক্ষণাবাদের উপকণ্ঠে পৌঁছতেই দু'সওয়ারকে দেখা গেল। এরা মুসলিম বাহিনীকে দেখামাত্রই ঘোড়া দাবড়াল। মুকু এদের পেছনে চার জন সওয়ার পাঠান। কিন্তু এরা ওদের নাগাল পেল না। এদেরকে বেশী দূর পশ্চাদ্ধাবন করতে নিষেধ করা হয়। তাদেরকে জয় সিংহের চর মনে করে মুজাহিদবৃন্দ তাড়াতাড়ি চলতে থাকেন। বিশেষ এই বাহিনী দ্রুত কয়েদীদের নিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার দিকে এগিয়ে চলেন। দিন শেষ হয়ে এলো। জয় সিংহের ঘাঁটি তখনও বেশ দূরে। পরদিন সকাল নাগাদ পৌঁছুবার কথা।

রাতভর সফর চলল। সকালে তারা এমন এক প্রান্তরের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন যেখানে সেনা ছাউনি ছিল বলে বোঝা গেল। খীমার গোঁজ ওঠানোর নিদর্শন লক্ষ্য করা গেল। ঘোড়ার পায়ের ছাপ দ্বারা বুঝতে পারা গেল। কোথায় গেছে এরা। পথিমধ্যে কিছু স্থানীয় জনতার মাধ্যমে জানা গেল, শেষ রাতে একদল ফৌজ এখান থেকে ছাউনি তুলে নিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা এও জানত যে, দাহির-পুত্র জয় সিংহের বাহিনী এরা। সময় ও দূরত্বের বিবেচনায় এদের পশ্চাদ্ধাবন অনর্থক মনে করে তারা ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত ব্রাক্ষণাবাদ শহর নিশ্ছিভাবে ঘেরাও করা হলো। দীর্ঘ ছয় মাস এই ঘেরাও থাকল। বিন কাসিমের বাহিনী ছাউনিতে থেকে কেল্লার প্রতি কড়া নযর রাখছিল। তারা দেয়াল ও শহর রক্ষা প্রাচীর ছিদ্র করার চিন্তা করছিল। তবে পূর্বে দরকার কেল্লায় পাথর ও অগ্নিবাণ নিক্ষেপণ। কিন্তু বিন কাসিম শহরবাসীর ক্ষতি হয় মনে করে এ কাজ থেকে বিরত থাকলেন।

একদিন তিনি সিন্ধিভাষী তিন লোকের মাধ্যমে তিনটি চিরকুট লেখালেন। এগুলো তীর ফলকে বেঁধে দিলেন। রাতের বেলা শহর রক্ষা প্রাচীরের কাছে গিয়ে তা ঘন বসতি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হল। তিনটা তীরের ভাষ্য একই। এতে লেখা ছিল,

বেসামরিক লোকজন যেন কেল্লার দরোজা খুলে দেয়, নতুবা আমরা শহরে পাথর ও অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করব। শহরবাসী আমাদের মদদ করলে কেল্লা বিজয়ের পরে তাদের ওপর কোন জুলুম করা হবে না। তাদের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হবে।

এর ঠিক তিন দিনের মাথায় দু'লোক মুসলিম ছাউনিতে এলো। রাতে তারা কেল্লা থেকে বেরিয়েছে বলে জানাল। তারা বলল, 'ওই সময় কেল্লা থেকে বেরোনো সহজ নয়। কিন্তু শহরের প্রভাবশালী কিছু লোক ও বড় মন্দিরের পুরোহিত দরোজার পাহারার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের বের হবার সুযোগ করে দেন। আপনারা আমাদের জীবন ভিক্ষা দিন। বিগত ছ'মাসে শহরে দুর্ভিক্ষ পড়েছে। আমরা এক বেলা খেলে দু'বেলা না খেয়ে কাটিয়েছি। এক্ষণে জলেরও অভাব। অসংখ্য শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। যে ফৌজ ইতঃপূর্বে আপনাদের ওপর আচমকা হামলা চালিয়েছিল, তারা সকলে মারা গেছে না খেয়ে। আপনাদের নিক্ষিপ্ত তীরের বার্তা শহরবাসী জেনে গেছে। মুসলমানরা তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেবে বলে তারা ধরে নিয়েছে।'

দু'দিন পর কেল্লা ফটক খুলে গেল। বিন কাসিম এর-ই অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর ইশারায় মুজাহিদবৃন্দ হিন্দু সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরা গবাক্ষ পথে পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী কেল্লায় ইসলামী নিশান ওড়াল।

॥ পাঁচ ॥

বিন কাসিম যখন ব্রাহ্মণাবাদ শহরে প্রবেশ করেন তখন গভর্নর মহলে তুলকালাম কান্ড। এক লোক এসে দাহিরের অন্যতম উজীর সিয়াকরকে খবর দেয় যে, মুসলিম বাহিনী ব্রাহ্মণাবাদ কেল্লায় ইসলামী নিশান উড়িয়েছে। তিনি বলেন,

'এ হতেই পারে না। এক্ষণে ষষ্ঠীর চাঁদ উঠেছে। এ সময় মুসলমানরা কেল্লা প্রাচীরের কাছেই আসতে পারে না। ওরা তো এখন শ্রান্ত–ক্লান্ত।'

'মহারাজ!' আরেক লোক তাকে বললো, 'রাণীকে পলায়নের সুযোগ করে দিন।'

'রাণী ঘুমুচ্ছেন। মুসলিম বাহিনীকে নযরে না দেখা পর্যন্ত তাকে জাগ্রত করব না।'

এ রাণী রাজা দাহিরের আরেক স্ত্রী লাডি। লাডি অনিন্দ্যসুন্দরী। দাহির যখন নিহত হন তখন সে অষ্টাদশী। তার প্রতি দাহির খুবই আকর্ষিত ছিলেন। স্রেফ স্ত্রী–ই নয়; বরং রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন এই লাডি। যখন সিন্ধুর প্রতিটি রণাঙ্গনে দাহির বাহিনী চরম মার খাচ্ছিল, যখন প্রতিটি কেল্লায় মুসলিম পতাকা ওড়ছিল তখন একবার লাডি রাজা দাহিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। দাহির বলেন, 'কি লাডি? আজ পূর্ণিমা শশীতে হালকা কালো মেঘের আনাগোনা যে?'

'পূর্ণিমা শশীতে নয় মহারাজ! গোটা সিন্ধুতে কালো মেঘ। এটা আরব মরু থেকে উত্থিত প্রলংয়করী ঝড়ো হাওয়ার অশনি সংকেত।'

'আমরা কি মরে গেছি রাণী? আমরাই তো ওদের ডেকে এনেছি।' থামলেন দাহির। চেয়ে নিলেন রাণীর চেহারা খানিক। রাণী বললেন, 'মহারাজ! আজ থেকে না আমি আপনার রাণী, না আপনি আমার রাজা। সত্যিই আমার প্রতি আপনার কোন ভালবাসা থাকলে তা সিন্ধুকে দিন। আমার প্রতি আপনার কোন টান থাকলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মাথা এনে দেখান। না হয় আপনার মাথা-ই কেটে বিসর্জন দিন। আপনার হাতে বিন কাসিমের কর্তিত মাথা দেখতে চাই। মুসলমানদের রাওড়ের আগে বাড়তে দিবেন না। শাকুরা নদীর জল ওই ম্লেচ্ছ আরবেরা নাপাক করে ছেড়েছে। আমার দেহ স্রেফ সেদিনই আপনি ছুঁতে পারবেন যেদিন আরব সালারের মাথা আমার পায়ে আছড়ে ফেলতে পারবেন। আমি শাকুরা নদী মুসলিম খুনে লাল দেখতে চাই।'

দাহির কাপুরুষ রাজা ছিলেন না। রাণী তার সুপ্ত পৌরুষে টোকা মেরে কথা বলেছেন। তিনি রাণীর কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

'এমনটাই হবে রাণী! আমার দেহের পয়লা হক সিন্ধুর, তোমার নয়। তুমি ঠিকই বলেছ রাণী। তোমার সামনে হয় মুহাম্মদ বিন কাসিমের মাথা না হয় আমার মাথা আছড়ে পড়বে।'

এর পরবর্তীতে ঠিক এমনটাই হয়। দাহিরকে যত্ন করে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করেন রাণী লাডি। তিনি হয়ত জানতেন না, রাজার সাথে এই তার শেষ সাক্ষাৎ। রাণী মুহাম্মদ বিন কাসিমের মাথা তো দেখতে পাননি। দেখেছেন তার স্বামীর মাথাহীন দেহ। যুদ্ধের পর তিনি ব্রাহ্মণাবাদে এসে আশ্রয় নেন। রাওড় ময়দান থেকে খুব কমসংখ্যক-ই ব্রাহ্মণাবাদে উপনীত হতে পেরেছিল। রাণী লাডি এদের সকলকে জমায়েত করে বলেন—

'তোমরা কি জীবিত থাকার মত কাজ করেছ? তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সামনে কোন মুখে দাঁড়াবে? কি লজ্জা! সামান্য বাহিনী ভিনদেশে বৈরী পরিবেশে তোমাদের লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়ে চলেছে। মহারাজ আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেন, হয় আরব সালারের মাথা কেটে উপহার দেবেন, না হয় নিজেই আত্মাহুতি দেবেন। আফসোস, তোমাদের রাজা জীবন দান করেছেন আর তোমরা বহাল তবিয়তে সুস্থ শরীরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ। এবার তোমরা ঘরে বাস করতে থাক। আমরাই ময়দানে লড়ব। নারী বাহিনী নিয়ে আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নামব। আমরা হারলে মুসলমানরা আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা এক বীর জাতির দাসী হয়ে সমৃদ্ধ জীবন কাটাতে থাকব।'

লাডির আগুনঝরা বক্তৃতায় সৈন্যদের দেহে উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি হল। তিনি বাহিনী জোগাড় করে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

॥ ছয় ॥

মুহাম্মদ বিন কাসিম ফৌজ নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ শহরে প্রবেশ করলেন, লাডির প্রাসাদে দ্রুত এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। এখানকার উজীর সিয়াকর রাণীকে জাগ্রত করলেন। তিনি ঘুমন্ত ছিলেন।

'রাণী! আরব বাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে।' বললেন সিয়াকর।

'তোমরা মুসলমানদের ভয়ে এতটা কুঁচকে গেছ?' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন তিনি, 'তোমরা কোন প্রকার প্রতিরোধের সৃষ্টি করতে পারনি? এই কি তোমাদের বীরত্ব!'

'রাণী! ওঠো। এখান থেকে পালাও। তোমার হুকুম আমার প্রতি চলতে পারে, মুসলমানদের ওপর নয়।'

'আমার সিংহ কোথায়? তাকে বলো এসে গেছে সে সময়, যে সময়ের জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলাম।'

'তোমার সিংহ এখন মুসলিম জাতির হাতে বন্দী। তুমি পালাতে চাও, নাকি স্বেচ্ছায় মুসলমানদের হাতে বন্দী হতে চাও?'

'আমাকে বের হবার সুযোগ করে দাও। আমি পুরুষের বেশ ধারণ করতে চাই।' লাডি বাঁদীদের ডেকে বললেন, মহারাজ দাহিরের কাপড় ও তলোয়ার এনে দাও।'

খানিক বাদে তিনি দাহিরের বেশে মহল থেকে বেরোলেন, মহলের চত্বরে পৌঁছুতেই কয়েকজন মুসলমান তাকে ঘিরে নিল। এদের নেতা শাবান ছাকাফী। তিনি অগ্রসর হলে লাডি বললেন, 'আমি তোমাদের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। আমি যুদ্ধংদেহী নই।'

'হে নারী! ভেড়া বাঘে রূপান্তরিত হতে পারলে তুমি পুরুষ হতে পার। আমার যা বিশ্বাস সিন্ধুর মাতৃজাতি তোমার মত পুরুষ জন্ম দেয় না। বলো, কে তুমি?' তিনি সঙ্গীদের বলেন, 'মহলের যাকে যেখানে পাও গ্রেফতার করো।'

সঙ্গীরা চলে যাবার পর তিনি ঘোড়া লাডির কাছে নিয়ে তার পাগড়ী ধরে হেঁচকা টান মারেন। লাডির কুচবরণ দীঘল চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।

'তোমরা কি শোননি আমরা নারীদের ওপর হাত ওঠাই না? তুমি সাধারণ নারী নও। বলো, দাহিরের সাথে তোমার কি সম্পর্ক।'

'আমি তাঁর স্ত্রী। রাণী লাডি।'

'তোমার সেই বাহিনী কৈ, আমাদের মোকাবিলায় যাদের তুমি প্রস্তুত করেছিলে?'

'শুনেছি তাদেরকে আক্রমণ করার সুযোগ দাওনি তোমরা। তারা সুযোগ পেলে আমাকে পুরুষের বেশে দেখতে না।'

শাবান ছাকাফী লাডিকে বিন কাসিমের সামনে উপস্থিত করেন। বিন কাসিম বলেন, 'তাকে মহলে নিয়ে যাও! তাকে স্বাভাবিক কাপড় পরিয়ে ইজ্জতের সাথে রাখ।'

॥ সাত ॥

ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে বিন কাসিম লাডিকে আরোড়ের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণাবাদে একজনকে গভর্ণর বানিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আরোড় চলে আসেন। আরোড়ের রাজপথে তাঁর বাহিনীর সামনে সহসা এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলেন। সাদা কাপড় পরিহিতা। হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। চুল এলোমেলো। আর একটি দেড় ফুট লাঠি সামনে প্রোথিত।

বিন কাসিম তাকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। দেহরক্ষী গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিতে বললে সে বলে, 'আমার কাছে এসো না বিজেতা সালার!'

'রাস্তা ছেড়ে দাও!' বিন কাসিম বললেন।

এ সময় শাবান ছাকাফী বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে যান। অতঃপর বিন কাসিমের কাছে এসে বলেন, ইবনে কাসিম! জানো এ কে?'

'না শাবান!'

'জাদুকর। স্থানীয় লোকজন মারফত জানতে পেরেছি। সে-ই প্রথম জাদুবিদ্যাবলে দাহিরের মৃত্যু সংবাদ আরোড়ে ছড়িয়েছিল।'

বিন কাসিম কৌতূহলবশত বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার দৃষ্টি জিন্দা মানুষকে দেখতে পায় না?'

'আমার সামনে প্রোথিত লাঠি দেখছ না? ওটা লাল মরিচের ডাল। এ দেশে পাওয়া যায় না। বলতে পার, এটা কোত্থেকে এসেছে?'

'না।'

'তা বলবে কি করে। তুমি স্রেফ জয়-পরাজয়ের খবর দিতে পার। তোমার জানা নেই, আগামী দিনে তোমার ভাগ্যে কি আসছে? তোমার জীবন প্রদীপ মাঝ পথেই নিভে যাবে কি–না!

'আজ সম্পর্কে কেবল এতটুকু জানি যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। কাল খোদার দরবারে গেলে জানব, অর্পিত দায়িত্ব কতটা আদায় করতে পেরেছি।'

জাদুকর মহিলার গাম্ভীর্যময় কথা প্রমাণ করছিল সে মামুলী নারী নয়। নয় পাগল কিংবা আহাম্মক। সে আরো বললো, 'তুমি কি ঘোড়া থেকে নামতে পারো না? তুমি অতি অবশ্যই নামবে। তোমার চোখ বলছে, তুমি সেই বাদশাহ নও যে আমাকে তার ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করবে।

বিন কাসিম নামলেন। এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধার কাছে। বৃদ্ধা লাঠি উঁচিয়ে তাঁর নাক ও মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরালেন। পরে বললেন, 'আমি বলেছিলাম, দাহির মরেছে, কিন্তু সকলে বলে সে জিন্দা। আর বলেছিলাম, তুমি জীবিত। কিন্তু---কিন্তু--না--এর পর আর শুনতে চেও না।' বলে বৃদ্ধা খামোশ হয়ে ওঠে দাঁড়ালেন। বিন

কাসিম দু'হাত উঁচিয়ে তাকে বারণ করলেন। বললেন, 'আমি আরো শুনতে চাই। তোমার জাদুবিদ্যায় আমার মৃত্যুসংবাদ থাকলে জেনে নাও, মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় রেখেই আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। জানি, দুশমনের একটা তীরই আমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। বলো মা, কি সেই খবর যা জানাতে ইতস্তত করছ তুমি?'

'রণাঙ্গনে মরবে না তুমি বাবা! তোমার জীবনকাল খুব একটা দীর্ঘায়িত হবে না। তোমার ভাগ্য তারকা খুব জলদি উদিত হয়েছে। ওটা ছিটকে পড়ার সময় হয়েছে।'

'কত দিনে?'

'এ বয়সেই। ওই ভাগ্য তারকার রৌশনী কখনো ম্লান হবে না।'

বিন কাসিম হো হো করে হেসে ওঠলেন। বৃদ্ধার কথায় যেন তিনি কোন প্রভাবিতই হননি।

বৃদ্ধা রাস্তা ছেড়ে দেবার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম আরোড়ের রাজপ্রাসাদ এলাকায় প্রবেশ করেন। দিগন্ত প্রসারী সবুজ বন-বনানী। সরু রাস্তার দু'পাশে প্রলম্বিত পাইন গাছের সারি। বিকশিত পুষ্পকলির সৌরভ সকলকে বিমোহিত করে। বিন কাসিম এই বাগানের কাছে ঘোড়া থামান। তাঁর পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসির ঠোঁট নড়ে ওঠে এই কথায়, 'এখানে এমন লোকের অবস্থান ছিল যারা মনে করত, মৃত্যুও তাদের আজ্ঞাবহ। ওই সময় মহলে স্রেফ কয়েকজন বাঁদীসহ লাডি ছিলেন। দাহিরের পরিবারের অন্যান্যরা পালিয়ে ছিল আরোড় দখলের পর। লাডি বাইরে এলেন বললেন, 'আপনি কি ওইসব লোককে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল?'

'হ্যাঁ! আমরা কেবল তাদের জীবন ভিক্ষা দেব যারা এ মুহূর্তে আমাদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দেবে।'

'বিজেতা ও রাজা-বাদশাহদের নিয়ম তো এটাই। কিন্তু আপনার নিয়ম এমনটা না হওয়া চাই!

আপনি তো মানবতাকে মিত্রত্বের নযরে দেখে থাকেন।'

'তুমি আমার সমরনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালে দেখবে, তোমাকে আমি পূর্ণ সম্মান দিয়ে চলেছি। তুমি এমন লোকদের বাঁচাতে চাইছ, বিপদের কালে যারা তোমার কথায় কান দেয়নি। ওরা তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। তোমার প্রতি মারাত্মক অপবাদ ছুঁড়েছে।'

'দু'টি কথাই গলদ। আমি আপনার সমরনীতিতে নাক গলাচ্ছি না এবং বাঁচাতেও চাচ্ছি না আমার লোকদের।' বলতে চাচ্ছি, 'আপনাদের লুটতরাজ ও ইজ্জত-সম্মানের ভয়ে ওরা হাতিয়ার সমর্পণ করেনি।'

'বিজিত কেল্লা ও শহরে হাতিয়ার উত্তোলনকারীদের আমরা খতম করে দিয়ে থাকি। ওরা জমায়েত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য বিদ্রোহের ধূমায়িত অগ্নি অংকুরেই নিভিয়ে ফেলা।'

'আমি ভিন্ন একটি উদ্দেশে পাইকারী হত্যা ঘোষণার বিরোধী। জানি আপনি খুবই ধীমান। এই বুদ্ধিমত্তা ও ধীমত্তা আপনাকে আরব থেকে আরোড়ে এনেছে। সিন্ধুর দুর্গম পাহাড় ও বিশাল নদী আপনার পথে বাধা হতে পারেনি। কিন্তু বিবেক সময়বিশেষ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আপনি আরোড়বাসীকে চেনেন না। এ শহর শিল্প কারিগরির সূতিকাগার। এদের হত্যা করার পূর্বে চিন্তা করে দেখুন। কে দেবে রাজ্য পরিচালনার অর্থের যোগান? পেশাজীবী, শ্রমজীবী, ও ব্যবসায়ীদের কতল করে জাতীয় রাজস্ব বিনষ্ট করা কি আপনার অভিপ্রায়?'

মুহাম্মদ বিন কাসিম এক হিন্দু রমণীর কথায় তার সিদ্ধান্ত বদলাবার মত লোক নন। অবশ্য লাডির কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত শাবান ছাকাফীসহ সালারদের সাথে পরামর্শ করে পাইকারী হত্যা স্থগিত ঘোষণা করলেন।

বিন কাসিমের এই স্থগিতাদেশে আরোড়বাসী অবাক। তারা তাকে অবতাররূপে গ্রহণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পূজার বেদীতে বসিয়ে ছিল।

একদিন মুহাম্মদ বিন কাসিম রাণী লাডিকে ডেকে পাঠালেন। লাডি পূর্ণ যৌবনা। অনিন্দ্যসুন্দরী। রাজা দাহিরকে তিনি আত্ম-সৌন্দর্যে মোহিত করে রাখতেন। অবশ্য দাহির ছিলেন এমন বয়সের অধিকারী যার চেহারা কেবল বিগত যৌবনের স্মৃতি বহন করে চলছিল। আর এখন তো দাহির দুনিয়াতেই নেই। লাডি বিন কাসিমের রূপ ও গৌরবে মুগ্ধ হন। তিনি মনে মনে বিন কাসিমকে কামনা করতেন। তার মনে নিজেকে ঠাঁই করিয়ে নেয়ার কল্পনা করতেন। এই প্রথম বিন কাসিম তাকে রাতের বেলা ডেকে পাঠালেন। রাতে ডেকে পাঠানোর অর্থ লাডি খুব ভাল করেই বুঝতে পারলেন।

তিনি যখন বিন কাসিমের কুঠরিতে প্রবেশ করেন তখন মুসলিম ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ এই সেনানায়ক হতবাক হয়ে যান। এই ভরা যৌবনাকে তিনি সাধারণ পোশাকে দেখেছিলেন ইতঃপূর্বে। তখন তার ছিল শোক ও বৈধব্যের সাজ। সাদা পোশাকাচ্ছাদিত। কিন্তু রাতে ডাকার খবর শুনে তিনি রেশমী কাপড় পরে আসেন। দেহে দামী অলংকার। ঠোঁটে পরিধি বাড়ানো হাসি, যা তার আকর্ষণকে খানিকটা বাড়িয়েই তুলছিল।

লাডি মুখ খুললেন, 'জানি একদিন তুমি আমাকে ডেকে পাঠাবেই। তোমার যৌবন শেষ পর্যন্ত কাবু হলো আমার কাছে।'

বিন কাসিম হো হো করে হেসে ওঠলেন।

'কাবু নয় বাধ্য হয়ে তোমায় ডেকেছি লাডি। তুমি উগ্র সাজসজ্জা আর আগুনঝরা পোশাকাচ্ছাদিত না হয়ে এলেই আমি খুশী হতাম।'

'আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এই বেশ ধারণ করেছি। তুমি যে ইজ্জত আমায় দিয়েছ তার প্রতিদানে আমার এই সাজ। আমি কি ছিলাম?--তোমার কয়েদী। কিন্তু তুমি ওই ব্যাপারটা কখনো আমায় উপলব্ধি করার সুযোগ দাওনি। আরোড়বাসীকে হত্যা করতে আমি নিষেধ করেছিলাম, তুমি আমার কথা মেনে নিয়েছ। আমি রাণী

হলে রাজসিংহাসনের পাশে তোমাকে বসাতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি সর্বহারা। এক্ষণে তুমিই আমার সব। আমার কাছে প্রতিদান দেয়ার মত আছে স্রেফ আমার অস্তিত্ব।

'আমি প্রতিদানই চাই লাডি। তবে সেই প্রতিদান তোমার দেহ নয়। প্রতিদান কেবল যা জানতে চাই তা বলো। যদি তোমার দেহ ভোগের ব্যাপার থাকত তাহলে আমার দেহরক্ষীরা এখানে থাকত না। যে তৃষ্ণা নিয়ে তুমি এসেছ আমি সে তৃষ্ণায় কাতর নই। এর ভাষা সকলে জানে। আমার আগামী টার্গেট মুলতান। মুলতান কেমন দেশ, এর ভূপ্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের চাল-চলন সম্পর্কে জানাও।'

রাণী লাডি সংক্ষেপে মুলতান, ভাতিণ্ডা ও তৎপার্শ্ববর্তী জনপদের কথা বলে বেরিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত কি মনে করে আবারো ফিরে আসেন। বলেন,

'আমাকে মাফ করে দাও মুহাম্মদ! আমি তোমাকে নাপাক করতে এসেছিলাম।

'আমার ওপর যৌবনের জাদু চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এসেছিলে বুঝি? রূপের বাজারে আমাকে সওদাগর বানানো তোমার অভিপ্রায় ছিল?'

'অমনটা ভেবো না বিন কাসিম! তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না আমার। তুমি দেবতা। সুন্দরী নারী দেখলে বাদশাহ পর্যন্ত সাধারণ জনতার কাতারে শামিল হয়। আমি তোমাকে এমন এক বাদশাহ মনে করতাম।'

'তুমিও সাধারণ এক কুলটা নারীর মত এখানে এসেছিলে, কেননা তুমি শাহী খান্দানের মেয়ে।'

'না! আমার শিরা-উপশিরায় শাহী খান্দানের খুন বইছে না। আমি সাধারণ এক ব্যবসায়ীর মেয়ে। রাজা দাহিরের চোখ পড়ায় আমি তার স্ত্রীর মর্যাদা পাই। জনসাধারণকে আমি খুব ভালবাসি। এজন্য দাহির মারা যাবার পর কেল্লা বুরুজে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, তোমরা মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করো। আর শোন মুলতান প্রশাসন তোমার বিরুদ্ধে লড়বে না।' বলে লাডি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

॥ আট ॥

মুলতান।
সিন্ধুর একটি অন্যতম শস্য–শ্যামল প্রদেশ।
রাজা দাহিরের সাম্রাজ্য এ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
দাহিরের ভাইপো রসিয়া ছিল মুলতানের গভর্ণর।

রাণী লাডির কথামত মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান ঘেরাও করেন। কেল্লার ফটক ও বুরুজে হিন্দু বাহিনী তীর বর্শা সজ্জিত। বিন কাসিম অপেক্ষাকৃত দূরে ছাউনি ফেললেন। এটিতেও তাঁর সিন্ধু অভিযানের সর্বশেষ জয়। পূর্বাপর যুদ্ধের মত এটি সহজে জয়লাভ করেন তিনি। রসিয়া এতে মারা পড়ে। বিন কাসিম কেল্লায় ইসলামী তাকা ওড়ান। পুরো মুলতানে শান্তি নিরাপত্তা কায়েম করেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুলতানবাসী এমন শান্তি ও নিরাপত্তা ইতঃপূর্বে দেখেনি। মুহাম্মদ বিন কাসিম মূলতান থেকে সামনে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করছিলেন। এর আগে তিনি মুলতান থেকে অর্জিত মালে গনীমত হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম একটি ব্যাপারে খুবই পেরেশান হন এ সময়। তাঁর জানা ছিল, খলীফা ওয়ালিদ সিন্ধু আক্রমণের অনুমতি প্রথম দিকে দিতে চাননি। হাজ্জাজ তাকে এ বলে রাজি করিয়েছিলেন, যে পরিমাণ সামরিক ব্যয় হবে সিন্ধুতে আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ বায়তুল মালে জমা দেব। বিন কাসিম মুলতান ও অন্যান্য রাজ্যের জিযিয়ার হিসাব কষে দেখলেন, তা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তিনি ছোটখাটো যে সব কেল্লা দখল করতেন তার কোষাগার সবই শুন্য পেতেন। সুতরাং হাজ্জাজের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে ব্যর্থ দেখে তিনি মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েন। কোত্থেকে আসবে দ্বিগুণ অর্থ। হাজ্জাজ, বিন কাসিমকে এক পত্রে সেই ওয়াদার কথা স্মরণ করালে তিনি আরো পেরেশান হয়ে ওঠেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আল্লাহর রাহে জীবনোৎসর্গী মুজাহিদ। ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না তাঁর এতটুকু। সাধের তারুণ্য ও যৌবন তিনি ঘোড়ার পিঠেই কাটিয়েছেন। বিপদে আপদে আল্লাহর কাছে মদদ চাওয়া তাঁর প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন তিনি ঘোড়ায় চেপে মুলতান দেখতে বেরোন। শাবান ছাকাফী ছাড়াও চার ঘোড়সওয়ার তাঁর দেহরক্ষী। মুলতান জয় করেই তিনি বলেছিলেন, এখানে এমন একটি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, ভবিষ্যৎ বংশধর যা দেখে আমাদের স্মৃতি রোমন্থন করতে পারে। ওই মসজিদের স্থান নির্ধারণ করে ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছিল। ওই মসজিদের কাজ দেখতে তাঁর এই বের হওয়া।

বড় মন্দিরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হতে গিয়ে তিনি দেখেন, দু'পন্ডিত দরোজায় দাঁড়ানো। বিন কাসিমকে দেখে তারা দ্রুত মন্দিরে প্রবেশ করল। মুহাম্মদ বিন কাসিম মন্দিরের একেবারে কাছে গেলে বয়োবৃদ্ধ এক পন্ডিত বেরোলেন। তার হাবভাবে মনে হচ্ছিল, আরব সালারকে তিনি কিছু বলতে চান।

পন্ডিত মশাই সিঁড়ি টপকে নেমে এলেন শম্ভুক গতিতে। দাঁড়ালেন তাঁর ঘোড়ার কাছে। দু'হাতে ধরে ফেললেন তাঁর পা। মাথা ঠুকলেন তরুণ সেনাপতির পায়ে। বিন কাসিম দ্রুত পা সরিয়ে নিলেন। পন্ডিত স্বাভাবিক হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন এবং স্থানীয় ভাষায় কিছু বললেন। তাঁর সাথে স্থানীয় ভাষার দোভাষী ছিল। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, পন্ডিতের ভাষ্য কি শোন। দোভাষী জানাল, পন্ডিত মশাই আপনার সাথে নিরিবিলিতে কিছু কথা বলতে চান। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পন্ডিতের অনুসরণ করতে লাগলেন। দোভাষীও সাথে থাকল।

॥ নয় ॥

সিঁড়ির ওপরের ধাপে পন্ডিত মশাই বসলেন আর বিন কাসিম নীচের ধাপে। পন্ডিতজী বললেন,

'স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিনা। কে বিশ্বাস করবে, রাজা নীচে আর প্রজা ওপরের আসনে বসা?'

' স্রেফ মুসলমানরা বিশ্বাস করতে পারে তা, যাক গে। আপনি যে জন্য আমাকে ডেকেছেন, বলুন দেখি তা। আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি। আপনার নাতির বয়সী আমি।'

পন্ডিতের প্রাণটা ধক্ করে ওঠল। বিস্ময়ভরে তিনি কদমখানেক পেছনে হটে গেলেন।

'আপনাকে একটি রহস্য বলতে আমি বাধ্য হয়ে পড়েছি। এটি একটি বিশাল প্রতিদান যা আপনাকে দিতে চাই। বার্ধক্যের দরুন আপনার শানে কোন প্রকার বেআদবী হলে ক্ষমা করে দেবেন। কেল্লায় যেদিন প্রথম আপনি প্রবেশ করেন সেদিন আপনাকে দেখেছিলাম এক নযর। শুনেছিলাম, আরব সালার কম বয়স্ক। মনে করেছিলাম, ৩০/৩৫ বছরের হবে। কিন্তু আপনাকে দেখে হতবাক হয়ে যাই। হায় হায়! এ যে বালক! আরবের দোলনায় তো এর দোল খাবার কথা এখন। আমি শহরবাসীকে সাবধানবশত বলেছিলাম, তাঁরা যেন তাদের যুবতী মেয়েদের কতল করে ফেলে কিংবা জীবন্ত পুঁতে দেয়। তাদের স্বর্ণালংকার ও মণি-মুক্তাদিও যমীনে দাফন করে দিতে বলি। এই পড়ন্ত বয়সে আমি অপদস্থ হতে চাচ্ছিলাম না। তাই একটি পুরানো ঝুপড়িতে আত্মগোপন করি। আমার দেখাশোনার জন্য এক লোক ছিল। প্রাত্যহিক সে আমাকে শহরের খবরাখবর শোনাত। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, শহরে শান্তি-নিরাপত্তা আছে, লুটতরাজ হচ্ছে না, বধূ–কন্যারা ইজ্জত হারাচ্ছে না।

গতকাল আমি সেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়েছি। মন্দির যেমনটা রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটাই পেয়েছি। নারী-পুরুষকে পূজা অর্চনা করতে দেখলাম। ওরা সকলেই আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যিই মানুষরূপী এক দেবতা আপনি। আমি আমার মন–মন্দির আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার গোটা দুনিয়াই মন্দির। রাতে শহরের এক অভিজাত লোককে বলেছিলাম, আমি মুসলিম সালারের সাথে মিলিত হতে চাই। তিনি যেন আমাকে আপনার দেখা পাইয়ে দেন। এই মাত্র দু'পন্ডিত এসে জানাল, আপনি এদিকটায় আসছেন। আমি তখন বেরিয়ে আসি।'

'আপনি আমার সাথে জরুরী কোন কথা বলতে চান কি?' প্রশ্ন বিন কাসিমের।

'হ্যাঁ!' তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে অনুচ্চঃ স্বরে বলেন, 'আপনি মুলতান এবং এর মধ্যস্থিত মন্দির সমূহের সাথে যে চমকপ্রদ ব্যবহার করেছেন আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। অনেক অনেক দিন আগের কথা। এই জনপদে এক রাজা এসেছিলেন। তিনি কাশ্মীরের রাজা। নাম যশোবন্ত। তিনি তার গোটা রত্নভাণ্ডার সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

'পন্ডিত মহারাজ! সেই গুপ্তধনের কাহিনী তো বহুত পুরানো হয়ে গেছে। সে কেচ্ছা শোনাতে আপনার এই দীর্ঘ ভূমিকার দরকার ছিল কি। প্রথমে বলুন! এর সত্যতা কতটুকু।'

মুহাম্মদ বিন কাসিম ওই সময় ছিলেন অর্থ চিন্তায় পেরেশান। সেই সময় ধনভাণ্ডারের সন্ধানে তাঁর আগ্রহী হওয়ার কথা। তারপরও হিন্দুদের প্রতারণার কথা স্মরণ করে ভাবলেন, এটাও হতে পারে। পন্ডিত একজন জাঁদরেল লোক। হিন্দুত্ব তার শিরায় প্রবাহিত। উগ্রতাই তার ধর্ম।

'আমার কথায় আপনি সন্দিহান হচ্ছেন– এর দ্বারা বুঝলাম আপনি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। লোকেরা তো ধনভান্ডারের কথা শুনে জানবাযী লাগায়, কিন্তু আপনি কেবল সন্দিহান। আপনি এও বলতে পারতেন যে, এই বুড়ো পূজারী! অমুক রাজা ধনভান্ডার সমাহিত করে রেখেছে, তা জেনেও তুমি তা আত্মসাৎ করোনি কেন? এর জবাবে বলব, আমি নিঃসন্তান। ধনভান্ডার দিয়ে কি করব।

'বৈরাগী আমি। দুনিয়ার প্রতি কোন লালসা নেই। আপনি বাদশাহ। রাজত্ব চালাতে স্বর্ণ–রৌপ্যের দরকার।' পন্ডিত বললেন।

'গুপ্তভান্ডার কোথায়? কাশ্মীরের রাজা কেন এই ধনভান্ডার লুক্কায়িত করেছিলেন?'

'এখান থেকে কাছেই। আমি খোদ আপনার সাথে যাব। কাশ্মীরের রাজা যশোবন্ত অধিকাংশ সময় পূজা–অর্চনায় লেগে থাকতেন। তিনি এই মন্দিরে এসে বসে ছিলেন। দুনিয়াবিমুখ হয়ে ছিলেন। মন্দির থেকে সামান্য দূরে প্রশস্ত এক জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। বানিয়ে ছিলেন এর মাঝে ছোট একটা মন্দির। পরে বাকী জীবন ওখানেই কাটান।

আমার ঠাকুরদা' পরদাদারা তখন ওই সময়ে এখানকার পন্ডিত ছিলেন। সকলের কাছে মহাঋষি বলে পরিগণিত হতেন। তারা রাজা যশোবন্তের সাথে থাকতেন। যশোবন্ত তার জীবনের শেষ দিকে ৪০ মটকা স্বর্ণমুদ্রা, কয়েক মণ কাঁচা স্বর্ণ, স্বর্ণইট ও জওহরসহ নানান মণি-মাণিক্য এখানে নিয়ে আসেন। এর ওপর বড় একটা মূর্তি বানিয়ে খাড়া করে রাখেন, যাতে কেউ এর নীচের গুপ্তধনের সন্ধান না পায়। মন্দিরের আশেপাশে তিনি বেশ কিছু বৃক্ষও রোপণ করেন।'

যশোবন্ত সিং সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তার বাবা ছিলেন লোভী। তাকেও লোভি হতে সবক দেন। যশোবন্ত খেলাধুলায় ছোটকালে স্বর্ণ ব্যবহার করতেন। তিনি বাবা-মার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রথমে তার বাবা পরে মা মারা যান। তিনি বৈদ্য ও কবিরাজদের বলেছিলেন, যে তার বাবাকে বাঁচাতে পারবে তাকে তার দেহের সমপরিমাণ স্বর্ণ দেয়া হবে। মায়ের মৃত্যুর বেলায়ও সে এ রকম ঘোষণা করে কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে কেউই রেহাই পায়নি।

আমাদের স্রষ্টা যশোবন্ত সিংহকে মারাত্মক এক বালাই দিলেন। এক যুবতী নৃত্যশিল্পীর সাথে তার প্রেম ছিল। একদিন তাকে রোগে ধরল। যশোবন্ত ঘোষণা করলেন, যে আমার প্রেয়সীকে ভালো করে তুলতে পারবে তাকে তার দেহ

সমপরিমাণ স্বর্ণ এনাম দেয়া হবে। দূরদরাজ থেকে কবিরাজ, বৈদ্য ও যোগীরা এলো। কিন্তু নৃত্যশিল্পী মারা গেল।

তার লাশ শশ্মানের কাঠের ওপর রাখা হলে যশোবন্ত অবোধ শিশুর মত হু হু করে কেঁদে ওঠেন। আমার মত এক বুড়ো যোগী তাকে বললেন, মহারাজের যাবতীয় স্বর্ণের মোকাবিলায় স্রষ্টার কাছ থেকে একটি মুহূর্ত কিনে আনতে পারবে না। জীবন্ত মানুষকে তুমি স্বর্ণ দ্বারা মাপতে চাও। দেখলে মানুষের পরিণাম! নৃত্যশিল্পীর ভৌতিক দেহ তোমার মত রাজার মনে আগুন ধরিয়েছে। দেখ, ওই যে সেই দেহ আগুনে জ্বলে ছাই হচ্ছে। তোমার সঞ্চিত যাবতীয় স্বর্ণ ওই আগুনে রাখলে তা গলে যাবে ঠিকই, কিন্তু তোমার প্রেয়সীকে এই আগুন ফেরত দেবে না। আত্মিক প্রশান্তির ব্যবস্থা কর। যাও! মন্দিরের প্রকোষ্ঠে অবস্থান নাও।

যশোবন্ত সিং মন্দিরের পূজারী বনে গেলেন। তার হৃদয় থেকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মোহ পুরোপুরি বেরিয়ে যায়। তার যাবতীয় ধনরাশি পুঁতে রেখে এর উপর মন্দির নির্মাণ করে। আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, আপনি যেখানেই যান সেখানেই ইবাদাতগাহ নির্মাণ করেন। আপনি এই স্বর্ণের ভান্ডার মন্দিরের নীচ থেকে নিয়ে নিন।' থামলেন বুড়ো পন্ডিত।

'আমি শুনেছি গুপ্তধনের সাথে দুভার্গ্য ও কুহেলিকা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। আরো জেনেছি, অমন গুপ্তধন যে-ই উদ্ধার করে, পরিণতিতে সে ধ্বংস হয়ে যায়।' বললেন বিন কাসিম।

'আমার যদ্দূর বিশ্বাস ওই ধনভান্ডার আপনি নিজের কাজে লাগাবেন না।'

॥ দশ ॥

এ কাহিনী রূপকথা নয়। ধনভান্ডারের আলোচনা বিস্তারিত আকারে চাচ্‌নামা ও ফতুহুল বুলদানে উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম শাবান ছাকাফীর কাছে পন্ডিতজীর কথা বর্ণনা করেন। শাবান বললেন, 'এটা প্রতারণা নয় তো? তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হবে হয়ত বা। ইবনে কাসিম বললেন, ওখানে স্বর্ণ অতি অবশ্যই আছে। পরীক্ষা করতে হলে ক'জন সাথে করেই যেও।'

'না! তুমি ছাড়া আর কাউকে সাথে নেব না। তুমি কি এমন কথা শোননি যে, বেশ কিছু লোক একবার গুপ্তধন উদ্ধার করতে যায়। উদ্ধার কার্যের পর তারা একে অপরকে ধনলোভে হত্যা করে ফেলে। ধনভান্ডার মানুষের ঈমান মযবুত রাখতে দেয় না। কিন্ত শাবান, আমি আমার চাচা হাজ্জাজের খলীফাকে দেয়া ওয়াদা পুরা করতে চাই। পন্ডিতের স্বেচ্ছায় এই ধনভান্ডারের সন্ধান দানকে আমি খোদার মদদ মনে করছি।

শাবান ছাকাফীর সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করে তিনি পন্ডিতকে বললেন, দুতিন দিন পর এসে আমরা ওই মন্দিরে যাব। পন্ডিতকে শুকরিয়া জানিয়ে তাঁরা নয়া মসজিদের দিকে গেলেন।

এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজে মাটি কেটে মসজিদের কাজ উদ্বোধন করলেন। শুধু উদ্বোধন-ই নয়, যতক্ষণ ললাটের ঘাম চোখে মুখে চুপসে না যায় ততক্ষণ কাজ করতে থাকেন।

চার দিন পর।

বিন কাসিম শাবান ছাকাফীসহ আরো চার জন সেপাই নিয়ে ওই মন্দিরে হাযির হলেন। বুড়ো পন্ডিতকে বাইরের সেই মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলা হলো। বিন কাসিম আসলে সে দিনই মন্দিরে প্রবেশ করে গুপ্তধন উদ্ধার করতে চাইছিলেন, কিন্তু শাবান-ই তাকে কালক্ষেপণ করতে বলেন। পন্ডিত কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করে কিনা তা দেখার জন্যই তারা চার দিন পর হঠাৎ এলেন।

হাউজ ওখান থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। ওই যুগে মুলতান ছিল ঠাঁসা পাহাড়ের নগরী। পরিত্যক্ত ও বিরান জলাধারের মধ্যে সেই মন্দির। মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুগে এই মন্দিরে পূজা–অর্চনা হতো না। পূজা–পার্বণ তো দূরে থাক মন্দিরের আশপাশ দিয়েও কেউ যাতায়াত করতো না। ভৌতিক এই মন্দির সম্পর্কে জনগণের ধারণা ছিল, পাপীদের অশরীরী আত্মা এনে এখানে শাস্তি দেয়া হয়। মন্দির এলাকায় কোন পশুপাখী দেখামাত্রই মানুষেরা বলাবলি করত, এগুলো সব সাজাপ্রাপ্ত পাপাত্মা। হতে পারে গুপ্তধন থেকে মানুষকে অজ্ঞ রাখার জন্যই পন্ডিতের বাবা–ঠাকুরদা' এই গুজব ছড়িয়েছিলেন।

পন্ডিতকে নিয়ে বিন কাসিম ওখানে উপনীত হলেন। সকলে নামলেন ঘোড়াপৃষ্ঠ হতে। না জানি কেন পন্ডিত মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নিয়ে একাকী ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেন, হাউজ শুষ্ক। এতে নামার জন্য রয়েছে সিঁড়ি। পন্ডিত সিঁড়িবেয়ে নামতে লাগলেন। তার পেছনে বিন কাসিম। সামনে মন্দিরে যাবার আরেকটি সিড়ি। উভয়ে সিঁড়ি টপকে মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

মন্দিরে প্রবেশ করতেই দেখা গেল চারদিক শুধু আঁধার। পন্ডিত আচমকা বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি স্রেফ এতটুকু আওয়াজ করলেন, 'এদিকে।'

মুহাম্মদ বিন কাসিম ওই আওয়াজ অনুসরণ করে এগুতে থাকেন। সামনে ভূগর্ভস্থ আরেকটি সিঁড়ি। ওই সিঁড়িপথে তিনি নামলেন। কোত্থেকে যেন দম রুদ্ধ করা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এরপর ফর ফর করা আওয়াজে দুঃসাহসিক আরব সেনাপতি প্রকম্পিত হয়ে উঠেন। পরক্ষণে পন্ডিতের কথা ভেসে আসে।

'বসুন!' পন্ডিত বললেন, "বড় বড় বাদুড় চামচিকা ওড়ছে।'

বিন কাসিম বসে পড়লেন। চামচিকা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। এই মন্দির ছিল ভূত–প্রেত-পুরী, নিস্তব্ধ নগরী। দু'জনের আগমনে নিস্তব্ধতা ক্ষুণ্ন হতে দেখে এসব নিশাচর বাদুড় চামচিকার দাপাদাপি। এক সময় এগুলো সরে গেল।

হাজারো চামচিকা মন্দির থেকে উড়ে বেরোতে লাগল। পন্ডিত সিঁড়ি বেয়ে আরো নীচে নামতে লাগলেন। সাবধানে পা ফেলে তাকে অনুসরণ করেন বিন কাসিম। সিঁড়ির

ধাপ এক সময় শেষ হয়ে এলো। পন্ডিত বিন কাসিমের হাত ধরে ডানে নিয়ে গেলেন। ঘন কালো আঁধার। আরেকটু সামনে গিয়ে তিনি বামের পথ ধরলেন।

এবার সহসাই যেন জমকালো আঁধার কমতে শুরু করে। হাল্‌কা আলোর ছায়া এসে পড়ে। হঠাৎ কারো পদধ্বনিতে দুঃসাহসিক বিন কাসিমের মনটাও ছ্যাঁৎ করে ওঠে! তিনি দ্রুত তলোয়ার বের করেন। পন্ডিত বলেন,

'ওটা কোষেই রেখে দিন। এটি এই অন্ধকার-পুরীরই বাসিন্দা। খুব সম্ভব সাপ। দেখছেন না কি দুর্গন্ধ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি?'

মুহাম্মদ বিন কাসিম তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন। সামনে একটি কক্ষ। ছাদের পাশে ভেন্টিলেটার। দেয়ালে মাকড়সার হাজারো জাল। বুনো অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ভেন্টিলেটার দিয়ে হালকা আলো আসছে কক্ষ মধ্যে, কক্ষের মাঝে একটি মানুষ দাঁড়ানো। আলো স্বল্পতার দরুন ভালো করে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। এ ছাড়া তার চেহারা ছিল বিপরীত মুখো। মনে হচ্ছে লোকটা পাহারাদার। মুহাম্মদ বিন কাসিম মনে করলেন, তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি আবার তলোয়ার বের করলেন এবং ওই মাঝকক্ষে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তলোয়ার উদ্যত করলেন। পন্ডিত তার বাযু ধরে বললেন,

'থামো আরবী সালার! এ কোন জীবন্ত মানুষ নয়। এটা স্বর্ণমূর্তি। রাজা যশোবন্ত এটি গড়েছেন। এর নীচে স্বর্ণের মোহর, অলংকার, হীরা, চুনি, পান্না ও স্বর্ণের ইট রয়েছে। তোমার লোকদের ডেকে এই মূর্তি সরাও এবং মূর্তির নীচের ফরাশ টেনে তোল। লোভী ও প্রতারক কাউকে এখানে এনো না। দেখো শেষ পর্যন্ত রত্ন লোভে তোমাকে আবার হত্যা না করে ফেলে।

ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, ওই মূর্তির চোখে ইয়াকুতের প্রলেপন ছিল, যা অন্ধকারে চমকাত।

॥ বার ॥

স্বর্ণের চমকে লোভ করে আরেক ভাইকে হত্যা করার মত ঈমান দুর্বল হয়নি ওই সময়কার মুসলমানদের। শাবান ছাকাফী ও তার চার যে সাথীকে বাইরে রেখে গিয়েছিলেন, তারাও সন্তর্পণে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। বিন কাসিমও এদের এই চুপি চুপি অনুসরণ ঠাহর করেন। তিনি অনুধাবন করেন, মন্দিরে তিনি একা নন। তিনি তালি বাজালেন। সকলে তৎক্ষণাত সামনে এলেন। তিনি সঙ্গীদের মূর্তি সরাতে এবং এর নীচ থেকে স্বর্ণোদ্ধার করতে নির্দেশ দিলেন। মন্দিরে মশাল জ্বালানো হল। সন্ধ্যার পূর্বে মন্দিরের স্বর্ণমূর্তিসহ গোটা গুপ্তধন মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। ফতুহুল বুলদান প্রণেতার মতে, চূর্ণ স্বর্ণ (পাউডার আকৃতির) প্রায় চল্লিশ মটকা। ইট, কাঁচা ও অলংকারাকৃতির স্বর্ণ মিলিয়ে ২৩০ মণ। আর স্বর্ণমূর্তি মিলিয়ে পুরো গুপ্তধনের পরিমাণ ১৩২০ মণ।

এর ঠিক দুদিনের মাথায় মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের পত্র পেলেন। যাতে তিনি মুলতান বিজয়ে মোবারকবাদ দিয়েছেন। তিনি পত্রে লেখেন, আমি খলীফার কাছে ওয়াদা করেছিলাম সিন্ধু অভিযানে যত অর্থ খরচা হবে এর দ্বিগুণ আমি আদায় করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার ওয়াদা পূরণ করেছি। হিসাব কষে দেখেছি, তোমার সিন্ধু অভিযানে ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ দেরহাম। আর তুমি আমাকে দিয়েছ ১ কোটি ২০ হাজার দেরহাম। ওই পত্রের শেষে হাজ্জাজ লেখেন, 'প্রতিটি শহর ও গঞ্জে একটা করে মসজিদ নির্মাণ করবে। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত খোদার দ্বীন এখানে বুলন্দ থাকে। এক্ষণে জুমুআর খুতবায় খলীফার নাম নেয়া হয়। সুতরাং তুমি খলীফার নামে মুদ্রা চালু কর।'

হাজ্জাজ তাঁর পত্রে যে অর্থ-প্রাপ্তির কথা লেখেছেন তাতে মুলতানের অর্থের হিসাব ছিল না বিশেষ করে মুলতানের গুপ্তভান্ডারের।

পত্র প্রাপ্তির পর মুহাম্মদ বিন কাসিম পুরো ধনরত্নের এক-পঞ্চমাংশ গরুর—গাড়ীতে করে দেবলে পাঠান। সেখান থেকে জাহাজে করে ইরাকে নেয়া হয়। এই ধন পেয়ে হাজ্জাজ ভীষণ খুশী হন। পত্রে লেখেন, আমরা আমাদের খুনের বদলা নিয়েছি। যে অর্থ এই অভিযানে খরচ হয়েছে তার চেয়ে ছ'কোটি দেরহাম বেশী পেয়েছি। আর ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন হিন্দু রাজা দাহিরের মাথা তো বড় পুরস্কার হিসাবে থাকছেই।

ছন্দ হারিয়ে গেল

॥ এক ॥

দাউদ বিন নসর ও ওয়ালিদে আম্মানীকে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুলতান একটি বিপুল বিশাল ঘন পাহাড়ী অঞ্চল। তাই এখানে বুঝে শুনে তিনি দক্ষ লোককে নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানে যে ফৌজ তার সাথে রাখেন এর সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। সবাই অশ্বারোহী। এতে সিন্ধুর স্থানীয় লোকও শামিল ছিল।

মুলতান বিজয়ের পর আজকের পুরো পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের কিছু এলাকাসহ বিশাল এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেদিন। মোটকথা সিন্ধু সাম্রাজ্য পদানত করে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ এই সেনাপতি এবার সুবিশাল ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এ নিয়ে তিনি সালারদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের ভারত অভিযানের পয়লা মঞ্জিল ছিল কনৌজ। সিদ্ধান্ত হলো, কনৌজ রাজাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হবে। বিন কাসিম উপসালারদের প্রতি নযর বুলালেন। একজনের প্রতি তাঁর নযর আটকে থাকল, তাকে বললেন,

'আবু হাকীম শায়বানী, কসম খোদার! এই অভিযানের জন্য তোমাকে যথোপযুক্ত মনে করছি।'

'ভালোমন্দ বলত পারব না ইবনে কাসিম! তবে সুখকর কিছু একটা করে দেখাতে চাই।

'তোমার সাথে দশ সহস্র সওয়ার থাকবে। রসদ ও অন্যান্য সামগ্রী গুছিয়ে নাও। কনৌজের দূরত্ব জেনে নাও। পথ প্রদর্শনের জন্য স্থানীয় লোকজন সাথে থাকবে।'

'এই এন্তেযামের দায়িত্ব আমার ইবনে কাসিম! কনৌজ-রাজকে কি বলতে হবে?'

'তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। তোমার অজানা নয়, কিভাবে কোন ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতে হয়। সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করতে বলবে এবং জিযিয়া দিতে বলবে। একথাও বলবে, দেবল থেকে কাশ্মীরের পথের অসংখ্য রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা জিযিয়ার শর্তে রাজী হয়েছেন।'

'আমাদের শর্ত না মেনে সে যদি ময়দানে সশস্ত্র যুদ্ধে নামে, তাহলে? আমি কি দশ হাজার সওয়ার নিয়ে তার মোকাবেলায়'....

'না আবু হাকীম। তুমি উদয়পুর যাবে। ওখান থেকে তোমার সাথে একজন দূত যাবে। তোমার বাহিনীকে পথিমধ্যে রেখে যাবে।' বললেন বিন কাসিম।

আবু হাকীম শায়বানী দশ সহস্র সওয়ার নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উদয়পুর থেকে একজন দূত নিয়ে তিনি কনৌজ যাত্রা করলেন। সামান্য কিছু ফৌজ নিয়ে বাদবাকী ফৌজকে তিনি উদয়পুরই রেখে যান।

॥ দুই ॥

কনৌজের রাজা হরিচাঁদ মুসলিম সালারের আগমন বার্তা শুনেই উদয়পুরের করদাতা রায়চাঁদকে ডেকে পাঠালেন। রাজা হরিচাঁদ ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট। পেছনে অর্ধউলঙ্গ যুবতীরা বিশাল হাতির কানের মত হাত পাখায় বাতাস করে চলেছে। ডানে-বামে দেহরক্ষী। আবু হাকীম উদয়পুরের দূতসহ একজন দোভাষী নিয়ে হরিচাঁদের দরবারে এলেন। হরিচাঁদ তাচ্ছিল্যভরে প্রশ্ন করেন, 'এই ব্যাটা আরবী! জানি তোরা শীঘ্রই আসবি। কিন্তু কেন এসেছিস, তা তোদের মুখেই শুনতে চাই। বল, কি বলতে তোদের আগমন?'

আবু হাকীম শায়বানী তাঁর পয়গাম শোনালেন।

'কি ভুলের শিকার হয়ে এসেছিস্। সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে আমরা এদেশ শাসন করে আসছি। আজতক বাইরের কোন শক্তি আমাদের মুলুকে পা রাখার সাহস পায়নি। আর তোরা আমাদেরকে তোদের ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত রাখছিস? আবার ধর্ম গ্রহণ না করলে জিযিয়া দেয়া লাগবে!'

'হে রাজা! সিন্ধুর রাজা দাহির তোমার মত এমন দম্ভোক্তি করেছিল। কিন্তু কোথায় সেই দাহির আজ? কোথায় তার রাজ সিংহাসন?'

'এ ধরনের স্পর্ধা আমরা ক্ষমা করি না। এ ধরনের স্পর্ধা দেখানোর শাস্তি আমরা দেই যা শুনলেও ভয়ে কলিজা ফেটে যাবে। তুমি এক দূতের সাথে প্রতিনিধি হয়ে এসেছ। তোমাদের সিপাহসালারকে বলো, সে যেন আসে। তার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আমরা তলোয়ারের ভাষায়-ই দেব।'

আবু হাকীম শায়বানী মূলতান ফিরে এলেন। বিন কাসিমকে রাজা হরিচাঁদের সাথে আলোচনার পুরোটা শোনালেন। এও বললেন, কি দাম্ভিকতার সুরে তিনি কথা বলেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ওই সময়ই কনৌজ আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

কনৌজ অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হল পুরোদমে। মুজাহিদবৃন্দ বেশ ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছিলেন। যখমীরা চাঙ্গা হয়ে আসছিল।

॥ তিন ॥

তিনদিন পর।

বসরা থেকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দূত এলেন। বিন কাসিমের কথা ছিল, হাজ্জাজের দূত এলে তাঁকে যেন কোথাও আটকে না রেখে সরাসরি তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। এই রীতি মোতাবেক দূত বিন কাসিমের খীমায় প্রবেশ করলেন। মুহাম্মদ

বিন কাসিম খুশীতে আত্মহারা। তিনি পত্রের জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর আশা, যে স্বর্ণস্তূপ বসরায় হাজ্জাজকে প্রেরণ করেছেন হয়ত তা তাঁর হস্তগত হয়েছে। হাজ্জাজ হয়ত এজন্য তাঁকে মোবারকবাদ দিবেন। কিন্তু দূত খালি হাতে দাঁড়ানো। তাঁর কাছে এবার কোন লিখিত পয়গাম নেই। তাঁর চেহারায় ক্লান্তির চেয়ে মুষড়ে পড়ার ছাপ বেশী। বিন কাসিম বলেন, 'খোদার কসম! এমন কোন কথা আছে কি, যা মুখে আনতে ভয় পাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ, সালারে আলা।' বলে দূত থামল। অব্যক্ত কান্নায় তাঁর দু'চোখে অশ্রু।

'বলো!' বিন কাসিম গর্জে ওঠেন, বিজয়ের খুশীর মধ্যে আমাকে হরিষে বিষাদ দাও। বলো। আমি অভয় দিলাম।'

'আমীরে বসরা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইন্তেকাল করেছেন।' বলে দূত ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লেন।

'ওহ্! বলে বিন কাসিম দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। অতঃপর শিশু বাচ্চাদের মত কেঁদে উঠলেন।

দারোয়ানকে ডেকে বললেন, অতিদ্রুত সকলকে ডেকে পাঠাও। সকল বলতে, সালার, ফৌজি ইউনিট ও শহুরে কর্মকর্তাগণ। সকলে হাজির হলে বললেন, আমাদের মাথার ওপর থেকে একটি ছায়া উঠে গেছে। হাজ্জাজ আমাদের মাঝে আর নেই।'

পুরো মজলিস পীনপতন নিস্তব্ধতা। বিন কাসিমের চেহারা ঝড়ে ভাঙ্গা। তিনি বলেন,

"আমরা এখনি কনৌজ যাত্রা করব না। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক আমাদের পথে অন্তরায় হবেন না। আমরা তার ঋণ শোধ করেছি। তিনি যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন তার কোষাগারে তদপেক্ষা দ্বি'গুণ দিয়েছি। আর ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে সিন্ধুর মত দেশ তো আছেই উপরন্তু। তিনি আমাদের চলার পথে অন্তরায় না হলেও আমাদের সতর্ক হতে হবে। এমন কোন হাজ্জাজ হয়ত আর পয়দা হবে না, যে খলীফার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে পারেন। না জানি কবে দিমাশ্‌ক থেকে এই খবর আসে, থেমে যাও। আর সামনে অগ্রসর হয়ো না।

'তবে আমাদের চুপটি মেরে বসে থাকলেও চলবে না। তাহলে দুশমন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। কোন না কোন দিকে আমাদের কোচ করতেই হবে।" বললেন জনৈক সালার।

এটি উত্তম একটি মতামত। বিন কাসিম কনৌজ ছাড়া আর সব অভিযান বহাল রাখলেন। তিনি নিজে কিছু বাহিনী নিয়ে কীরজে যান এবং কীরজ জয় করেন। এই কীরজ-ই তার জীবনের সর্বশেষ জয়।

॥ চার ॥

৯৬ হিজরীর জমাদিউস সানী মাস।

একদিন মুসলিম জাহানের খলীফার পক্ষ থেকে দূত এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে একটি ফরমান শোনালেন। তাতে বলা হয়েছে, যেখানেই আছ থেমে যাও। আর আগে যেও না। কোথাও সৈন্য প্রেরণ করো না। তলোয়ার খাপে ঢুকাও।

'কেন এই হুকুম তুমি বলতে পার কি?' দূতকে প্রশ্ন করেন বিন কাসিম। তার চোখে মুখে বিস্ময়!

দূত সাধারণতঃ খুবই ধীশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সাধারণত উচ্চশিক্ষিত ও বাহিনীর কোন পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকই দূত হন।

'আমীরে সিন্ধু! হাজ্জাজের জীবদ্দশায় ওখানকার যে অবস্থা ছিল এখন এর সম্পূর্ণ উল্টো পরিবেশ বিরাজ করছে। খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক মুমূর্ষু। এ বিমারী থেকে বোধহয় তার কোন রেহাই নেই। ভাবী খলীফার পদ নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু হয়েছে ইতোমধ্যেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ক্ষমতার রশি টানাটানি নিয়ে বনি উমাইয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে শেষ হয়ে যাবে।

মরহুম খলীফা আব্দুল মালিক তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ওয়ালিদ ও তারপর সুলায়মানের নাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় ওয়ালিদ এখন নিজ পুত্র আব্দুল আজিজের নাম ঘোষণা করেছেন।

আমীরে সিন্ধু! আপনার সামনে নেমে আসছে দুর্যোগের ঘনঘটা। আপনার চাচা হাজ্জাজ ওয়ালিদের সমমনা ছিলেন। তিনিও ভাবী খলীফা হিসাবে তার পুত্র আব্দুল আজিজকে নিয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে সুলায়মানের বিরোধিতা করতেন। এজন্য সুলায়মান ও হাজ্জাজের মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এতে হাজ্জাজের পরোয়া ছিল না। সুলায়মান হাজ্জাজের সামনে চুনোপুঁটি বৈ তো নয়! তিনি হাজ্জাজের কেশাগ্রেরও ক্ষতি করতে পারেননি। অবশ্য হাজ্জাজকে তিনি প্রাণঘাতি দুশমন সাব্যস্ত করেছেন। সেই হাজ্জাজ ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই সুলায়মানের মাথা উঁচু করার মওকা মিলে গেছে। তার মতিগতি ভয়াল মনে হচ্ছে।

খলীফা ওয়ালিদ খুবই দূরদর্শী। তিনি বিছানা থেকে ওঠানামা পর্যন্ত করতে পারেন না। তিনি প্রাচ্যের রাজা সালারদের কাছে যুদ্ধবন্ধের নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরপর ভাবী খালীফা হয়ত যুদ্ধকালীন কাউকে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেবেন। এতে দুশমন মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে হামলা করে ধ্বংস করে দেবে। খলীফা ওয়ালিদ জেনেছিলেন, এই ধরনের ভাবী খলিফাটি তার ভাই সুলায়মান। বড় আনাড়ী ও কুলাঙ্গার এই সুলায়মান। মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে ঝড় উঠেছে। এটা পতনেরই পূর্বাভাস।'

থামলেন আধা বয়সী দূত। মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজের মৃত্যু শোক তখনো কাটিয়ে ওঠতে পারেননি। ওয়ালিদের মুমূর্ষু খবর তাকে আরো শোকাতুর করে তুলল। তাঁর শোক ও পেরেশানীর অন্যতম কারণ ক্ষমতার রশি টানাটানি। সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের কাছ থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম তেমন কোন ভাল ব্যবহার আশা করতেন না। সুলায়মানের হৃদয়ে আশৈশব এই তরুণ সেনাপতির বিরুদ্ধে ছিল বিদ্বেষ। দূতের কথার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। জাতির ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে কালো মেঘ জমেছে। এই মেঘ পতনের। জাতির ভাগ্য তরীকে ডুবিয়ে দেয়ার।

॥ পাঁচ ॥

এই দূত চলে যাবার কিছুদিন পর অন্য এক দূত এসে খবর জানালেন, খলীফা ওয়ালিদ ইন্তেকাল করেছেন। সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক তার স্থানে খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন, 'খলীফা আপনাকে তাঁর বায়াত হতে বলেছেন। আনুগত্য ও ওফাদারীর হলফনামা লিখে দিতে নির্দেশ করেছেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নয়া খলীফার হুকুম তামিল করলেন। স্মর্তব্য যে, কত কষ্টের সাথে তিনি এই হুকুম তামিল করলেন তা সহজেই অনুমেয়। তিনি সালার ও উপদেষ্টাদের জরুরী বৈঠক ডেকে এ খবর তাদের শোনালেন। ওয়ালিদের মৃত্যুর চেয়েও হতাশাজনক খবর ছিল সুলায়মানের সিংহাসনে উপবেশন।

এই সালারদের ও উপদেষ্টাদের কেউ কেউ বিন কাসিমের দ্বিগুণ বয়সের আবার অনেকে তিনগুণ। পরিবেশ, সামাজিকতা ও রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ তারা যতটা বুঝতেন অতটা বুঝতেন না ওই তরুণ। তিনি রণাঙ্গনের কিংবদন্তী দিগ্বিজয়ী শাহজাদা, রাজনৈতিক মঞ্চ-ময়দানের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ বোঝার বেলায় সামান্য বালক মাত্র। তিনি যুদ্ধ করেছেন ইসলামের স্বার্থে। স্বার্থান্ধতা, দলীয়করণ, মোহ-মাৎসয ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন না যে, জাতীয়তাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনী করা যায়। জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা যায়–তাও তার জানা ছিল না। স্বার্থের যাঁতাকলে রাজনৈতিক হিংসা যে পোষা যায়–বনি উপমাইয়ার্রা সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তা দেখানোর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন পর দিমাশ্ক থেকে এক লোক এলো। নাম বিলাল ইবনে হিশাম। এই দূরপাল্লার সফরের ক্লান্তির পরও তার মধ্যে এক ধরনের ভীতিভাব ছিল। প্রথমে তিনি শাবান ছাকাফীর সাথে বাইরে কথা বলছিলেন। পরে দু'জন ঘোড়া থেকে

নামলেন। প্রথমে মুহাম্মদ বিন কাসিম পরে শাবানের সাথে মোয়ানাকা করলেন। তিনি হু হু করে কাঁদছিলেন। তাকে বিন কাসিমের খীমায় নিয়ে যাওয়া হল।

'ইবনে কাসিম!' বেলাল ইবনে হিশাম বললেন, 'যদি জীবিত থাকার ইচ্ছা থাকে তাহলে স্বাধীনতা ঘোষণা কর। যে বিশাল সাম্রাজ্য তোমার দ্বারা বিজিত হয়েছে তার কর্ণধার বনে যাও। খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।'

'সত্যি করে বলো তো! দিমাশকে ঘটছেটা কি?' প্রশ্ন বিন কাসিমের।

'ঘটেছে কি বলো না, বলো কি ঘটেনি। ওখানে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের তলোয়ার আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। মরহুম খলীফা ও হাজ্জাজের গোটা সঙ্গী-সাথীকে বেছে বেছে ঠাণ্ডা মাথায় কতল করে চলেছে সুলায়মান। অন্যান্যদের পদচ্যুতি কিংবা বাধ্যতামূলক স্থানান্তকরণ করেছে। যেই বলছে, এ হাজ্জাজের সাথী তাকেই মেরে ফেলছে। ইবনে কাসিম! চীন বিজেতা কুতায়বা বিন মুসলিম ও স্পেন বিজেতা মূসা ইবনে নুসায়েরের পায়ে ডান্ডাবেড়ী লাগিয়েছে এই হিংস্র কুকুর। তাদের চৌদ্দ খান্দানকে সড়কের ভিখিরীতে পরিণত করেছে। আমি শুনেছি, ওই দু'মুসলিম বীর বিক্রমকে সে ধুঁকে ধুঁকে মারবে।'

পরবর্তীতে এমনটাই হয়েছিল। সুলায়মান মুসা ইবনে নুসায়েরকে মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তিনি মক্কা আগত হাজীদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলেন। এ এক ভিন উপাখ্যান। মুসা ইবনে নুসায়ের প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র বইতে তার কাহিনী লেখার আশা রেখে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি।

'সোলায়মান গোটা গভর্ণরদের রদ-বদল করেছেন। প্রাচ্যের আমীর নিযুক্ত করেছেন ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবকে। তোমার অজানা নয় ইবনে মোহাল্লাবের সাথে সাকাফীদের পুরানো দুশমনি রয়েছে। তিনি এক খারেজীকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। এ লোক তোমাদের আরেক দুশমন। তারা আমার সামনে ঘোষণা করেছে, বনী ছাকীফকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। ইবনে কাসিম! এখন থেকে কোন ছাকাফী বোধহয় জিন্দা থাকবে না। তুমিও এক সাকাফী। তোমার পদচ্যুতির সংবাদ আসছে অচিরেই। তোমার চাচা হাজ্জাজ সালেহ ইবনে আব্দুর রহমানের ভাইকে হত্যা করেছিলেন। এবার সে ভায়ের খুনের বদলা নেবেন। তার প্রথম শিকার মুহাম্মদ ইবনে কাসিম। সময় থাকতে তুমি স্বাধীনতা ঘোষণা করো।'

'হ্যাঁ, ইবনে কাসিম! সুরথ থেকে এ পর্যন্ত গোটা বাহিনী তোমার সঙ্গে আছে। এদেশের হিন্দুরাও তোমার সাথে আছে। সবাই ওফাদার। আমরাও তোমার সাথে। কাজেই কালবিলম্ব না করে স্বাধীনতা ঘোষণা করো।' বললেন শাবান ছাকাফী।

'না!' বিন কাসিম বললেন, 'আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আমার মত যে সব মুসলিম সালার গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে তারাও স্বাধীনতার স্লোগানে মুখরিত হবে। এতে মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।'

সকল সালাররা-ই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাপ দিলেন। তারা বললেন, যতক্ষণ সুলায়মান জীবিত আছে ততক্ষণ না হয় খেলাফতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো, কিন্তু বিন কাসিম তার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বললেন, খেলাফতের সম্পর্ক রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সাথে। আমার পক্ষে সেই ঐশী খেলাফতের বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

॥ ছয় ॥

দিমাশ্‌কে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের তলোয়ার নিরীহ মানবতার খুনে রঙীন হচ্ছিল। প্রথমে হাজ্জাজের খান্দানকে বেছে বেছে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে পরে সকলকে হত্যা করা হয়। এদের নারী শিশুদের পর্যন্ত ক্ষমা করা হয়নি। এরপর আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদচ্যুতির পালা। তার স্থলে ইয়াজিদ ইবনে কাবাশাকে সিন্ধুর গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়।

বিন কাসিমের অপরাধ কি তা সনাক্ত করতে পারেনি ইতিহাস। অবশ্য এর দরকারও ছিল না। এটা গোষ্ঠীগত হিংসা ও বিদ্বেষ, সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তো বটেই। একটি অপরাধ এই মহানায়কের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। তা হচ্ছে, দু'সুন্দরী হিন্দু যুবতীর শ্লীলতাহানি। বাস্তবেই যদি তিনি এই অপরাধের অপরাধী হতেন তাহলে খলীফার তো নিজ হাতে বিচার করার কথা নয় বরং তাঁকে কাজীর আদালতে পেশ করার কথা!

সিন্ধুর নয়া আমীর ইয়াজিদ ইবনে কাবাশাহ প্রাচ্যের আমীরের ভাই মুয়াবিয়া ইবনে মুহাল্লাবও তার সাথে ছিল।

'ইবনে কাসিম!' নয়া আমীর সিন্ধু আগমন করেই ফরমান প্রেরণ করেন, 'মুয়াবিয়া ইবনে মুহাল্লাব তোমাকে গ্রেফতার করে দিমাশ্‌ক নিয়ে যাবেন। খলীফা এই উদ্দেশে তাকে আমার সাথে প্রেরণ করেছেন।'

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। সিন্ধু বিজেতা, হিন্দুস্থানে কলেমার ঝান্ডা বুলন্দকারী, শত মসজিদ নির্মাতা; কয়েদির সাদা পোশাকে ডন্ডাবেড়ী পায়ে, হাতকড়া হাতে নিয়ে দিমাশ্‌কের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম অশ্রু সজল নয়নে শেষবারের মত তার প্রিয় সালার, ফৌজী কর্মকর্তাদের দিকে তাকালেন। তিনি একটি কবিতা পাঠ করলেন, 'ওরা আমার প্রতিভাকে খুন করছে। কেমন তারুণ্যের অহংকারকে ধূলিসাৎ করছে, যে ছিল কিংবদন্তী, দিগ্বিজয়ী। মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারের খবরে তার অধীনস্থ সমগ সিন্ধু অঞ্চলে ক্রন্দনের রোল পড়ে। তার এ পরিণতি দেখে সকলের আহাজারীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বিন কাসিমকে দিমাশ্‌কে নেয়ার কথা থাকলেও

তাকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। খলীফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক তার সামনে এলো না। রাজস্ব মন্ত্রী সালেহ ইবনে আব্দুর রহমান তাকে বাগদাদের অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

কয়েদখানার দরোজায় দাঁড়িয়ে বিন কাসিম ঘোষণা করলেন,

'তোমরা আমাকে বন্দী করে বেকার করে রাখলে–এতে ক্ষতি কার? তোমরা আমার সেই সম্মান কি ছিনিয়ে নিতে পরবে, শাহ সওয়ারদের মনে কম্পন জাগত যার নাম স্মরণে? তিনি শেষ পর্যন্ত এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, কালচক্র হে! তুমি বড্ড নিষ্ঠুর। তুমি অভিজাতগণকে অপদস্থ করো।'

কয়েদখানায় মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়। তিনি মুখ বুজে এসব সহ্য করে যান। আক্ কবিলার জনৈক লোক তার প্রহরা দেয়। এ লোক তাকে সকাল সন্ধ্যা নির্যাতন চালাত। সুলায়মান প্রতিনিয়ত তাঁর মৃত্যু খবর শোনার আশায় থাকতো। একদিন সে আখেরী নির্দেশ জারী করলো। সালেহ ইবনে আব্দুর রহমান তাকে আকীল গোত্রের এক পাষণ্ড জল্লাদের কাছে হস্তান্তর করে। এ লোক আযরাঈলের ভূমিকায় নামে। সিন্ধু বিজেতা জীবন্ত লাশে পরিণত হন।

আকিলের ওই পাষন্ড একদিন তাকে এমন নির্যাতন করতে থাকে যে, এতে তিনি পুরো অচেতন হয়ে যান এবং ওই অচেতন থেকে আর তিনি চেতনা ফিরে পাননি। সিন্ধুর মহান বিজেতা অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ সময় তার বয়স মাত্র ২২ বছর। দ্বীনের দুশমনদের হাতে হাতকড়া পরিধানকারী কিংবদন্তীর সমরেতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ বিস্ময় তরুণ শেষ পর্যন্ত স্ব-জাতির হাতেই প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তার লাশ দেখে জনৈক কবি বেদনাভরে গেয়েছেন ঃ 'ইনি মানবতার প্রতিভূ ও মহানুভবের প্রতিমূর্তি। যিনি মাত্র সতের বছর বয়সে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জন্মগত-ই তিনি ছিলেন সমর নায়ক।'

অপর এক কবি বলেন, 'তিনি সেই সমর নায়ক, যার বয়সী ছেলেরা গলিতে ডাংগুলি খেলে। অথচ সে ধুরন্ধর দাহিরের বিরুদ্ধে তখন যুদ্ধ ময়দানে।

তায়েফে একটি তারকা চমকে উঠেছিল। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার দ্যুতি ম্লান হয়ে গেল। তায়েফে দেখা মায়ের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। কুলাংগার সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের কোপানলে পড়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ঃ সমাপ্ত ঃ

তথ্যসূত্র ঃ

১. ফতুহুল বুলদান ঃ আল্লামা বালাজুরি
২. সিয়ারে আ'লামুন নুবালা ঃ
৩. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঃ নসীম হিজাযী
৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঃ আর. এ. হালা
৫. সেতারা জু টুট গ্যায়া ঃ এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ
৬. চাচ্‌নামা ঃ প্রাচীন সিন্ধুর জনৈক ঐতিহাসিক রচিত
৭. তারীখে মাসুমী

কামানের হুঙ্কার
ঐতিহাসিক উপন্যাস
ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশন্স এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৯ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই : ২০০৮ ইং
রজব ১৪২৯ হিজরী
শ্রাবণ ১৪১৫ বাংলা
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

কম্পিউটার কম্পোজ
জিসী কমপ্রিন্ট
৩৮/২ খ, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র

ISBN - 984-70099-0000